লেখকের অন্যান্য বই ঃ

আবির্ভাব (গল্পসংকলন)

পাটলি থেকে পাটনা (ঐতিহাসিক রম্যরচনা)

পুরনো পাটনায় বাঙালীর ব্যবসা বাণিজ্য

নকশি কাঁথা

রমণ গুপ্ত

দরবারী প্রকাশন ॥ কলিকাতা

নকশি কাঁথা

Nakshi Kantha

by Raman Gupta

রমণ গুপ্ত

প্রকাশক ও মুদ্রক ঃ
দরবারী প্রিন্ট-প্রো প্রাঃ লিঃ
১৬/৩ই ডিক্সন লেন
কলিকাতা-৭০০ ০১৪

প্রচ্ছদ ঃ সম্বিৎ সাহা

পরিবেশক ঃ
এন. পি. সেলস প্রাঃ লিঃ
২০৬ বিধান সরণি
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

মূল্য ঃ পঁয়ত্রিশ টাকা

Price : Rs 35·00

ISBN 85-85169-30-6

উৎসর্গ

স্নেহভাজন

দেবাশীষ ও স্বাতীকে

সূচীমুখ

কাঁথা তৈরীর প্রধান উপকরণ হোলো ছুঁচ আর সুতো। সূচীমুখ যদি সরু না হয় তাহলে কাঁথার উপর যে নকশার ফোঁড়, সেটা সূক্ষ্ম এবং শোভমান হোতে চায় না। কাজেই এই বই-এর প্রাথমিক সূত্র হিসেবে ছুঁচটাই আগে দেখিয়ে নিচ্ছি।

এই গ্রন্হ কোনো উপন্যাস বা গল্পসংগ্রহ নয়। জীবনযাত্রা পথে যেসব মানুষের সংস্পর্শে আসা গেছে তাদের বিচিত্র ও বিভিন্ন রূপ—যেটা প্রতিফলিত প্রতিটি সংসারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও পরিবেশে—সেসব মানুষকে ধরে রাখা হয়েছে আমার এই নকশি কাঁথাতে নানারকম পাতায় ও ফুলে। এটা কোনো রঙিন সুতোর নকশা নয়। কাঁথার এক একটা ফুল মানুষের এক একটা চরিত্রের আলেখ্য।

যেসব চরিত্র কাঁথাতে তোলা হয়েছে সেসব বিবিধ বর্ণযুক্ত বলেই তাদের বিশেষ চিহ্নযুক্ত করেই আঁকা হয়েছে। কাজেই এই কাঁথা নানা রঙের বিচিত্র নকশাবিশিষ্ট। বায়োস্কোপের মতো বা ভালো চিত্রনাট্যকারের মতো গল্প লেখা সম্ভব নয় এদের নিয়ে। কোনো কাহিনী অবলম্বন করে এইসব চরিত্রের সৃষ্টি নয়। শুধু ঘটনার উপর তারা পরিপূর্ণ দৃশ্যমান। যেভাবে এদের দেখেছি, ঘনিষ্ঠভাবে সংস্পর্শে এসেছি, কেউ মর্মপীড়া প্রদান করেছে, কেউ আবার বিদ্যুতের মতো চমকিত করেছে স্নেহমমতা ও মানবিক ঔদার্যে ঔজ্জ্বল্য নিয়ে। তেমনভাবেই তাদের এঁকেছি। কোথাও নিজস্ব খেয়ালখুশি মতো বিশেষ ফোঁড় দিয়ে তাকে লম্বা করা বা ছোট করা হয়নি। যে যেমন তেমন ভাবেই রয়েছে নকশি কাঁথায়।

কেউ যদি মনে করেন কপটবেশী মানুষগুলোর কপটাচরণ, ধূর্ততা, নীচতা এসব যেমন লোকচক্ষুর অন্তরালে ঢাকা ছিল এতদিন, তেমনভাবেই যদি আড়ালঠেকা দিয়ে রাখা হোতো, তাহলে ক্ষতিটা ছিল কোথায় ? তার উত্তরে শুধু এইটুকুই বলব যে, এইসব মানুষকে চিনে রাখা ভালো, এরা সংসারে থেকে যতটা না উপকারে আসে, তারচেয়ে বেশি বিস্ফোরণের সৃষ্টি করে। একটা সুন্দর শান্ত সংসার ভেঙেচুরে ফেলতেও নেই কোনো ইতস্ততবোধ এদের। সহজে ইতরকর্মে প্রবৃত্ত হোতেও থাকে না কোনো ইতিকর্তব্যতা। তাই এদের চিহ্নিত করে রাখা খুবই প্রয়োজন।

অন্যদিকে, আবার এদের পাশাপাশিও তো রয়েছে কত সরলচিত্তের মানুষ। মানবিকবোধ নিয়ে কত দীপ্ত, অস্মিতা থেকে কত উর্ধ্বে, অহংকারে নয় অন্ধ। মানুষকে ভালোবাসার জন্য, সেবার ব্রত নিয়ে যেন এদের সৃষ্টি। করুণার্দ্র হৃদয় নিয়ে দেখেছে যেমন নিজের জনকে, অপরকেও টেনে এনেছে নিকটে স্নেহমমতা দিয়ে। এসব মানুষের কথা আজকাল অনেকে ভুলেও উচ্চারণ করে না, কন্ঠ যে তাদের আটকে যায় সেইসব উদারতার কথা ব্যক্ত করতে। এদের কথাও তো জানা দরকার। এরা যদি না থাকত সংসারে, সমাজে, অনেক ঘরই যে ছারখার হয়ে যেতো নিমেষে। অনেক কষ্ট সয়ে, জলঝড় মাথায় করে সামলেছে এরা সেই সংসার শুধুমাত্র মানবতায় উদ্দীপ্ত হয়ে। তাদের সেই আত্মদান যে ভুলবার নয়।

এসব কথা বলার জন্য একজন কথাকারের প্রয়োজন। সেই কাজটা করেছি আমি।

বইয়ের এইসব চরিত্র পড়তে পড়তে মনে হবে হয়ত, এরা যে সব আমাদের ঘরের মানুষ, তাদের কথাই তো বলা হয়েছে যাদের চিনেও চিনতে পারিনি কখনো আমরা। কিছু সংকোচ,

কিছু লোকলজ্জা কুন্ঠিত করে রেখেছে, তাদের সেই নীচতার কথা অন্যকে বলতে। মর্মযাতনায় দগ্ধ হয়েছি, তবুও কাউকে জানাতে সাহস হয়নি। তাই দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগেছি আমরা সবাই। ঘরের কথা বাইরে প্রকাশ করতে যে রয়েছে প্রত্যেকের মধ্যে একটা কিন্তু ভাব। সভ্যতার মুখোশ পরে সেসব চাপার চেষ্টাই করেছি বরাবর। এদেরও তো চিনে রাখা দরকার।

এই বইয়ের কোনো একটা চরিত্রের সংগে পরোক্ষভাবেই হয়ত মিলে যেতে পারে অনেকের জীবনের কোনো ঘটনা। ঘটনার বাস্তবতাতেও হয়ত থাকতে পারে কিছু কিছু একরূপতা।

মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি সবার কাছেই যদি তারা কেউ ধরা পড়ে গিয়ে থাকে আমার এই নকশি কাঁথায়। অপ্রত্যাশিতভাবেই হয়ত মিলে গেছে তাদের চরিত্রের সংগে। এটা নিতান্তই আমার ইচ্ছাবশের বাইরে, ভিডিয়ো ক্যামেরায় যেমন এসে যায় ছবির ভেতর। ক্যামেরার লেন্সকে আড়াল করে লুকিয়ে পড়া যে বড় কঠিন, আড়ে-দীঘে যে সেটা খুঁজে বেড়ায় কে কোথায়, কেমন ভাবে দশ্য।

৬ বি, রাজেন্দ্রনগর
পাটনা ৮০০ ০১৬

রমণ গুপ্ত

ভূমিকা

শ্রীরমণ গুপ্ত অধুনা বাঙ্গালা সাহিত্য ক্ষেত্রে অপরিচিত নাম নয়। তিনি, বলাই ঠিক, পরিণত বয়সে সাহিত্যচর্চা শুরু করেছেন। এ বয়সে অবসর নিয়ে বহুলোক যেখানে তীর্থধর্ম পুজা-অর্চ্চায় পারলৌকিক ক্রিয়ায় কালক্ষেপ করেন, সেখানে শ্রীগুপ্ত এক বলিষ্ঠ ব্যতিক্রম। তিনি সময়কে অতিবাহিত করেন না, ব্যবহার করেন। এই সুস্থ ও সুষ্ঠু মানসিকতা তাঁকে ইতোমধ্যে তিনটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। চতুর্থ গ্রন্থটি প্রথম তিনটির মত নয়। ভিন্ন স্বাদের স্পর্শতায় আনে লেখকের মনের থেকে পাঠকের মনে। এ লেখাটির মূল সুর বা প্রবণতা হলো সম্বেদনশীলতা। লেখক, তাঁর স্পর্শকাতরচিত্তে 'নিখিলের সুখ নিখিলের দুখ'কে অনুভব করেছেন। সহৃদয় হৃদয়সাম্বদ্যতার নিয়মে সেই মানবিক আবেদন, তিনি পৌঁছিয়ে দিয়েছেন পাঠকের মনেও। অনেকের মনে হতে পারে যে, লেখক এ লেখায় যাঁদের কথা বলেছেন, তাঁরা সকলেই লেখকের চোখে বা মনে যেভাবে উপস্থিত হয়েছেন লেখক তাঁদের সেইভাবে উপস্থাপিত করেছেন। কথাটা সত্য ঠিকই। কিন্তু এও সত্য যে, লেখার মধ্যে যাঁরা বর্ণিত বা বিধৃত হয়েছেন, তাঁদের কারো ছায়াচিত্র এখানে দেওয়া হয়নি। লেখকের কাছাকাছি আসায় কাছ থেকে দেখা বহু বিচূর্ণ মানুষ, বিদীর্ণ মানুষ এখানে মূর্ত হয়ে আছেন। সুখ-দুঃখাবহ পরিস্থিতি মানুষকে যেভাবে তৈয়ারী করে সেই প্রস্তুতির পদ্ধতি তিনি বিবিক্তভাবে অবলোকন করেছেন এবং তাকে প্রকাশও করেছেন। আমাদের আশেপাশে এমন বহু জীবন গড়ে ওঠে---গুঁড়িয়ে যায়---গভীর সমবেদনা এবং তাদাত্মিকতা বা identification না থাকলে, সেসব জীবনের পরিচয় নেওয়া বা দেওয়া শক্ত। লেখক সে প্রয়াস করেছেন। তাঁর লেখার কেন্দ্র তিনি নিজে তথা তাঁর বাল্যজীবনসহ বেড়ে ওঠার কালে শুরু করেছেন। একদিক থেকে তিনি উপনীত হয়েছেন বাল্য থেকে কৈশোরে---কৈশোর থেকে যৌবনে এবং গার্হস্থ্যজীবনে, কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। এই প্রতিটি ধাপেই জীবন পূর্ণতর হয়েছে বহু জীবনের স্পর্শে। কেহই তাঁর কাছে উপেক্ষণীয় নয়। প্রতি শিশুর চিত্তেই তার পিতৃমাতৃ ব্যক্তিত্ব ছায়াপাত করে। অনিবার্যভাবে এখানেও লেখকের শৈশব উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে এক সৎ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দম্পতির স্নেহে তথা শাসনে। মাতৃচরিত্র হয়ে উঠেছে এক

গভীর করুণাময়ী অথচ তেজস্বিনী নারীর চিত্র। পিতামাতাকে কত যে সহ্য করতে হয় এবং কতখানি বেদনা পরিপাক করতে হয় তা আমাদের চোখে সহসা এভাবে পড়ে না। লেখক সু এবং কু কোনোটাই এড়িয়ে যাননি। এরই মধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্ব সুপরিণত হয়ে উঠেছে। 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে'—দুটি ব্যাপারকেই তিনি সতত প্রতিবাদ করেছেন। এ সত্ত্বেও বলা প্রয়োজন, এ গ্রন্থ আত্মজৈবনিক রচনা নয়—জীবনের কাহিনীগুলি ভিত্তি করে রচিত এ গ্রন্থ একপ্রকার নূতন শৈলীর বা technique তিনি অবলম্বন করেছেন। গ্রন্থের নামটি তাই বিশেষ অর্থবহ।

আমাদের জানা আছে, প্রাচীন লোককথা, লোকশিক্ষা যে-কোনো মাধ্যম নিয়েই এই বিশ্বে বিধৃত হয়ে থাকে বা আছে। ভারতবর্ষ তথা বঙ্গসংস্কৃতি তার ব্যতিক্রম নয়। লোককথা লোকগীতির মত আরও একটি শিল্পপ্রবণতা গ্রামীণ মহিলাদের মধ্যে লোকচক্ষুর অন্তরালে বেড়ে উঠেছিল। এটি হোলো সীবন শিল্প। এ সীবন শিল্প নিতান্তই গ্রাম-ঘরের পাঁচজনা মহিলা একত্র হয়ে, কিম্বা একাকী বসে ছিন্ন কাপড়ের টুকরো সেলাই করে জুড়ে নিয়ে প্রস্তুত করতেন কাঁথা। এ কাঁথা শুধু কাঁথা সেলাই নয়—এতে থাকত তাঁদের মত মানুষদের নীরব ধৈর্য, কঠিন পরিশ্রমসহ উত্তীর্ণ এক স্নিগ্ধ চিত্রশিল্প। এ শিল্পে বিধৃত থাকত তাঁদের জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, জয়-পরাজয়, বেদনা-বাসনার, উত্থান-পতনের ইতিহাস —সারাজীবন কেটে যেত এই কাঁথা শিল্প রচনাতে। এক প্রজন্ম শুরু করলেও দ্বিতীয় প্রজন্ম পর্যন্ত তা প্রসারিত হয়ে যেত। কাঁথায় ফুটে উঠত নকশা—এসব কাঁথায় থাকত দু'শ সূচ নয়ত এক'শ সূচ। এ শুধু সময় কাটানোর ব্যবস্থা নয়, সময়কে ধরে রাখারও প্রয়াস এবং এর মধ্য দিয়ে সময়সীমাকে শিল্পোত্তীর্ণ পরিণতি দেবারও একটা প্রয়াস এতে মিলে যায়। এই বিচিত্র সীবন শিল্প হলো নকশি কাঁথা। এসব নকশি কাঁথায় চিত্রিত থাকতে পারত বর্গীর লড়াই, শিশুর মুখ, আবার এরই সঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের ঘরের তরুণ-তরুণীর অপূরিত প্রেম করার ছবিও। (দ্রষ্টব্যঃ নকশি কাঁথার মাঠ—কবি জসীমৃউদ্দীন রচিত) কাঁথাতে বিধানো থাকত —দু'শ বা এক'শ সূচ—ভিন্ন রং-এর সূত্রসহ। যখন যেমন সম্ভব কিছুটা সীবন কার্য এইভাবে রচিত অথবা নির্মিত হত। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক তাঁর গ্রন্থনা পদ্ধতিকে নকশি কাঁথাগত তুলনা করেছেন। এ প্রয়াসটিও অভিনব হিসাবে অভিনন্দনযোগ্য।

নকশি কাঁথার সীবনরীতি অথবা উপাদান অতি সাধারণ জিনিস দিয়ে

আহরিত। তাতে ভার জমা হয় না অথচ শিল্পীর হৃদয়ভার প্রশমিত হয়। যে কোনোও রসোত্তীর্ণ রচনার একটা বড় উদ্দেশ্যও তাই। আমাদের দেশের সীবন শিল্পীরা গত হয়েছেন---রেখে গেছেন তাঁদের মৌলিক প্রয়াস এবং তার মধ্যে দিয়ে অভিব্যক্ত জীবনবোধ ও জীবনস্বাদ। অবশ্যই সীবনরীতি সর্বত্র সমান হয় না---রং মিলানোও হয়ত দোষদুষ্ট হতে পারে। কিন্তু সব মিলে যা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হলো একপ্রকার নির্মাণকুশলতা---নকশি কাঁথা হয়ে ওঠে শিল্প প্রকরণ। লেখকের এই রচনায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধরা পড়েছে উপাদানের আহরণের আড়ালে আত্মগোপন অথবা চরিত্রগুলিকে অবগুন্ঠিত রাখা। এগুলি যদি যৎসামান্য ত্রুটি বলেও ধরা যায়---তবুও তা অপরিহার্য একথা মনে রাখতে হবে। সমগ্র জীবন একটা বড় চালচিত্রের মত একটা আলিম্পন কৃতিত্ব এবং টুকরো-টুকরো উপাদান ছেঁড়াখোঁড়া ভুলে থাকার মত জিনিসকে একত্রীভূত করে একটা পরিণত সামগ্রিক শিল্পে উত্তীর্ণ হওয়ার রূপ বিশিষ্টতা। এই কাঁথা শিল্প নিজের নিয়মে গড়ে চলে, অগ্রসর হয়। লেখকের রচনাও সেইভাবে নিয়ন্ত্রণ কৌশলে পরিপাটি বিস্তার ও প্রসার লাভ করেছে। লেখক তটস্থ হয়ে থাকেননি। সমস্ত পর্যায়ের মধ্যে তাঁর গমনাগমন প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ গোচর হয়ে আছে। তাঁর দৃষ্টি ও হৃদয় দুই-এ মিলে তীক্ষ্ণ সূচী ও গেঁথে তোলার সূত্র হাতে ধরে এগিয়ে চলেছে। সেইজন্য এই গ্রন্থ শুষ্ক ভারীও নয়---অথচ গ্রন্থাপনার গুণে একটি বিশিষ্ট শিল্পরূপ প্রাপ্ত হয়েছে।

কিন্তু লেখকের এ-গ্রন্থকে উপাদানের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যে উপন্যাসের সমধর্মী বল্লে ভুল হবে। উপন্যাসে লেখকের স্বাধীনতা থাকে---এক-জনের মাথা অন্যের কাঁধে স্থাপিত করার। লোকগুলিকে চেনা চেনা মনে হলেও ঠিক চেনার অবকাশ থাকে না। ঔপন্যাসিক উপস্থাপনায় একটা কোনও জটিল তত্ত্বমীমাংসার প্রশ্নও থাকতে পারে। উপন্যাসকার নিজে থেকে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে পুতুলনাচের মত কিছুদূর স্বাধীনতা দিতে পারেন, অথবা নাও দিতে পারেন। উপন্যাস জীবনভিত্তিক হলেও সত্য হয় না। কিছুকাল পূর্বেও মৈত্রেয়ী দেবীর 'ন হন্যতে' গ্রন্থ উপন্যাস অথবা আত্মজীবনী, এ নিয়ে প্রশ্নোত্তর চলেছিল। পরে দেখা গেল তাঁর বক্তব্য সেটি উপন্যাসমাত্রই। আলোচ্য গ্রন্থের লেখকের এই নকশি কাঁথা শিল্প-ব্যঞ্জক রচনায় বিধৃত ঘটনাগুলি রূঢ় বাস্তব। লেখক সযত্নে এগুলি চয়ন করে গেঁথে দিয়েছেন। তাঁর সময়কালে তাঁর দেশে, তাঁর সমাজে, সংসারে তাঁকে দেখতে হয়েছে ছোটখাটো অনেক আয়োজন-প্রয়োজন। এসব

আয়োজন কোথাও ভেঙ্গে চূর্ণ হয়েছে, কোথাও বা পরিণত রূপ লাভ করে শিল্প হয়ে ফুটেছে। 'বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা বহু জীবনের সুখে-দুখে আঁকা--সেথা যুগের সঙ্গীত মাখা সুন্দর ধরাতল।' এই সত্যটি থেকে লেখক সজ্ঞানে বিচলিত হননি বলে আমাদের মনে হয়েছে। জীবন-সমগ্র যে উপন্যাস কল্পনার চাইতে মহত্তর সত্য এবিষয়ে আমাদের সন্দেহ মাত্র থাকে না বলে মনে করি, এ গ্রন্থকে উপন্যাসধর্মী বলে মনে করা ঠিক হবে না।

কথাশেষে একটাই কথা থাকে--এটি হলো মানবিকতা বা humanism। এই humanism প্রাচীন কালে ছিল না। ধর্মশাস্ত্রে আর যাই হোক humanism টা পাওয়া যাবে না। মানুষকে দেবোত্তর কল্পনায় স্থাপন করা ধর্মীয় উপস্থাপনা--সেটা মানবীয় নয়। মানবিকতা হলো একভাবে আধুনিক মননের ফসল। ধর্মশাস্ত্রে জীবপ্রেম ও ঈশ্বরপ্রেমকে এক বলা হতে পারে। ঈশ্বরকে ভালোবাসলে মানুষকে ভালোবাসা সম্ভবপর এরূপ বলা যেতে পারে। কিন্তু এ ভাবনাকে মানবিক ভাবনা বলা যায় না। মানুষকে মানুষ বলে জেনে মানবীয় তুচ্ছতা দুঃখসুখ সংঘর্ষ ও সাধনা সবটুকু মেনে নিয়েও যে মানুষকে গ্রহণ করা, মানবিকতা তারই নাম। এটি সম্ভবত ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসের অন্যান্য ফসলের মত একটি পরিণত ফসল বলা যেতে পারে। এ জাতীয় ভাবনার প্রথম উন্মেষ আমরা দেখি ষোড়শ শতকে শেক্সপীয়রীয় রচনায়। ধরা যাক হ্যামলেট চরিত্রে to be or not to be এই আশা-নিরাশায় দোদুল্যমান অথচ প্রদীপ শিখার মত চৈতন্যে দেদীপ্যমান এই 'মানব'কে আমরা তথাকথিত শিক্ষিত মানসে গ্রহণ করেছি। ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য বাদ দিয়ে এ জাতীয় মানসিকতার মৃদু পদপাত বঙ্কিম, মধুসূদনের রচনায় লক্ষ্য করার মত। এর পরিস্ফুটন ঘটে রবীন্দ্রনাথের 'নারী ও পুরুষ' উভয় চরিত্রেই। এতো গেল সাহিত্যের কথা। সাহিত্য বাদ দিলেও মানুষ তো মানুষই। সেই মানুষকে সোজা চোখে দেখা ও সোজা মনে গ্রহণ করার যে প্রশিক্ষণ তা যুক্তিনির্ভর তথা হৃদয়সাপেক্ষ। এ-দুটির একত্রীকরণ না হলে মানুষকে বিচার করা শুধু নিষ্ফল নয় দোষেরও। কারণ মানুষকে দেখতে হয় তার সমগ্র পারিপার্শ্বিক নিয়ে। সে কেমনটি হলো--যেমনটি হলো--এর আংশিক উত্তর সেখানে পাওয়া যায়।

আমরা আমাদের আচার্যদেব সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মুখে সাহিত্য ও কল্পনার উক্তি শুনতাম--'আমি মানুষ, মানুষী সব কিছু

আমার আগ্রহ জাগায়।' এই মানব মহাসমুদ্রে অবগাহনের ইচ্ছা ও জীবনরস পিপাসা আধুনিক জীবন জিজ্ঞাসার অন্তর্ভুক্ত। এধরনের আগ্রহ লেখার মধ্যে থাকলে আমরা সে লেখককে সৎ ও জীবননিষ্ঠ লেখক বলেই গ্রহণ করি। তিনি তথাকথিত জনপ্রিয় বা popular লেখক নাও হতে পারেন। আজকের দিনে সাবানের ফেনপুঞ্জের মত অজস্র জনপ্রিয় রচনা আমাদের বঙ্গসাহিত্য ক্ষেত্রকে পিচ্ছিল করে তুলছে বা তুলেছে বলা অসঙ্গত হবে না। সেক্ষেত্রে নতুন ভাবনার পরিচায়ক কিছু রচনার পরিচয় বাঙ্গালা সাহিত্যে নবীনমাত্রা যোগ করে। অপরদিকে আমরা আশান্বিত এই যে সাহিত্য সমগ্রের মূল ধারাটি নানা বিপর্যয়ের মধ্যেও সতত প্রবহমান রয়েছে। একথা আলোচ্য গ্রন্থ সম্পর্কে বলা ভুল হবে না।

সর্বশেষ বলার কথা একটিই। Reality, fiction-এর চাইতে আশ্চর্যজনক। কারণ সেটা সর্বাবস্থায় বাস্তব। এই বাস্তবের ওপর কোনও পলাস্তারা চলে না। শ্রীরমণ গুপ্তের এই রচনায় বিধৃত বিশেষ বিশেষ চরিত্র যেন এক একটি type-ও বটে। তিনি নিজেকেও সেই মানবজীবনের চিত্রকল্পের অঙ্গীভূত করেছেন—সেইজন্য তিনিও বাস্তবানুগ। তিনি সাক্ষীস্বরূপ হয়ে বর্ণনা করেননি। তাঁর মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগ্নী, আত্মপরিজন, পত্নী তথা সহকর্মী, প্রতিবাসী সকলকে নিয়ে তাঁর গতি। যেখানে তিনি পারেন হস্তক্ষেপ করেন, যেখানে পারেন না অন্তত স্থূল হস্তাবলেপ থেকে দূরে থাকেন। সর্বোপরি তিনি একটি পরিচ্ছন্ন দৃষ্টির অধিকারী হিসাবেই মানুষের সহযাত্রী হয়ে মানুষকে ভালোবাসেন। এই গ্রন্থের চরিত্র বঙ্গসন্তান শুধু নয়—মানবসন্তান সকলেই। এই সংশ্লেষণও একটা বড় দিক বলে মনে করি।

কোনও গ্রন্থই সম্পূর্ণ দোষত্রুটি মুক্ত নয়, এবং গ্রন্থই উত্তরোত্তর পূর্ণতর যোগ্যতায় অভিব্যক্ত হতে পারে। লেখক সম্পর্কে আমাদের এই আশা তিনি স্বীয় নিষ্ঠায় ভবিষ্যতে পূর্ণ করবেন বলে মনে করি।

'শ্রীবাস্ত'
রোড নং ৬, রাজেন্দ্রনগর
পাটনা-৮০০০১৬

গোপাল হালদার
অরুণা হালদার

বয়স সাত দশক পেরিয়ে চলেছে। আমার একজন অতি স্নেহশীল বন্ধু কথায়-কথায় একদিন জিজ্ঞেস করে বসলেন ঃ জীবনের শেষপ্রান্তে এসে কী মেসেজ রেখে যাবেন আপনার স্বজন-পরিজন, আত্মীয়-অনাত্মীয়দের কাছে ?

প্রশ্নটা সত্যি ভাবিয়ে তোলার মতো। কোনদিন তো একথা চিন্তা করিনি যে আমারও কিছু বলার থাকতে পারে। শুধু বড় বড় মানুষদেরই তাদের জীবনসন্ধ্যায় কোনো মেসেজ রেখে যাওয়ার অধিকার থাকবে কেন ? এটা কোনো অধিকার বহির্ভূত ব্যাপার নয়, স্বাধিকার নীতির প্রশ্নও জড়িত নেই। মানুষ মাত্রই তার নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা নিয়ে কিছু বলার অধিকার রাখে। জীবন থেকে সংসার থেকে সে কী পেল, তার হিসেব-নিকেশ করে সার কথাটুকু সেও বলে যেতে পারে। তাহলে আমিই বা পারব না কেন ?

জীবনপাঠের সবারই একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী থাকে। তবে হ্যাঁ, আমার কথা যে সর্বজনগ্রাহ্য হবে, এমন ধৃষ্টতা আমার নেই। আমার মেসেজ আমার জন্যই তোলা থাকবে। পরবর্তী প্রজন্মের মানুষ শুধু এটুকুই জানুক, আমার জীবন কীভাবে কেটেছে, কতটুকু ভোগ করেছি, কী পেয়েছি আর কী পাইনি। নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষাই বা কতটুকু পূর্ণ করতে পেরেছিলাম, তারও নিরূপণের প্রয়োজন আছে বৈকি। আমার ন্যায়-অন্যায়ের বিচারটা আত্মজরাই করবেন। সেখানে মানুষ স্বভাবতই দুর্বল, স্বীয় দোষ কেউ স্বীকার করে না। আমার নিজের বিহ্বলতা এবং চিত্ত-বিকার কতখানি কাকে আঘাত দিয়েছে, সেটার পরিমাপ করাও দুরূহ। নিজের দোষ যে স্বীকার করতে পারে, সে তো বড় মাপের মানুষ।

একটা কথা এখনও হৃদয় দিয়ে অনুভব করি যে, পুরনো মানবিক মূল্যবোধগুলো যদি ঠিকমত বজায় রাখা যায়, তবে জীবনে কিছুটা সুখী হওয়া যায়। শুধু সামাজিক বিবর্তনের দোহাই দিয়ে, এবং অর্থনৈতিক কারণ দর্শিয়ে, নূতনত্বের দিকে এগিয়ে চললে কষ্টের সীমা নেই। তাছাড়া মানবিকতার দিক থেকে নবীন মূল্যবোধ গড়ছে কোথায় যে সেটাকে আঁকড়ে থাকব ? যখন হবে, তখন আমার জীবনে সেটা দেখা সম্ভব হবে না।

প্রাচীন মূল্যবোধ এখনও অনেক গৌরব বহন করে এবং আমাদের

জীবনটাকে সফল করতে সক্ষম। রক্ষণশীলের মতো আমি একথা বলছি না। এটা আমার নিজের জীবনের উপলব্ধি। বর্তমানের পৃথিবী ও সমাজ আমাদের অনেক কিছুই দিয়েছে। বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক সম্পদ আহরিত হয়েছে। হয়নি একটা জিনিস, সেটা হোলো মনুষ্যত্বের বিকাশ, হৃদয় দিয়ে হৃদয় পাওয়ার সারবস্তুটুকু ক্রমশ যেন অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। তাই মানুষ আর মানুষ নেই, অন্দরের পশুটাই যেন বেরিয়ে পড়ছে সর্বত্র, কী ঘরে, কী বাইরে। শিষ্টতা ভদ্রতার বদলে পশুত্বের ভয়াল রূপটাই প্রতিফলিত হচ্ছে। সবাই সবাইকে সন্দেহের চোখে দেখে। কোনো কিছু ভালো করলেও মনে করে এর পেছনে কোনো উদ্দেশ্য নিহিত আছে। তাই ভালোটা ভালো চোখে দেখতে কষ্ট হয়।

পঞ্চাশ বছর আগেকার যে কোনো বাঙালীর সংসারের ছবিটা দেখলেই মনে হবে, আমরা একাত্মবোধ থেকে কতখানি সরে এসেছি। আগেকার আমলের ঠাকুমা-দিদিমা, মাসী-পিসীর দল এখন যেন কোথায় হারিয়ে গেছেন। এখন এঁদের ঠাঁই নেই কোনো সংসারে। অথচ একসময় এঁরাই ঘিরে রেখেছিলেন এক একটা সংসার। বাঁচিয়ে রেখেছিলেন অনেক মা-হারা শিশুকে। এখন তো অনেক ছেলেমেয়ে জানেও না মাসী-পিসী কী জিনিস। জানবে আর কেমন করে? এখন যে তাঁদের দূরে ঠেলে রাখা হয়েছে। বোনপো, ভাইপোদের প্রতিও আর টান নেই সেই পিসিমা ও মাসীমাদের, ক্রমশ বিচ্ছিন্নতায় পরিণত হয়েছে সবাই।

এমন কী বাপ-মাও সেই সব সংসারে হয়ে পড়েছেন একটা সমস্যা-বিশেষ। আগে বলা হোতো, পঞ্চাশোর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ। এখন যে কোনো বন নেই আর, ন্যাড়া করে সেখানে তৈয়ের হয়েছে বিশাল বিশাল কারখানা। কাজেই খোঁজ পড়ছে বৃদ্ধাশ্রমের। কাশীবাসী হওয়াও তো বিপদ, কাড়ি কাড়ি টাকা চাই এখন সেখানে বাস করতে হলে। আগের দিনের পাঁচসিকে-দশসিকের যুগ চলে গেছে অনেক দিন, যা দিয়ে একটা মানুষের আধ-পেটা খেয়ে মাস চলে যেতে পারত। তাছাড়া এখন একটা প্রেস্টিজেরও কথা রয়েছে। আগে কাশীবাসী হলে মনে করত সবাই জীবনের শেষ অধ্যায় কিছু পুণ্যসঞ্চয়ের খোঁজে গেছেন। এখন গেলে যে সবাই বলে উঠবে, বাপ-মা থাকতে পারলেন না ছেলের সঙ্গে বা ছেলে তাঁদের রাখতে চাইলে না, তাই তাঁরা অন্যত্র ডেরা বেঁধেছেন। কাজেই ওসব ঝামেলায় গিয়ে কাজ নেই, বৃদ্ধাশ্রমে থাকাই ভালো।

এমন ধারণাই কিন্তু বেশীর ভাগ ছেলে-বউয়েদের। বুড়োবুড়ীকে

বাইরে কোথাও ঠেলে দিয়ে সংসারে শান্তি ও প্রাচুর্যের বহর দেখতে চায় তারা। কিন্তু সত্যি কী সেসব সংসারে সুখশান্তি বিরাজমান? আর্থিক কষ্ট হয়ত না থাকতে পারে, কিন্তু সংসার-যাত্রায় প্রতিদিনের যে-সংঘাতের মুখোমুখি হোতে হয় এদের, সেই কষ্ট যে আরো বেশী সাংঘাতিক।

আগের দিনের বাড়ীর যে-কোনো বউয়ের পেটে বাচ্চা এলে কেউ টেরও পেতো না। মাসীমা, পিসিমা, ঠাকুমা, দিদিমাই সামলাতেন সব কিছু। তাঁদের জিম্মায় সবাই নিশ্চিন্ত থাকত। কিন্তু এখন বউয়ের ছেলেপুলে হবে জানলে, চিন্তায় পড়তে হয়। সেই বউ বাপের বাড়ী যাবে, না, ছেলের কাজের জায়গায় কোনো নার্সিং-হোমে থাকবে। তারপর প্রসবান্তিক সব ঝামেলা সামলাবার জন্য ছেলেকে অফিস থেকে লম্বা ছুটি নিয়ে বসতে হবে। হোটেল থেকে আনিয়ে নিতে হবে রোজকার খাদ্য। এখন তো আবার অনেকে বউয়ের গর্ভবতী অবস্থাকে মনে করে একটা রোগবিশেষ। কাজেই পেটে বাচ্চা আসার পর থেকেই সব কাজকর্ম থেকে রেহাই দিয়ে তাকে দিতে হচ্ছে সম্পূর্ণ বিশ্রাম। ফলে, সেই সব সংসারে প্রবেশ করছে বিস্ময়কর বিভ্রান্তি। দৈনিক আনন্দটুকুও হারিয়ে ফেলছে তারা। দিবারাত্র ঠোকাঠুকি ও প্রাত্যহিক কলহে অতিবাহিত হচ্ছে দিনগুলো। সেই সময় কিন্তু তাদের মনে পড়ে যায় মা-বাবার কথা, ভেসে ওঠে সেই সব ছবি যেখানে কাকা-কাকীমা, জেঠা-জেঠিমারা এক একটা সংসারের সব দায়িত্ব সামলে কীভাবেই না খেটেখুটে শরীর-পাত করতেন। সবাইকে খাইয়ে-দাইয়ে বৌঠানের দল যার যার পাতে ভাত বেড়ে হাঁড়িকুড়ি নিয়ে বসতেন। হাঁড়ি চেছে, বেগুন ভাজার অবশিষ্ট তেলটুকু দিয়ে, সাপটে-সুপটে সারতেন ভোজনপর্ব। তা সত্ত্বেও মুখ হাঁড়ি করে থাকতেন না কেউ। আহারের পরে খিলিপান মুখে দিয়ে, বিশ্রামের নাম করে গা এলিয়ে দিতেন মেঝেতেই।

এই অবস্থাটাও যে খুব ভালো ছিল, এমন কথা বলব না। বলতে চাইছি, শুধু তাঁদের মনের জানালাটা কতখানি খোলা ছিল। শুধু নিজের স্বামীর বা ছেলেমেয়ের ভাবনা নিয়ে বসে থাকতেন না তাঁরা। সবার মুখেই ছিল আনন্দ। নিজেরটুকু নিয়ে কখনো ব্যস্ত থাকতেন না। এঁদের মধ্যেও যে কোথাও কোথাও ব্যতিক্রম ছিল না তা নয়। তবে সব সংসারেই ছিল একটা মাতৃসুলভ স্নেহবন্ধন। তাই কেউ কাউকে বাদ দিয়ে নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করতে পারতেন না। একটা পারিবারিক শৃঙ্খলায় আবদ্ধ ছিল সবাই। বাড়ীর কর্তার ওপর কারুর হুকুম চলতো না। তাঁকে না বলে কারুর কোথাও কিছু করার সাহসও হোতো না।

এখন যেন সব উল্টো ধারায় চলেছে। একটা সংসারে থেকেও একটু আলাদা আলাদাভাব, যেমন---নিজের বাচ্চার জন্য চাই আলাদা দুধের কৌটো, স্বামী ভালোবাসেন একটু বেশি চা খেতে, তাই একটা আলাদা পাট, নিজের ঘরের ছোট্ট একটু কোণ ঘেঁষে। সেখানে আবার মাঝে মাঝে সবার চোখের আড়ালে ডিমসেদ্ধ করে খাওয়াতে হয় ছেলেমেয়েকে, কখনো কখনো স্বামীকেও। আলাদা করে কৌটোতে থাকে বিস্কুট, পাঁউরুটি বা জেলি।

এইভাবেই কিন্তু শুরু আপন পরের চেতনা, স্বার্থসিদ্ধির নানা কুটিল কৌশল। তাই পদে পদে হয়েছে অশান্তির সৃষ্টি। একদা কলহবিমুখ ছিলেন যাঁরা তাঁরাও এই সব অনাসৃষ্টি কাণ্ডকারখানা দেখে শেষ পর্যন্ত মুখ খুলতে বাধ্য হন। ফলে, সংসারে শান্তি বজায় রাখা হয়ে ওঠে কঠিন। কাজেই প্রাত্যহিক কলহবিবাদের মধ্যে না থেকে একে একে হয়ে যান পৃথকভাবাপন্ন। সেখানে মা-বাবার স্থান গৌণ, বৃদ্ধ বয়সে তাঁদের দেখবে কে, সেই ভাবনায় কাজ কী? ওপরওয়ালা যখন শরীরটা দিয়েছেন তখন দেখবেন তিনিই। এই ধারণা অনেকেরই, নিজের ছেলেমেয়ে বউ ঠিক থাকলেই হোলো।

আমার বাবার কথা খুব ভালোভাবে মনে পড়ে। ছিয়ানব্বই বছর বয়সকালে মারা গিয়েছিলেন। মাত্র চার বছরের জন্য শতায়ু হোতে পারেননি, তা না হোলে ইচ্ছে ছিল শতবার্ষিকী উৎসব করার। তিনি সদাই মনে করিয়ে দিতেন, ফুৎকারে সব টাকাপয়সা উড়িয়ে দিও না, সঞ্চয় করে রাখবে রোজগারের কিছু অংশ। টাকা থাকলেই কিন্তু সবাই নিকটে আসে। যেদিন সব কিছু বিলিয়ে দিয়ে নিজেকে নিঃস্ব করে ফেলবে, সেদিন থেকে জানবে তোমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। তুমি তখন হবে অনাদৃত, অবহেলিত। তোমার দুঃখকষ্টের শুরু হবে তখন, তোমার অবস্থানটাই হবে সবার চোখে পীড়ার বিষয়।

পিতৃদেবের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যের প্রকাশ নিজের চোখেই দেখেছিলাম একটি পরিবারে কিছুদিন পরেই। বিপত্নীক পিতা দেশের বাড়ীর জমি-জমা সব একমাত্র ছেলের নামে লিখে দিয়ে চলে এলেন শহরে যেখানে তাঁর পুত্র কোনো এক নামকরা প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে। দুই নাতি-নাতনী এবং পুত্রবধূ সমভিব্যাহারে জীবনের শেষ কদিন ভালোভাবে কাটাবেন এই প্রত্যাশা নিয়ে। সন্তানের প্রতি স্নেহভালোবাসার দানস্বরূপ সমস্ত কিছুই বিলিয়ে দিলেন ছেলেকে। নয়ত বেশ ছিলেন দেশের বাড়ীতে।

জনমজুর খাটতো ক্ষেতখামারির কাজে। ঘরে সময়মত ফসলও তুলে দিত তারা। সেসব বিক্রী করে ভালোই চলে যেত দেশের ঘরের জীবন। কী খেয়াল হোলো ছেলের কাছে থাকবেন শহরে। দূরে থাকলে যদি ছেলের হাতে মরার সময় জল না পান, তাহলে সে দুঃখ রাখার জায়গা থাকবে না। লোকে ছেলেকেও টিটকারি দেবে। তাই দেশের পাট চুকিয়ে, চলে এলেন ছেলের সংসারে।

শহরে ছেলের কাছে এসে নাতি-নাতনী এবং বিশেষ করে তাদের মায়ের আচার-ব্যবহারে কেমন যেন ঠেকতে লাগল তাঁর। দেশের বাড়ীতে থাকাকালীন চিঠির ভেতর যেরকম অন্তরঙ্গতার সুর থাকত, সেটা যেন বেসুরো হয়ে বেশ শ্রুতিকটু হয়ে পড়ল।

বউমার কোনো ভ্রূক্ষেপই থাকে না সময়মত শ্বশুরের খাওয়ার ব্যবস্থাটা করে দেওয়ার। ছেলে তো বাইরে বাইরেই টুরে থাকে অফিসের কাজে। এসব তো তার নজরে পড়ার কথা নয়। ক্রমশ যেন বউমার কথাবার্তাও বদলে যেতে লাগল। সব সময় একটা চোপামুখ। বৃদ্ধ শ্বশুরের স্থায়ী-ভাবে এই সংসারে জুড়ে বসাটা, কিছুতেই যেন সহ্য করতে পারছে না।

সকালে বাসিমুখে চা খাওয়াটা শ্বশুরের অভ্যাস নয়। বেলা বাড়লে একবাটি দুধে কিছু মুড়ি বা চিড়ে দিয়ে সেটা খেয়েই সকালের প্রাতরাশ সারতেন দেশের বাড়ীতে। কিন্তু এখানে তো সেটা উনি আশা করেন না। তার বদলে এক বাটি মুড়ি ও এক কাপ চা একটু বেশি দুধ দিয়ে হোলেই চলে। কিন্তু সকালে দুবার চা হবার যে উপায় নেই এই বাড়ীতে। তাতে নাকি অযথা খরচ বাড়ে। সুতরাং কিছু মুড়ি বা চিড়ে নড়বড়ে দাঁত দিয়ে শুকনোভাবেই চিবোতে হয় তাঁকে। সেটাও সয়ে নিলেন তিনি, যেখানে থাকব, সেখানকার সেই ব্যবস্থাটা মেনে নেওয়াই ভালো মনে করলেন।

দুপুরের আহারটা পেতেন বেলা দুটো আড়াইটায়। সেটাতেই একটু কষ্ট হোতো বেশি। ছেলেমেয়ে দুজনে স্কুল থেকে ফিরে এলে তবে দুপুরের আহারপর্ব শুরু। ওরা ফিরত দুটো নাগাদ। আলাদা করে এক একজনের আহারের ব্যবস্থায় নাকি অনেক অসুবিধা। সেই সময়-টাতে বউমা একটু গা এলিয়ে নেয় বিছানায় সারা সকালের পরিশ্রমের ক্লান্তি দূর করার জন্য। বৃদ্ধের কিছু বলার নেই---যে বাড়ীর যা নিয়ম। অগত্যা শেষবেলায়, আহার সমাধা করতে করতে শরীরের ওপর পড়ল প্রচণ্ড প্রভাব। শরীর যেতে লাগল ভেঙে। ছেলের কিন্তু নজর নেই এদিকে। বাবা তো বেশ শুয়ে বসে কাটাচ্ছেন বৃদ্ধ বয়সে!

রাত্রের আহারটাই হয়ে পড়ত বড় তাড়াতাড়ি। দুপুরের আহার হজম

না হতে হতেই রাত আটটায় ডাকাডাকি হোতো খাওয়ার জন্য। কারণ ছেলেমেয়েরা সারাদিন স্কুল ও পড়া শেষ করে, সন্ধ্যায় তাদের চোখ জড়িয়ে আসত তন্দ্রায়। কাজেই ওদের তার আগে না খাইয়ে দিলে ঘুম থেকে তুলে খাওয়ায় কার সাধ্য। অতএব সবাইকে এক সঙ্গে বসতে হবে, বৃদ্ধকেও তাই ক্ষিদে না থাকলেও বসতে হোতো খেতে।

সন্ধ্যার পর বৃদ্ধের চোখও জড়িয়ে আসত। সেটা বয়সের দরুন। একটু হাল্কা ঘুমও হয়ে যেতো কখনো কখনো। ডাকাডাকি করে জাগিয়ে তুলতে হোতো তখন। বউমার গলার স্বর একটু উগ্রই হয়ে পড়ত সেসময়। বৃদ্ধ ধড়মড় করে উঠে বসতেন চৌকিতে। কিছু না বুঝে, ভেবাচেকা খেয়ে, জিজ্ঞাসা করতেন---কেন ডাকছ বউমা? বউমার কী অতসবের উত্তর দেওয়ার ফুরসৎ আছে? এখন কত কাজ বাকী। ঝাঁঝালো সুরেই বলে উঠল বউমা---খেতে চলুন।

বৃদ্ধ হয়ত সরলভাবেই কথাটা বললেন---খেতে হবে এখন? আবার উত্তর এলো---এছাড়া আপনার আর কাজ কী?

বৃদ্ধ শ্বশুরের এবার চেতনা হোলো, বড় ভুল করেছিলেন দেশের বাড়ী ছেড়ে এখানে এসে নীড় বেঁধে। আর যে প্রত্যাবর্তনের উপায় নেই। দেশের জমিজমা সবই যে বিক্রী করে দিয়েছে ছেলে। এই হোঁচটের বড় ক্ষতটা যে নিয়ে যেতে হবে সঙ্গে।

আর একটি ঘটনা। ছেলে নামকরা আইনজীবী। মা বিধবা। স্বামীর মৃত্যুর সময় ছেলেকেই সব কিছু দিয়ে গেছেন, কিন্তু কোনো ব্যবস্থা করে যাননি নিজের স্ত্রীর জন্য। ধারণা, ছেলেই তো রয়েছে একটা মস্ত-বড় সম্পদ!

বাড়ীতে ছেলেমেয়ে, বউমা সবই আছে, এমন কি একটা বাঘের মতো দেখতে বিশালাকার এ্যালসেশিয়ান কুকুর। কর্তার প্রাতঃকালীন ভ্রমণের সঙ্গী। মোটা শেকল ছিঁড়ে যাবার উপক্রম, বাইরে বেরোলে ধরে রাখা যায় না, এমন শক্তি গায়ে। কুকুরটিকে এক নিমেষের জন্য না দেখলে কর্তার কাজে মন বসে না। কাজেই সেই সারমেয়টির স্থান কর্তার অফিসঘরে। দিব্যি গুটিশুটি মেরে বসে থাকে প্রভুর পায়ের পাশে। এয়ারকূলারের হাওয়া না খেলে, ছটফট করতে থাকে গরমে।

কিন্তু মায়ের ঠাঁই, সেটা কয়লা রাখার ঘরে।

আগের দিনে তো কোনো রান্নার গ্যাস ছিল না, তাই সব বাড়ীতেই থাকত একটা করে কয়লা-ঘুঁটে রাখার আলাদা ঘর। ছেলেটি যথেষ্ট

রোজগেরে, কিন্তু হোলে কী হবে, বউ-এর দাপটে মাকে দালানের কোনো ঘরে রাখা চলবে না। ছেলের এতে সায় না থাকলে একা বউটিরই বা দোষ দেওয়া যায় কী করে? অসুখে-বিসুখে পড়লে তো দুর্দশার চূড়ান্ত। আর হোলোও তাই। ডাক্তারের ব্যবস্থা হোলেও, পথ্যের ব্যবস্থা আলাদা হোতে পারত না। পাচকঠাকুর রুগীর রান্না করতে জানে না, তাতে ঝামেলাও অনেক। কাজেই বাড়ীর সাধারণের যা রান্না, বৃদ্ধাকেও তাই খেতে হোতো। এতে অসুখ সারা তো দূরের কথা, অন্যান্য উপসগ বেড়ে উঠে আরো কাহিল করে দিল মাকে।

কখনো কখনো দশ হাত দূর থেকে ছেলে আর তার স্ত্রী খোঁজ নিতেন মায় শরীরের। মায়ের সেই নীরব ক্রন্দন ও চোখের জল ছেলে ও বউমার কঠিন হৃদয় স্পর্শ করেনি একবারও।

মায়ের প্রতি ঝি-চাকরের মতো ব্যবহারে পাড়াপড়শীও স্তম্ভিত। তাদের মধ্যে একজন সুগৃহিণী, বৃদ্ধার প্রতি অনুকম্পা দেখাতে গিয়ে, একদিন রোষের কবলে পড়ে গেলেন এই পরিবারের। দোষের মধ্যে হয়েছিল উনি প্রায়ই নিজের কাজের লোকটিকে দিয়ে বৃদ্ধবয়সের রুগীর উপযুক্ত খাবার লুকিয়ে পাঠিয়ে দিতেন। এঁর সঙ্গে বৃদ্ধার অনেক আগে থেকেই পরিচয় ছিল, তাই সাহস করেই পাঠাতেন অনেকটা স্নেহভরে। বৃদ্ধার ছেলের চোখে যেদিন এটা ধরা পড়ল, দশটি কড়াকথা শুনিয়ে দিলেন ও-বাড়ীতে এসে নিজে। তখন থেকে বন্ধ হয়ে গেল বাইরে থেকে কোনো খাবার বৃদ্ধার কাছে আসাটা।

কয়েক মাস পরেই কিন্তু বৃদ্ধার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটল এবং উনি মরে গিয়ে বাঁচলেন।

খুব জাঁকজমক করে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হোলো তাঁর। শ-পাঁচেক লোক খাওয়ানো হোলো। সবাই বাহবা দিলেন, এমন মাতৃভক্ত ছেলে খুব কম দেখা যায় বলে।

পরে শুনেছিলাম, মাস ছয়েক পরেই মাতার প্রতি তথাকথিত স্নেহশীল এই মানুষটির ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে লোকান্তরিত হওয়ার কথা। ভীষণ কষ্ট পেয়েছিলেন এই রোগে। মারা যাওয়ার সময় শুধু মা মা রবই করতেন। জানি না, ঈশ্বরের বিধানই এই শাস্তি কিনা, না শরীরে ক্যান্সার-সেল অন্য কোনো জৈবিক কারণে গড়ে উঠেছিল তাঁর শরীরে। জাগতিক পাপপুণ্যের বিচার করা বড়ই শক্ত। পাপপুণ্য বলে কিছু আছে কিনা, তাই বা কে জানে?

আমি অবশ্য একথা বলতে চাই না যে সবাই পরার্থবাদে বিশ্বাস

রাখুক। যিনি পরার্থপর ব্যক্তি অর্থাৎ অপরের নিমিত্ত জীবনযাপন ও কর্ম করা নীতিতে আস্থাবান, তাঁর পক্ষে এই বিকৃত সমাজে বাস করা একটু কঠিন। পরার্থবাদ নীতিতেও কিন্তু একটু স্বার্থপরতার গন্ধ আছে। সবার মাঝে নিজেকে একটু আলাদা করে রাখার মধ্যে রয়েছে একটা অহমিকা, একটা ভিন্ন ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। একটু প্রচার পাওয়ার আকুতি।

বর্তমান সমাজে কেউ-ই নিষ্কাম নিস্পৃহ নয়। এটা সত্যি কথা। তবে হীন প্রবৃত্তিটা সংযত করে রাখা গেলেও রাখা যেতে পারে। মানুষ-মাত্রই অল্পবিস্তর স্বার্থান্বেষী। কেউ যদি বলেন, আমি নই, তাহলে বলতে হয় এধরণের ধাপ্পাবাজি না করাই ভালো। তবে এইটুকু আশা করা যেতে পারে যে, নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে অপরের ক্ষতিটা যেন চরমে না পোঁছয়। অন্যের সুবিধাটুকুর ব্যবস্থা বজায় রেখে নিজের প্রয়োজনটা মিটিয়ে নেওয়াই সব চেয়ে ভালো জিনিস। তা তো আর সব সময় হয় না।

এবার নিজের জীবনের গোড়ার দিকেই যাওয়া যাক। চার বছর বয়স থেকেই একটু বোধের উদয় হয়েছে। সমাজ কী, রাজনীতি কী, এসবের সঙ্গে পরিচয়ের অনুমান করার বয়স তখনও হয়নি। তবে হৃদয়ের যে সূক্ষ্মস্তর, তার সঙ্গে মিলন ঘটছিল ধীরে ধীরে। মায়ের সঙ্গেই সম্পর্ক ছিল বেশি, কারণ তাঁর কাছেই বাংলা বর্ণপরিচয় আরম্ভ হয়েছিল এবং দ্বিতীয় ভাগও শেষ করেছিলাম তাঁর কাছেই। নামতা ও অঙ্কের যোগগুণ করার পদ্ধতিগুলিও তিনিই শিখিয়েছিলেন। একটা বড় পিঁড়ির ওপর রান্নাঘরের একটা কোণে বসে পড়তাম। মা রান্না করতে করতেই শেখাতেন এসব। পরে আর একটু বড় হয়ে ইংরেজী শিখতে শুরু করেছিলাম বড়দাদার কাছে। ইংরেজী বর্ণ থেকে আরম্ভ করে তার শব্দ-গঠন সবই শিখিয়েছিলেন তিনি। মেজদাদা শেখাতেন ইংরেজীতে গণনা, অঙ্ক ইত্যাদি কারণ অঙ্কেতে ছিল নাকি তাঁর মাথাটা অনেক পরিষ্কার। কিন্তু হোলে হবে কী, আমার নিজের মাথাটা যে তেমন পরিষ্কার ছিল না, যে-কারণে উনি একবার দুবারের বেশি কোনো অঙ্কই শেখাতে চাইতেন না। ফলে ভালোরকম কয়েকটা চপেটাঘাতও মাঝে মাঝে পড়ত। সে কারণে মেজদাকে ভয় করতাম বেশি।

বড়দাদা কিন্তু পড়াতে খুব ভালবাসতেন। গল্পের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিতেন সব, কাজেই চট করে ধরে ফেলতাম পড়াটা। কিন্তু অঙ্কের বেলায় সেটা হোতো না। অঙ্কের প্রতি ভীতি এবং মেজদাদার পিটুনি

দুটোই আমাকে পাঁকাটির মতো করে রাখত। মেজদাকে দেখলেই কেমন যেন ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়তাম এবং মার কাছে বসে থাকতাম। পরে বড় হয়ে বুঝেছিলাম, পেটাই করে কাউকে কিছু বোঝানো যায় না। যে-বিষয় পড়ানো হবে, তার প্রতি আসক্তি গড়িয়ে তুলতে হবে, তবেই সে এগিয়ে আসবে পড়তে। অন্যথায় তাকে জোর করে পাচন গেলাবার মতো পড়ালে, সেটা মনের অন্দরে প্রবেশ করতে চায় না। ভীতিটাই বড় হয়ে দাঁড়ায়। তখন নিজেকে বাঁচাতে মিথ্যা কথা বলতেও আটকায় না। বাচ্চাদের তাই দেখা গেছে তোতলাতে। ভয়ে তাদের জিভ কথা বলার সময় আটকে যায়। বর্তমান কালের ডাক্তাররাও শিশুদের মধ্যে যে তোতলামি দেখতে পান, তার প্রধান কারণ ওটাই বলে সাব্যস্ত করছেন।

মাকে দেখতাম ঠিক অন্নদার মতো, পরের জন্য সমবেদনায় ভরা। কেউ দুদিন খায়নি শুনলে, নিজের আহারটুকু বিলিয়ে দিতেন তাকে। পরে এক বাটি শুধু ডাল খেয়েই পূর্ণ করতেন নিজের জঠর। ছোটবেলায় এমনি কয়েকটি ঘটনা দেখার পর মায়ের প্রতি প্রীতিভক্তি আরো বেড়ে ছিল।

একদিন হঠাৎ; তখন দুপুর গড়িয়ে পড়েছে, মা নিজের থালাতে ভাত বেড়ে খেতে যাচ্ছেন, সেই সময় পাশের বাড়ীর এক ছোট্ট দিদি তার চেয়েও ছোট ভাইটিকে নিয়ে ছুটে এসে রক্তাক্ত মাথায় মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে কান্না জুড়ে দিয়েছে। মাকে ওরা দিদিমা বলেই ডাকত। দুজনেরই চোখের জল থামতে চায় না, একটা কথাই বলে চলেছে দুজনে সমানে, দিদিমা, আমাদের বাঁচাও, আমাদের বাঁচাও।

মা'র পাতের অন্ন যেমনকে তেমনই পড়ে রইল। কোনোরকমে ওদের ছাড়িয়ে উঠে আসলেন পাশের বাড়ীর জানালার ধারে। চেঁচিয়ে কার উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন সেটা, তখন বুঝিনি। পরে জেনেছিলাম বড় হয়ে মার কাছেই। মাকে এধরনের চীৎকার করতে প্রথম দেখেছিলাম। চেঁচিয়ে বলে চলেছেন ঃ তোমরা যদি এদের রাখতে না চাও, দিয়ে দাও আমাকে। আমার সাতটা ছেলেমেয়ের সঙ্গে ওরাও মানুষ হবে। এই-ভাবে কেউ কাকেও মারে কখনো? পশু না হোলে কেউ এরকম পারে না। ছোট্ট দুটি ছেলেমেয়ে না খেয়ে রয়েছে বেলা দুটো পর্যন্ত, খেতে চেয়েছে বলে এই শাস্তি। মা না হয় সৎ-মা, কিন্তু বাপ তো নিজের।

মার পেছনে পেছনে আমিও ছুটে এসেছি ঘটনাটা কী জানতে। জানালার ধারে কিন্তু অন্য কোনো মূর্তি দৃশ্য হোলো না তখনও। মা গজগজ করেই চলেছেন। তখন পর্যন্ত পাশের বাড়ী থেকে কোনো জবাব আসছে না। কিছুক্ষণ স্থির থেকে মা চলে এলেন রান্নাঘরে। দুটি বাচ্চাকে,

তাদের রক্তাক্ত শরীর পরিষ্কার করে দিয়ে নিজের সব ভাত খাইয়ে দিলেন। পরে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন। নিজের খাওয়া কিন্তু সেদিন আর হয়নি মার।

এই ঘটনাটা আমার মনে সেদিন দাগ কেটেছিল সাংঘাতিকভাবে। নিঃশব্দে মার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করেছি কিন্তু একবারও জিজ্ঞাসা করার সাহস হয়নি, এমনটি কেন হোলো। মানুষ কী করে পশুর স্তরে নেমে এসে নিজের ছেলেমেয়েকেও এমনভাবে প্রহার করতে পারে? দোষের মধ্যে ছিল, ক্ষুধার তাড়নায় তারা শুধু দুই বাহু চোখের ওপর রেখে কাঁদ-ছিল। এটাই বাপের রাগের কারণবিশেষ।

সত্যিই তো কাঁদবে না কেন? ক্ষুধা যে এমন জিনিস যেটা মানুষকে পাগল করে দিতে পারে। এরা তো কেবল চোখের জল ভাসিয়ে সেই তাড়নার কথা প্রকাশ করছিল। তাদের মায়ের অভিযোগ হোলো এই যে, বাপ না খেতে তারা চাইবে কেন খেতে। বাপের কাজকর্ম সেরে খেতে বসতে হয় রোজ দুটো। তখন সবাইকে এক সঙ্গে বসতে হবে খেতে। ছোট শিশুর সেসবের জ্ঞানগম্যি হবার তো কথা নয়।

পরে জেনেছিলাম, বাপ দ্বিতীয়বার পাণিগ্রহণ করার পর থেকেই নাকি আগের পক্ষের এ দুটি সন্তানের ওপর চলত অকথ্য যন্ত্রণা। রাতেও নাকি সেই দশাই হোতো। রাত দশটার আগে এই শিশু দুটির রাতের আহার জুটত না কখনো। সন্ধ্যার পরেই যেসব বাচ্চাদের চোখ হয় ঢুলু-ঢুলু এবং মুহূর্তে ঘুমিয়ে পড়ে, তারা কখনো রাত দশটা অবধি বাপের প্রতীক্ষায় জেগে থাকতে পারে? মা যে এতখানি পাষাণ হোতে পারে সেটা নিজের মায়ের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলে তার তারতম্যটা বুঝতে পারতাম। আর ভাবতাম, মায়েদেরও কী এটা আর একটা রূপ? হোলেই বা সৎ-মা, মাতৃজাতির যে নিজস্ব একটা কোমলতা আছে মনে ও প্রাণে, সব শিশুর ওপরেই তো এক রকমের স্নেহমমতা জাগার কথা।

একদিন আর একটি ঘটনার সম্মুখীন হোতে হয়েছিল। সেদিন বাপ সৎ-মায়ের চুকলি শুনে ছেলেকে চেলাকাঠ দিয়ে এমন পিটিয়েছিলেন যে আর সহ্য করতে না পেরে, আমাদের বাড়ীতে পাশের জানালা গলিয়ে লাফ মেরে পালিয়ে এসেছিল সে। সেদিন দেখেছিলাম আমার দুই দাদা তাকে লুকিয়ে রেখেছিল আমাদের এখানে কাউকে কিছু না জানিয়ে। সারাদিন যখন ছেলের কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না, তখন বাপ এসে ধমকাতে লাগলেন আমার দাদাদের, ছেলেকে ফেরত দেবার জন্য। দাদারা দুজনেই সেদিন নিশ্চল হয়ে একবাক্যে বলে গেল, তারা জানে না ছেলেটি কোথায় গেছে। পুলিশ ডেকে তাদের থানায় নিয়ে যাবেন, এমন

ভয়ও দেখিয়েছিলেন বাপ। কিন্তু কোনো শাসানিই আমার দুই দাদার মনে ত্রাসের সৃষ্টি করেনি। সেদিন এমন দৃঢ়তাই দেখেছিলাম তাদের ভেতর। সেই ছেলে কয়েকদিন আমাদের বাড়ীতে রয়ে গেল। বাইরের কাকপক্ষীও টের পেল না সেটা। উল্টে সবাই বাপকে ধমকাতে লাগল এরকম কাণ্ডজ্ঞানহীন কঠোর ব্যবহারের জন্য। ছেলে যে পালিয়ে গিয়ে আত্মঘাতী হয়নি এটাই ভাগ্যের কথা।

পরে এখান থেকে বাপ ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কোনো এক আশ্রমে পড়াশোনার জন্য। ছেলে কিন্তু বাপের পিঞ্জর থেকে বেরিয়ে অনেক কঠোর সাধনায় মানুষ হয়ে এসেছিল, চারিত্রিক দৃঢ়তায় পূর্ণ হোতে পেরেছিল। মনটাও হয়েছিল সেইভাবে যথেষ্ট শক্তপোক্ত।

মানুষের কষ্টের জীবন নাকি সহজে ঘোচে না। আশ্রমে থেকে বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় পাস করে ফিরে এলো আবার মা-বাবার সেই চালাতেই। দীর্ঘদিনের আশ্রম-বিদ্যালয়ের জীবনযাত্রায় ছেলের ভেতর প্রভূত পরিবর্তন এলেও মা-বাবার স্বভাবের কোনো পরিবর্তন হোলো না, ছেলেকে এতদিন কাছে না দেখে। তবে ছেলে সাবালক হওয়ার দরুন আর হাত তুলতে সাহসে কুলতো না। নিজের ছেলের সঙ্গে সৎ ছেলের তারতম্যটা বেশ তফাতে রেখেই চলতেন মা।

দেখতাম আগের মতো বাপের সঙ্গেই খেতে বসেছে ছেলে। কিন্তু ডাল-সব্জির ওজনটা একেবারে নাপতে বাটির সাইজে মাপা। একটু নড়চড় হবার উপায় নেই। আর একটু কিছু লাগবে, বলেও মাকে বলতে শুনিনি কখনো। ভাতের মাপটাও ছিল একটু বড় বাটির সাইজ মাফিক। আশ্চর্য, খাওয়ার পরিমাপ নিয়ে কোনোদিন প্রতিবাদ করতে দেখিনি ছেলেকে বড় হয়েও। নীরবে যেমন খেতে বসা তেমনি নীরবে খেয়ে উঠে পড়াটাই ছিল সংযত আচরণে বাঁধা। ভাতের একটি দানাও পড়ে থাকেনি পাতে। মনে মনে আমি বুঝতাম, আর একটু ভাত হোলে ক্ষিধেটা যেন পরিপূর্ণ হোতো। কিন্তু চাইলে পাবে কিনা, তাতে ছিল যথেষ্ট সন্দেহ। তখন সেই অপমান যে ক্ষুধার চেয়েও বেশি জ্বালাকর হয়ে উঠবে, এই ভয়ে সয়ে যেতো সে।

সন্ধ্যা নাগাদ জুটত একটু জলখাবার—দুখানা হাতেগড়া রুটি, তার সঙ্গে অল্প একটু সব্জি। তৈরী রান্না চাকতে গিয়েও অনেক মেয়েছেলে তার চেয়েও বেশি খেয়ে নেয়। কিন্তু এ নিয়ে কোনো উষ্মা প্রকাশিত হোতো না ছেলের। এরকম অহিংস মনোভাব বোধ করি ছেলেবেলার নানারকম অত্যাচার সয়ে সয়ে গড়ে উঠেছিল। তাছাড়া আশ্রমে থাকার

দরুন সংযম ও তিতিক্ষায় গড়ে উঠেছিল শরীর ও মন দুটোই।

দুখানা ধুতি দিয়েই চলে যেতো বছর। স্নানের সময় গামছা জড়িয়ে নিজেই সাবান দিয়ে কেচে নিত পরনের ধুতিখানা। সাধ-আকাঙ্ক্ষাও যেন নিভে গিয়েছিল চিরতরে।

বাপের নিজস্ব কারবারে পরে নিয়োজিত হয়েছিল এই ছেলে। সৎ-ভাই কিন্তু কলেজের পাঠ দিয়ে চলেছে একটার পর একটা। তাতে আপত্তি ওঠেনি কখনো মা-বাবার। আগের পক্ষের ছেলেকে বেশি পড়িয়ে লাভ কী? বাপের কারবারেই যখন নাবতেই হবে শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু সেখানেও যে নিশ্চিন্তি নেই বাপের, সব যদি ঠকিয়ে নিয়ে উজাড় করে দেয় ছেলে। সৎ-মায়ের মনেও যে সেই আশঙ্কা। চিত্ত যে সব সময় করে দুরু দুরু সেই ভয়ে। তাই একদিন ছেলেকে করে দিলেন আলাদা, একেবারে পথে বসিয়ে।

পরবর্তী ঘটনাগুলি আরো মর্মস্পর্শী উভয় পক্ষেরই। তাই সেসবের উল্লেখ না করাই শ্রেয়।

আমার বয়স ছয় বছর তখনও পেরোয়নি, বড়দাদা আমাকে নিয়ে গেলেন স্কুলে ভর্তি করার জন্য। হাতে খড়ির বালাই ছিল না আমাদের বাড়ীতে, বোধহয় সেই সময় অনেক বাড়ীতেই বিদ্যা আরম্ভের আগে ব্রাহ্মণের হাত ধরে, চন্দনের একটা বড় টিকা কপালে এঁকে, বাগ্‌দেবীর কাছে মাথা ঠেকিয়ে শ্লেটে অক্ষরের প্রলেপ দেওয়ার রীতি ছিল না। মা যেদিন বুঝেছিলেন যে ছেলেকে এবার অক্ষর চেনাতে হবে, সেদিন থেকেই শ্লেট ও শ্লেট-পেন্‌সিল নিয়ে কারবার শুরু হয়ে গিয়েছিল। কোনো শুভ দিনক্ষণ দেখার প্রয়োজন পড়েনি। কাজেই সারস্বত কোনো জ্ঞান হবে কি হবে না, এটা অনিশ্চিতই থাকত।

বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে, বড় বড় থামওয়ালা বাড়ী দেখে একটু ভয় পেয়েছিলাম সন্দেহ নেই। কোন বন্দী ঘরে আমাকে নিয়ে এসেছেন বড়দাদা। তাঁর ডান হাতখানা নিজের ছোট্ট হাতটা দিয়ে জোরে টেনে রেখেছিলাম। একজন দাড়িওয়ালা, আমার বড়দাদার চেয়ে বয়সে অনেক বড়, আধপাকা চুল মাথায়, সার্ট ও ধুতি পরা এক ভদ্রলোকের ঘরে ঢুকলেন। তিনি একাই সেই বড় ঘরে বসে, সামনে একটা বিরাট টেবিল। আলমারিতে বই সাজানো চারিদিকে। বড় বড় দু-তিনখানা রেজিস্টার তাঁর সামনে রাখা। মাথার ওপর মোটা ঝালর দেওয়া, তার চেয়ে মোটা চটের কাপড় প্রায় ছয় ফুট লম্বা একটা কাঠের রডে আটকানো জিনিসটা।

দড়ি ধরে টেনে চলেছে একটি ছোট্ট ছেলে অনবরত। পরে জেনেছিলাম ওটা হাতে-টানা পাখা। যে টানে তাকে বলা হয় 'পাংখাপুলার'।

ঘরে ঢুকতেই গম্ভীর মানুষটি রেজিস্টার থেকে মাথা তুলে আমাদের দিকে তাকালেন। তিনি কোনো প্রসঙ্গ তোলার আগেই বড়দাদা নমস্কার করে বলে উঠলেন ঃ স্যার, ছোটভাইকে নিয়ে এলাম ভর্তি করাতে। আমাদেরও তো এই স্কুলেই পড়াশোনা।

গম্ভীর মানুষটি আমার দিকে আপাদমস্তক মন দিয়ে দেখে বলে উঠলেন ঃ এই ছোঁড়ার বয়স কত হয়েছে?

আমি গড়নে তখন বেশ ছোট্টখাট্ট। বড়দাদা বলে উঠলেন ঃ সবে পাঁচ পেরিয়েছে, ছ'য়ে পড়েনি এখনও।

এবার গম্ভীর মানুষটি দাঁত খিচিয়ে বলে উঠলেন বড়দাদাকে ঃ এখনি ভর্তি করার জন্য ব্যস্ত হয়েছিস কেন? এখন খেলার বয়স, খেলাধুলো করুক যতো পারে। আসছে বছর নিয়ে আসিস। বাড়ীতেই এমনভাবে তৈরী করিয়ে দে, যাতে ক্লাস ফাইভে ভর্তি হোতে পারে। চোখ দেখে তো মনে হচ্ছে ইনটালিজেন্ট।

পরে হাত দিয়ে আমার পিঠে একটা তাল ঠুকে বললেন ঃ যা বাড়ী যা।

স্কুলে দালানবাড়ীটা দেখে প্রথমটা যেমন ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, ফেরার সময় বুকটা যেন ফুলেই উঠল। বড় মাস্টারমশায় আমাকে এখন খেলতেই বলেছেন। দাদারা মিছামিছি শুধু আমাকে সারাদিন পড় পড় বলেন। বড় মাস্টারমশায় কত ভালো লোক!

বাড়ী ফিরে এসে পড়ার রুটিনটা কিন্তু আরো কঠিন হয়ে পড়ল। আসছে বছর ক্লাস ফাইভে ভর্তি হোতে হোলে ক্লাস ফোরের পড়াটা তো আয়ত্ত করে রাখতে হবে। তাই ক্লাস ফোরের পাঠ্যক্রম ধরে পড়ানো আরম্ভ হোলো। বড় বেশি কড়াকড়ি, দুবেলা সঙ্গে নিয়ে বসে পড়ানো শুরু হোলো। খেলা তো দূরের কথা, দুপুরে না ঘুমিয়ে টাস্ক করতে হোতো। বড়দাদা কলেজে চলে যেতেন দুপুরে, ফিরে এসে দেখতেন সেসব।

পেয়ারিচরণ সরকারের 'ফার্স্ট বুক অফ রীডিং' বইটা শেষ করতে হবে ভর্তি হবার আগে, কোনো ফাঁকিটাকি চলবে না। মাঝে মাঝেই বড়দাদা এই কথা বলে শাসিয়ে রাখেন আমাকে। আমার পড়ার ওপর চাপ বেশি পড়ছে দেখেও মা কিছু বলতেন না, কারণ এটা তাঁর অধিক্ষেত্রের বাইরে ছিল। এখন বড়-পড়া যে পড়তে হবে!

বাবা এইসব ব্যাপারে নীরব ছিলেন বরাবরই। স্কুলে মাইনে দেবার দুদিন আগে তাঁকে শুধু মনে করিয়ে দিতে হবে। আর বার্ষিক পরীক্ষা

শেষ হয়ে গেলে কেবল জিজ্ঞাসা করতেন ঃ পাশ করবে তো ?

এছাড়া ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বাবা বরাবরই সম্পর্কটা একটু দূরে দূরেই রাখতেন। তখনকার দিনে এটাই ছিল পারিবারিক রীতিনীতির অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। তাই বাবার সঙ্গে এখনকার দিনে ছেলেমেয়েদের যেরকম নৈকট্যের সম্পর্ক, এটা কিন্তু তখনকার দিনে চিন্তা করা যেতো না। তবে বাড়ীর কর্তাকে ভয় করতেন সবাই। তাঁকে জিজ্ঞাসা না করে বাড়ীর বাইরে যাওয়ার উপায় ছিল না। সাঁঝের বাতি জ্বলার আগেই স্কুলের মাঠ থেকে খেলাধুলা সেরে ফিরতে হোতো। অন্যথা হোলেই পরের দিন খেলতে যাওয়া বন্ধ হয়ে যেতো। আমাদের বাড়ীর উল্টোদিকে ছিল একটা মসজিদ। সন্ধ্যার আজান পড়তে পড়তেই ছুট দিতাম বাড়ীর দিকে। স্কুলের কাছেই ছিল বাড়ী। কাজেই এক নিমেষে স্কুলে যাওয়া ও ফেরাটা হয়ে যেতো সহজেই।

স্কুলে বিদ্যারম্ভটা যথাসময়েই শুরু হয়েছিল বড় মাস্টারমশায়ের আদেশ অনুযায়ী। সরকারী বে-সরকারী সব স্কুলেই তখন পড়াবার মাধ্যমটা ছিল ইংরেজীতে, তবে যার যার মাতৃভাষাটা পড়াও ছিল বাধ্যতা-মূলক। যিনি আমাদের ইংরেজী পড়াতেন তাঁর নাম তারকনাথ দত্ত। তাঁর গলার স্বরটা ছিল এতো উঁচু যে, অন্য ক্লাসেও সেই আওয়াজ গিয়ে পৌঁছত। পড়াশোনায় যারা একটু কাঁচা, তাদের স্কুলের ছুটির পরে, কারুর বলার অপেক্ষা না রেখেই ভালোভাবে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সেই বিষয়ে রপ্ত করিয়ে তুলতেন তিনি। তারজন্য কোনো টাকাপয়সা নিতেন না। তাই দেখতাম আমাদের ক্লাসের পাঁচ-ছয়জন ছেলে রোজই স্কুল ছুটি হয়ে যাবার পর বসে থাকত এই মাস্টারমশায়ের জন্য।

পরে জেনেছিলাম ইনি একজন নামকরা বিপ্লবী ছিলেন। পুব-বাংলা থেকে এসেছিলেন পাটনায় দলের কাজে। দেশের মানুষের জন্য দরদ না থাকলে এমনভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে কেউ ? ছেলেরা সবাই তাঁকে এই কারণে খুবই ভালোবাসত। তখনকার দিনে মাইনে পেতেন মোটে পঁচিশ টাকা। তা দিয়েই নিজের পেট চালিয়ে গরীবদের জন্য বই-পত্তরও কিনে দিতেন কখনো-সখনো। প্রাইভেট টিউশনি কখনও করেননি, যেটা অনেকেই করতেন আয় বাড়াবার জন্য।

বাংলা পড়াতেন অমল গাঙ্গুলী। ইনিও ছিলেন একজন বিপ্লবী। মাস্টারি করতে করতেই আইন পড়েছিলেন। তখন এটাই ছিল পাটনাতে একটা বড় সুবিধাজনক ব্যবস্থা। সকাল বা সন্ধ্যায় ল'ক্লাস করে দুপুরে

অন্য কিছু করা। এঁর কাছেই 'পথের পাঁচালী' বইটির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল ছেলেবেলা থেকেই। যদিও এই বইটি আমাদের বাংলার পাঠ্য-ক্রমে ছিল না, তবুও ক্লাস-শেষে সময় পেলে আমাদের পড়ে শোনাতেন। এমন সুন্দর করে পড়তেন বইখানা, আমরা সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। অপু, দুর্গা, তাদের মা সর্বজয়া এবং পিসিমার সঙ্গে যেন সহজ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল শিশুমনে। মনে হোতো এসব মানুষগুলো আমাদের কত আপন। পিসির খেতে বসার ছবিটা, পাশে দুর্গা বসে আছে, একটু ভাগ পাবার স্পৃহা নিয়ে—তার চোখের পলক ওঠানামা করছে পিসির প্রতিটি গ্রাস মুখে দেওয়ার সঙ্গে—শেষ পর্যন্ত একটু ভুলের জন্য ভাগ না পাওয়ায় দুর্গার মুখের অবস্থাটা কী হোতে পারে—এসবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতাম নিজের অবস্থাটা। আমিও যে ঠিক এইভাবে বসে থাকতাম ঠাকুরমার খাওয়ার সময়। কী যে ভালো লাগত তাঁর প্রসাদটুকু পেতে! সুন্দর ধবধবে সাদা গন্ধওয়ালা আতপচালের ভাত, তার সঙ্গে নানারকম সব্জি সেদ্ধ দিয়ে, একটু গাওয়া-ঘি মেখে, যেন অমৃত করে তিনি খেতেন। তারই একটু ভাগ পাওয়ার জন্য বসে থাকতাম তাঁর খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত। দুর্গার মতো কোনোদিন ফাঁকি পড়তাম না। কাজেই দুর্গার ভাগ না পাওয়ার নৈরাশ্যটা আমার চোখে জল এনে দিয়েছিল।

সাহিত্যের সঙ্গে একাত্মবোধ গড়ে তোলাটা খুব বড় শিল্পীলেখক না হোলে করতে পারে না, সেদিনই এটার উপলব্ধি হয়েছিল। সাহিত্যসৃষ্টির বীজ কিন্তু তখন থেকেই স্থাপিত হয়েছিল আমার মনে। বড় হয়ে সেটা কলেজের আঙিনায় ঢুকে প্রতিফলিত হয়েছিল ম্যাগাজিনে এবং অন্যান্য সাহিত্য পত্রিকায়। বিশেষ করে 'প্রভাতী' মাসিক পত্রিকায়—যেটা পাটনা থেকেই প্রকাশিত হোতো। কোথায় লাগে কলকাতার সাহিত্য পত্রিকা সেসময়। যে কোনো স্টেশনের হুইলার স্টলে এই পত্রিকা পাওয়া যেতো। কী তার চাহিদা। পূব-বাংলাতেই ছিল প্রায় শ পাঁচেক গ্রাহক। ডাক-মাশুল দিয়ে সেখানকার পাঠক এই পত্রিকা পড়তেন। পাটনায় বসে সারা বাংলায় এর চাহিদা গড়ে তোলা একটুখানি কথা ছিল না। বিহারের বাঙালী তো পড়তেনই, সেটা তো তাঁদের ঘরের জিনিস। তখনকার দিনে একটা মাসিক পত্রিকার পাঁচ হাজার কপি বিক্রী হওয়া কম কথা নয়। প্রথম দিকে বার্ষিক হিসেবে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে যখন এটা প্রকাশিত হোতো, সেটার সম্পাদক ছিলেন সুধাংশুকুমার ঘোষ। ইনি প্রেস ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়ার পাটনা শাখায় সাংবাদিক হিসেবে কাজ করতেন, পরে অনেক উঁচুতে উঠে গিয়েছিলেন।

'প্রভাতী' যখন মাসিক সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে বের হয় তখন সেটার সম্পাদক ছিলেন মণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার। সাহিত্যের প্রতি তাঁর এমন গভীর অনুরক্তি, খুব কম দেখতে পাওয়া যায়। স্বদেশীয়ানার ছাপ থাকত তাঁর পরিধানে, অর্থাৎ খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবী ছাড়া আর কিছু পরতেন না। নিজে খুবই কম লিখতেন, কিন্তু লেখক তৈরী করতে তাঁর মতো পারঙ্গম এই অঞ্চলে আর কেউ ছিলেন না। আমার প্রথম লেখা বেরিয়েছিল এই পত্রিকায়।

গিরিডির উশ্রী-নদীর ধারে এক বাংলোতে বসে সুদূর সবুজ মাঠ দেখা যেতো। দূরে ছিল একটি পাহাড়। নাম খৃশচান হিল্। পুজোর সময় দিন পনেরোর জন্য এই বাংলো ভাড়া নিয়ে আমাদের ছুটি কেটেছিল একবার। প্রতিবছরই বাবা পুজোর সময় সবাইকে নিয়ে যে কোনো জায়গায় বাইরে বেড়াতে যেতেন। গিরিডিতে সেই বাংলোর বারান্দায় বসে সবুজের দিগন্তব্যাপী মেলা আমার মনে একটা সরল ভাবনার সৃষ্টি করেছিল, যেটা ওখানে বসেই কল্পজগতের একটা ছবি এঁকেছিলাম নিজের লেখায়। তখন অবশ্য ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে ঢুকেছি। এই রচনার যে কী নাম দেব, ভেবে না পেয়ে 'সবুজ নেশা' শিরোনামা দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম প্রভাতীর সম্পাদক মণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দারের নামে। ভয়ে ভয়ে রোজই ডাক-পিওনের আশায় বসে থাকি। একটা মাস পেরিয়ে যাবার পরেও যখন লেখাটা ফেরত এলো না, তখন মনে হোলো এই সব ছাইভস্ম লেখা ফেরত দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে সম্পাদক মনে করেন না। বৃথাই ডাকটিকিটের পয়সা নষ্ট!

'সবুজ নেশা' ছাপা অক্ষরে দেখার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম। কিন্তু দুমাস বাদে প্রভাতীর একটা কপি দেখি আমার নামে বুক-পোস্টে এসে হাজির। কাঁপা হাতে মোড়কটা কোনোরকমে খুলে লেখার সূচীপত্র পড়েই নিজের নাম ও রচনার নাম দেখে আমাকে তখন পায় কে। গোটা বাড়ী দৌড়াদৌড়ি করে যাকে সামনে পাচ্ছি তাকেই থামিয়ে, ছাপা অক্ষরে আমার নামটা সবার সামনে তুলে ধরছি। দাদারা সবাই একটু হেসে নিলেও, বাবাও মনে মনে খুশি দেখলাম। ছোট বোনেরা তাদের ছোড়দার এই কীর্তিতে বেশি গৌরব বোধ করল এবং নিজেদের বন্ধুদের মধ্যে ছড়িয়ে দিল আমার নাম লেখক হিসেবে। শুধু একটা লেখা দেখেই।

প্রভাতীর শ্রাবণ সংখ্যায়, ১৩৫১ সালে, আমার প্রথম লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সময় মনোজ বসুর একটা উপন্যাস (যুগান্তর) ধারা-বাহিকভাবে ছাপা হচ্ছে এই পত্রিকায়। শক্তিপদ রাজগুরু নিয়মিত

লেখক তখন প্রভাতীতে। তাঁদের পাশে অতি সাধারণ, বিশিষ্টতাবিহীন, অল্পবয়সী মানুষটির লেখা দেখে নিজেকে বেশ গৌরবান্বিত মনে করেছিলাম। সাহিত্যসৃষ্টির মূলে চিত্তের এই উৎসাহ কিন্তু আমার মধ্যে একটা মানসিক শক্তির আধার হয়ে উঠল, আরো কিছু লেখার আগ্রহ নিয়ে।

'সবুজ নেশা' লেখাটির পুরোটাই এখানে তুলে ধরছি ঃ

'দূরে একটা পাহাড়। ছোটই। সামনেই এক বিস্তীর্ণ মাঠ ধানগাছে ভরা। হরিদ্বর্ণে ছেয়ে গেছে সমস্ত ধরণী। ধান ক্ষেতের ভেতর দিয়ে দূরে পাহাড়টার গা ঘেঁষে, বাঁ দিকের ছোট্ট মাটির টিপিটার পাশ কেটে, বেরিয়ে গেছে একটা ছোট পাহাড়ে নদী। আশ্বিনের মাঝামাঝি। নদীটা শুকিয়ে যাওয়া উচিত ছিল কোন কালে। কিন্তু মহামায়া আসছেন কৈলাশভবন থেকে তাঁর পিত্রালয়ে। নদীটা ধুকধুক করছে তাই তার ক্ষীণকায়া জলরেখা নিয়ে চিরকল্যাণী মায়ের আশীর্বাদ গ্রহণ করবার জন্য। তারপরেই সে হাসতে হাসতে মিলিয়ে যাবে কোথায়। তার এই বিদায় চিরদিনের জন্য নয়, আবার সে ফিরে আসবে কর্মপাশবদ্ধ প্রিয়তমা বর্ষার সঙ্গে। তার এই যাওয়া-আসা মানুষের কাছে চিরকল্যাণময়।

নদীর এধারে ওধারে দুধারেই ধানের সবুজ ক্ষেত। যে ধারেই তাকানো যায় সে ধারেই সবুজের খেলা। সবুজের সাগর উঠে এসেছে যেন। ধরণীর রঙ্গভূমিতে আজ কে যেন সবুজের পর্দা দিয়েছে টেনে। সবাই আজ সবুজ মদিরায় মত্ত। ধানগাছের শীষ থেকে আরম্ভ করে শালতাল-মহুয়ার পাতায় পাতায় সবুজের বিরাট উৎসব। সবুজের সে কী অনন্ত সুগভীর হাসি। স'রা ধরণী আজ সবুজ রং দিয়ে পালিশ দেওয়া। আজ সবাই সবুজ, সবাই উতলা। চারিদিকেই সরস সবুজের চিকণ আভা ঝলমল করছে।

আকাশও আজ নীল। ধরণীর সবুজ আজ তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে বসে গেছে। আকাশ বলে ধরণীকে—ওগো ধরণী, আজ তুমি সবুজ, তরুণীর কপোলের মতোই নবীন। মানুষ তোমার দিকেই ফিরে ফিরে দেখছে, গুণগান করছে তোমারই। আমার দিকে উপরে কেউ ফিরেও দেখছে না একবারও। তোমারই মহিমা প্রচারিত হচ্ছে দিকে দিকে। কেন ভাই, বলতে পার, মানুষ আমার প্রতি আজ কেন এতো উদাসীন? শরতের বাতাসও তোমার সঙ্গে মিলনের জন্য আগ্রহশীল, চঞ্চল।

ধরণী মৃদু হেসে জবাব দেয়, ওগো গরবিনী, মিছে করছ তোমার আঁখি দুটি বিরহিণীর মতো স্বপ্নাবিষ্ট। মানুষের এতো প্রশংসা তোমার

প্রাণে কী সইছে না? বলো আকাশ, যখন বর্ষায় মানুষ তোমার দিকে উপরে পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, থেকে থেকে দেখে তোমার গায়ে ভেসে যাওয়া মেঘের খেলা, প্রাণ তাদের তখন আনন্দে বিভোর হয়ে ওঠে। তোমারই প্রশংসায় মুখরিত হয়ে ওঠে চারিদিক কবিদের কবিতায় কবিতায়। আমার দিকে তখন কেউ ফিরেও দেখে না। কই আমার প্রাণে তো তখন হিংসা জাগে না একবিন্দুও!

প্রকৃতি প্রকৃতিতে চলেছে মান-অভিমানের পালা। মানুষ কিন্তু সবুজ নেশায় মত্ত। ফিরে ফিরে দেখছে কেবল সবুজের মেলা। বেচাকেনা নেই তাতে, আছে কেবল নির্মল আনন্দের উৎস। যতখানি পারছে রস গ্রহণ করছে তা থেকে। নেয়ার পালাই চলেছে বেশি। দেয়াটা নেই। ধরণীর এই সবুজ সভায় আমার যে ডাক পড়েনি মনে করবেন না। এই সবুজ আহ্বানের সাড়া না দিয়ে আমি চুপ করে বসে থাকবার পাত্র নই। তখনই আমার বাড়ীর রোয়াকে বসে গুনগুন সুরে গান ধরেছি--

আজি উৎসব এলো দ্বারে
ধরণীতে আজি কী তারি
আলো জাগিল রে...

হঠাৎ গানের মাঝে এক অভিনব চিন্তাধারা এসে গানের কোমল রাগিণীকে দেয় ভেঙ্গে। গান যায় থেমে। ভাবনা মনের কোণে প্রবল হয়ে ওঠে। ভাবি প্রকৃতি বহুরূপী কেন? আজকের এই ধরণীর সবুজ কালই হয়ত লাল রঙে পরিণত হয়ে যাবে।

পরে ভাবি, মানুষে মানুষে আর প্রকৃতিতে যে স্নেহ সম্বন্ধ রয়েছে, সেটা মানুষ এখনও চিনতে পারেনি বলেই প্রকৃতি বারো মাস নতুন নতুন রূপ ধারণ করে। মানুষ যেদিন মানুষের মধ্যে স্বধর্মের যে একটা নিবিড় পরিচয় আছে সেটার আস্বাদ পাবে, পরস্পরের মধ্যে যে রেষারেষি বৈরিতা রয়েছে সেটা ধুয়ে মুছে ফেলে ব্যক্তিবিশেষের অভ্যন্তরে স্থিতিশীল নৈসর্গিক সম্প্রীতি বহন করে আনবে, সেই দিনই প্রকৃতি বারো মাস একক সবুজ রূপ ধারণ করবে। রূপ পরিবর্তনের আর দরকার পড়বে না। কারণ তখন থাকবে মানুষে মানুষে আর প্রকৃতিতে এক অবিভক্ত প্রীতির সম্বন্ধ। সবুজ অন্ধকারেই ভয়ে সাদা হয়ে যায়, কিন্তু যেখানে আলোবাতাস পূর্ণতর-ভাবে রয়েছে সেখানে সবুজ হয়ে ওঠে আরো সরস ও কোমল। মানুষের সঙ্গে মানুষের আর প্রকৃতির যেদিন দিব্য শুভসম্পর্ক স্থাপিত হবে, সেদিনই ধরণীতে সংস্থাপিত হবে চিরসবুজ ও চিরকোমল মন্দির। সেই মন্দিরে

স্থান হবে শুধু জাতীয় অন্ধ-সংস্কারবিমুক্ত ব্যক্তিদের। সেই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হবে বিশ্বসংগঠনকারী সবুজ মঙ্গলঘট।'

সাহিত্য পত্রিকায় আমার এই লেখাটির প্রকাশ বিপুল উদ্যম এনে দিয়েছিল মনে। তদুপরি ছিল সম্পাদকের আশাতীত উৎসাহদান, যে কারণে আমার বহু লেখা প্রকাশিত হয়েছিল এই প্রভাতীতে।

ছোটগল্পের দিকেই প্রথমে ঝুঁকেছিলাম বেশি করে। সেই সময় বিখ্যাত লেখক বনফুলের আধ-কপালে মাথাব্যথার মতো, আধ-পাতার পরিসরে ছোটগল্পের আঙ্গিক নিয়ে লেখার যথেষ্ট সুনাম ব্যাপ্ত হয়েছিল। সেই আধখানা পাতার ছোটগল্প সাহিত্য পাঠকের মনে যে কী বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল, তা বলার নয়। বনফুলকে ছোটগল্পের এই টেক্‌নিকের পথপ্রদর্শক বলা যেতে পারে। আর কিন্তু কেউ পরে এধরণের গল্প লেখেননি।

বনফুলের ছোটগল্পের এই বৈশিষ্ট্য, আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল সাংঘাতিকভাবে। প্রথম চেষ্টাতেই সফল হয়েছিলাম এই বিশিষ্টতা নিয়ে আসতে আমার গল্প রচনায়। সেসব গল্প স্থান পেয়েছিল 'প্রভাতী'তে মণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দারের অনুগ্রহে। তাঁর ঋণ পরিশোধ করার সুযোগ পাইনি। বড় অল্পবয়সেই তিনি চলে গিয়েছিলেন। মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে। ১৯১৫ সালে ছিল তাঁর জন্ম। যাবার কয়েক বছর আগে তাঁর প্রভাতীর পরিচালনার ভার দিয়ে গিয়েছিলেন আমাদের হাতে। তার আগে দুই-এক বছর সম্পাদনা করেছিলেন সুবোধ দাশগুপ্ত। স্বাস্থ্যের কারণে নিজে আর পেরে উঠছিলেন না বলে।

একদিন হঠাৎ ডেকে পাঠালেন আমাকে। আমি তখন সরকারী চাকরিতে নিযুক্ত। মণিদাকে দেখলাম তাঁর পত্রিকা অফিসের ভেতরের ঘরে বসে। মুখে কেমন জানি একটা হতাশার ভাব। নানারকম কাগজপত্রের মাঝে একা বসে।

আমাকে দেখেই প্রথমেই দুকাপ চায়ের ব্যবস্থা করলেন। একটু পরে গলার স্বর নামিয়ে বল্লেন, দেখ আমি আর 'প্রভাতী' চালাতে পারছি না। 'বেহার হেরল্ড' নিয়েই শুধু থাকব। বলা বাহুল্য, মণিদা 'বেহার হেরল্ড' ইংরেজী সাপ্তাহিকীরও সম্পাদক ছিলেন।

বল্লেন : তোমরা শুনছি একটা বাংলায় সাহিত্য পত্রিকা বের করতে চাইছ। তোমাদের লেখক-বল রয়েছে, তাই ভালোভাবে চালিয়ে যেতে পারবে। আমার যে সেসব হারিয়ে গেছে। নিজের সেই শক্তিও আর নেই যে, প্রভাতীকে ধরে রাখি।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, সেই সময় আমরা তিন বন্ধু মিলে পাটনায় একটা সাহিত্যের আড্ডা গেড়েছিলাম। আড্ডার তিন প্রধান ছিলেন—বাসুদেব নিয়োগী, সব্যসাচী রায় ও লেখক স্বয়ং। এটা নিছকই একটা সাহিত্যের আলাপ-আলোচনার বৈঠক ছিল। আমি পাটনার স্থায়ী বাসিন্দা, বাকী দুজন এসেছিলেন কলকাতা থেকে। তখন দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধ চলছে। কলকাতা থেকে অনেকে চলে এসেছেন পাটনায় বোমার ভয়ে। কলকাতায় তখন সবারই ছাড় ছাড় রব। কাছাকাছি দুই-এক জায়গায় জাপানীবোমা বর্ষিত হওয়ায় এই আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই বছর কলকাতার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার একটা কেন্দ্র পাটনায় করা হয়েছিল।

সব্যসাচী রায় এখানে এসে পাটনা কলেজে বি. এ. পরীক্ষাটা সেরে নিলেন। বাসুদেব নিয়োগী কলকাতার কলেজ থেকেই বি. এ. দিয়ে পাটনায় এসেছিলেন। সাহিত্যের এই আড্ডা হঠাৎই আমার মাথায় গজিয়েছিল। আমি তখন প্রভাতীর নিয়মিত লেখক। হোলে হবে কী, যে-কোনো সৃজিত রচনার ভালো সমঝদারের প্রার্থমিকী একটা অভিমত না পাওয়া পর্যন্ত, কোথাও লেখা পাঠাতে একটু ইতস্তত করতে হয় বৈকি, সে লেখা যতই না কেন উঁচু দরের হোক। কাজেই সমমর্মী দুজনকে সামনে পেয়ে, আমার মনের বাসনা পূর্ণ হোলো। পরে দেখলাম, ওঁরা দুজনেই সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষমতা রাখেন। ধীরে ধীরে পকেট থেকে বের করতে লাগলেন এঁরাও গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা। কাজেই তিনজনে মিলে জোর আড্ডা বসত যখনই সুযোগ পাওয়া যেতো।

মেছুয়াটোলির কাজিপুর অঞ্চলে সব্যসাচী রায়ের বাড়ীতেই বসত এই আড্ডা। নিয়মের কোনো বাঁধাধরা শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল না কেউ। স্বতঃ-স্ফূর্ত মেজাজেই জড়ো হতাম তিনজনে। তবে মনে হোতো সে বাড়ীর অন্দর থেকে কারুর যেন একটা সস্নেহ দৃষ্টি রয়েছে আমাদের ওপর। অথচ তাঁকে সামনা-সামনি দেখতে পেতাম না। তিনি ছিলেন সব্যসাচী রায়ের সদা হাস্যময়ী করুণাযুক্ত মাতৃদেবী। জোর আড্ডার মাঝেই তিন বাটি চা হাজির হোতো। কলাই করা বাটিতে থাকত চা। অভ্যস্ত ছিলাম চিনামাটির কাপ-প্লেটে চা খাওয়ার, কলাইয়ের বাটিতে চুমুক দিতে গিয়ে ঠোঁটে ছেঁকা লেগেছে অনেক সময়। পরে অবশ্য আয়ত্ত করে ফেলেছিলাম, কলাইকরা বাটিতে চা খাওয়াটা—এটা কিন্তু এ বাড়ীরই বিশেষত্ব ছিল সেই সময়।

তিন বন্ধুর এই সাহিত্য আড্ডাটা ক্রমশ দানা বেঁধে বড় আকার নিতে

শুরু করল। দেখা গেল, নিজের রচনা পড়ার চেয়ে শ্রোতা হয়ে আসছেন অনেকে। আমাদের নিজের উৎসাহটা তাই দ্বিগুণ হয়ে গেল। অনেকে আবার আমাদের সাহিত্য রাজ্যের বড় বড় কুলীন মনে করে নিজেদের সৃষ্ট রচনা পড়তে দ্বিধাযুক্ত হয়ে থাকতেন। কিন্তু আমরা যে জাত লিখিয়ে নই, কলম ধরেছি সবে লিখব বলে, সেই আশ্বাসন দিয়ে অনেকের কাছ থেকে জোর করে লেখা আদায় করেছি। এই তিন বন্ধুর সাহিত্যের আড্ডা পরে পাটনা সাহিত্য বাসরে পরিণত হোলো। তিনজনের নামের প্রথম অক্ষরটা নিয়ে তৈরী হোলো 'বাসর'।

১৯৪৩ সালে জন্ম হয়েছিল এই পাটনা সাহিত্য বাসর। নিজ নিজ সৃষ্ট সাহিত্যের পাঠ ও আলোচনা---এটাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। প্রতি সপ্তাহে ছুটির দিনে অর্থাৎ রবিবারের সন্ধ্যায় সাহিত্য বাসরের নিয়মিত বৈঠক হোতো। এমনও হয়েছে এক একটা বৈঠকে প্রায় জনা তিরিশেক লোকের ভীড় হয়ে গেছে আমাদের গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ শোনার জন্য। পাটনায় এই প্রথম রবিবাসরীয় বৈঠক বলা যেতে পারে।

আশ্চর্য হোতে হবে জেনে, এই প্রতিষ্ঠানের কোনো আচরণ-বিধি ছিল না। সবার জন্য দুয়ার ছিল অবারিত। প্রাণখোলা মন নিয়ে আসবে এখানে লেখা পড়তে ও শুনতে, তারজন্য নিয়ম দিয়ে বেঁধে রাখার প্রয়োজন কোথায়? বাঁধাধরা নিয়মে চলতে হোলে সেখানে আন্তরিকতা ও উদ্যম দুটোই যে শূন্য হয়ে যায়। কাজেই সাহিত্য রসিক মাত্রই স্থান পেতেন এখানে। তবে একটা উপস্থিতি-পঞ্জী রাখা হোতো কারা কারা এলেন তার রেকর্ড রাখার জন্য। সঙ্গে থাকত একটা মিনিট-বুক---যেদিন যেসব রচনা পাঠ করা হোতো রচনাকারীর নাম, কী পাঠ করা হয়েছে এবং সমালোচকরা কে কী বল্লেন সেসবের সারাংশ লিপিবদ্ধ করা হোতো। বাসরের কোনো নিয়মতন্ত্র ছিল না আগেই বলা হয়েছে। তবে বৈঠক পরিচালনা করার জন্য আমরা নিজেরাই রায়-বাড়ীর যিনি কর্ত্রী অর্থাৎ সুধাকণা রায়কে (সব্যসাচী রায়ের মাতৃদেবী) সভাপতির আসনে উপবিষ্ট করেছিলাম কারণ যে-কোনো সভা চালনা করার জন্য দরকার পড়ে একজন সভাপতির। তিনি নিজেও ভালো লিখতেন এবং অনেকবার পড়েছেন তাঁর সৃষ্ট রচনা এই বাসরের বৈঠকে। সভার কাজকর্ম ও বৈঠক ডাকা ইত্যাদির ব্যাপারে থাকতাম আমি।

কাজিপুরের বাড়ী ছেড়ে পরে এঁরা চলে এসেছিলেন লঙ্গরটুলিতে। সাহিত্য বাসরও স্থানান্তরিত হোলো সেই সঙ্গে এখানেই। গ্রীষ্মের দিনে খোলা উঠোনে আর শীত-বর্ষার দিনে বাড়ীর বড়-ঘরটিতে হোতো বৈঠক।

বড় শতরঞ্জি পাতা হোতো সেই ঘরে। চতুর্দিকে ঘিরে বসত সবাই। সভার আরম্ভ হোতো গান দিয়ে, পরিসমাপ্তিও তাই দিয়ে। সভার শেষে পরিবেশিত হোতো চা। সে যে কী সুন্দর সাহিত্য সভার পরিবেশ ধারণা করা যায় না। অল্পকালের মধ্যেই পাটনার বহু সাহিত্য রসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এই সাহিত্য বাসর।

পাটনা সাহিত্য বাসর তার জন্মকাল থেকেই একটা বিশিষ্টতার রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত ছিল এবং দীর্ঘ কয়েক বছর বেশ সাফল্যের সঙ্গেই সেটা প্রতিপালিত হয়েছে। ক'জন সাহিত্যিক বা লেখক এই সংস্থা তৈরী করতে পেরেছে, এটা বড় কথা নয়, কারণ সাহিত্যিক বা কবি হবার অংকুর যার যার নিজের মধ্যেই রোপিত। সেটা বিকশিত হবার সুযোগ খোঁজে এবং অনুশীলনেরও প্রয়োজন পড়ে। নিঃসন্দেহে অনেকেই প্রেরণা পেয়েছেন সাহিত্য বাসর থেকে এবং কয়েকজন যে জীবদ্দশায় সফল হননি, এমন কথা বলব না।

যে কথা বলতে গিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে গিয়েছিলাম, সেটাতে ফিরে আসা যাক। বলতে আরম্ভ করেছিলাম 'প্রভাতী' পত্রিকার পরিচালনার ভার বাসরের কয়েকজনের হাতে কেন দিতে চাইছিলেন মণিদা। আমাকে সম্পাদনার ভার দেওয়ার কথা উঠতেই, আমার পক্ষে সেটা সম্ভব নয় জানিয়ে দিলাম মণিদাকে। কারণ সরকারী চাকুরেদের কতকগুলো নিয়মকানুনের মধ্যে আবদ্ধ রাখা হয়েছে। চাকুরিতে থাকাকালীন কোনো পত্র-পত্রিকা পরিচালনা করা নিষিদ্ধ, তাতে নাকি কাজের ক্ষতি হয় এবং সরকারী অনেক গোপন কথা প্রকাশিত হবার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়াও অন্য কোনো স্রোত থেকে আয়ের ব্যবস্থা করা নিয়মবিরুদ্ধ, যেটা পত্রিকা পরিচালনা করলে আয়ের একটা সম্ভাবনা থেকে যায়।

আমার অক্ষমতা জানাতেই মণিদা একটু ক্ষুণ্ণ হলেন ঠিকই, কিন্তু আমার অবস্থাটা বুঝে নিয়ে বল্লেনঃ তবে তুমিই বল কাকে এই ভার দেওয়া যেতে পারে?

আমার তখন মনে পড়ে গেল বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কথা। ইনি হলেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ তখনকার দিনের সাহিত্যিক মাণিক ভট্টাচার্যের ছেলে। সাহিত্য বাসরের নিয়মিত লেখক। কলকাতার অনেক পত্র-পত্রিকায় তখন তাঁর লেখা প্রকাশিতও হয়েছে। দুই-একখানা গল্পের বইও বেরিয়েছে তাঁর। সবে বীমা কোম্পানীর চাকরি ছেড়ে দিয়ে স্কুলের শিক্ষকতায় যোগ দিয়েছেন এবং স্বাধীনভাবে কোনো ব্যবসায় যুক্ত হবার বাসনা রয়েছে মনে।

বল্লাম ঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে সম্পাদনার কাজ দেওয়া যেতে পারে এবং আমরা অর্থাৎ বাসরের অন্যান্যরা তাঁর সহযোগিতায় থাকব।

মণিদা এই প্রস্তাবে খুশি হলেন খুব। বল্লেন ঃ নিয়ে এসো তাহলে তাঁকে একদিন, একসঙ্গে বসে কথা বলা যাক।

ছুটির দিনে আমরা তিনজন অর্থাৎ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, অমল রায় ও আমি, মণিদার বেহার হেরল্ড অফিসে বৈঠকে বসলাম একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করার জন্য। অমল রায় হলেন কলকাতার বিখ্যাত গীতকার শৈলেন রায়ের ভাইপো, পাটনায় তখন উনি সেন্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাংকের একাউনটেন্ট। একটা চলতি মাসিক সাহিত্য পত্রিকা চালাবার সুযোগ পাচ্ছি বলে মনে মনে খুবই উৎসাহিত বোধ করছিলাম আমরা। নিজেদের একটা পত্রিকা না থাকলে সাহিত্যের দরবারে পৌঁছনো একটু কঠিন হয়ে পড়ে। সেটার যখন একটা সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে এবং হাতে ধরে একজন দিতে চাইছেন, প্রত্যাখ্যান করা উচিত হবে না।

তার আগেই আমরা তিনজনে একটা আলাদা বৈঠকে শলাপরামর্শ করে নিয়েছিলাম। লেখার জন্য ভাবতে হবে না। বাসরের ওয়ার্ক-শপ তো রয়েছেই যার জোরে যে-কোনো সাহিত্য পত্রিকা বেশ ভালোভাবেই চালিয়ে নেওয়া যেতে পারে। বাসরের বৈঠকে যাঁরা লেখা পড়তেন তাঁদের অনেকের লেখাই বেশ উঁচুদরের ছিল যেগুলো যে-কোনো সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশ করার মতো উপযুক্ত। অমল রায়ের গল্প ছিল খুব বলিষ্ঠ, বাসুদেব নিয়োগী, রঞ্জিত সিংহ-এর কবিতাগুলো ছিল পাকাহাতের আর সব্যসাচী রায়ের প্রবন্ধ ছিল পরিশীলিত মনের পরিচায়ক। এঁদের লেখা ছাড়াও অন্যদের রচনাও ছিল উঁচুমানের। জমাটে গল্পও বাসরে আরো অনেকে লিখতেন। কাজেই এরকম একটা প্রশস্ত লেখার ভাণ্ডার যেখানে, একটা সাহিত্য-পত্রিকা না চলার তো কথা নয়।

মণিদাকে আমাদের সম্মতি দিয়ে দিলাম। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সম্পাদক হবেন স্থির হোলো, পেছনে থাকব আমরা ক'জন।

একটা সমস্যার কথা আমি ওঠালাম মণিদার কাছে যেটার উত্তর তিনি দিলেন খুব ভেবে চিন্তে। আমার প্রশ্নটা ছিল, আজ না হয় আপনি প্রভাতী আমাদের হাতে তুলে দিলেন, যেহেতু আপনি আর চালাতে পারছেন না। যদি এমন হয় যে, প্রভাতী আমাদের হাতে বেশ ভালোভাবে চালু হয়ে গেল, পাঠক সমাজেও তার চাহিদা বেড়ে গেল, আপনি যদি সেই সময় এটাকে আবার ফেরত চেয়ে বসেন তখন আমাদের মনের অবস্থা কী দাঁড়াবে? সব খাটাখুটিই তো ব্যর্থ হয়ে যাবে তখন।

এই কথায় মণিদা একটু নীরব হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। বল্লেন ঃ এই ব্যাপারে তোমরা নিঃশঙ্ক হোতে চাও, এই তো? ঠিক আছে যদি এক বছর তোমরা এটাকে চালিয়ে নিতে পারো, তবে এটা তোমাদেরই সম্পত্তি হয়ে থাকবে। আমি লেখাপড়া করে একটা চুক্তি করে দিচ্ছি।

সত্যি একটা লিখিত চুক্তি করে নেওয়া হোলো। চুক্তিপত্রে সই করলেন মণিদা, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও আমি। সাক্ষী রইলেন অমল রায় ও অনিমা গুপ্ত। এতো সহজে যে মণিদা আমাদের হাতে তাঁর কন্যা-প্রতিম সাহিত্য পত্রিকাটি ছেড়ে দেবেন, আশা করিনি। শুধু তাই নয়, মণিদা একথাও বল্লেন ঃ প্রভাতীর কোনো দায়-দেনা তোমাদের ওপর থাকবে না, বরং কয়েকটি মূল্যবান জিনিস দিচ্ছি যাতে পত্রিকা চালাতে কোনো অসুবিধা না হয়।

সত্যি কয়েকটি মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় জিনিস তিনি এই সঙ্গে দিয়েছিলেন। সেগুলো হোলো কয়েকটি বড় বড় কোম্পানীর পুরোপাতার বিজ্ঞাপন। তারমধ্যে একটা ছিল টাটা স্টীল কোম্পানীর বিজ্ঞাপন, দ্বিতীয়টি ইণ্ডিয়া টী বোর্ডের, তৃতীয়টি লিলি বার্লি মিলস্ লিঃ-এর, চতুর্থটি ছিল লিপটন্স্-এর চায়ের বিজ্ঞাপন।

আষাঢ় ১৩৫৬ সাল অর্থাৎ ইংরেজী জুন ১৯৪৯ থেকে আরম্ভ হোলো 'প্রভাতী'র নতুন প্রকাশ। একেবারে নবীন ধাঁচে। সম্পাদক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ছাপা শুরু হোলো ফ্রি প্রেস; পাটনা থেকে; বেহার হেরল্ড প্রেস থেকে নয়। ওখান থেকে প্রভাতীর অফিস উঠিয়ে নিয়ে আসা হোলো বুদ্ধদেব বাবুর বাড়ীতে দরিয়াপুরে।

'ফ্রি প্রেস' তখন নতুন সাজে ছাপাখানা। নেপালের সূর্য উপাধ্যায়ের অনুজ রাজু উপাধ্যায় বহু টাকা ব্যয় করে কয়েকটি নতুন ফ্ল্যাট্ ও ট্রেডল মেশিন কিনে কাটিং ও স্টিচিং মেশিন সাজিয়ে, বাংলা, হিন্দী ও ইংরেজী টাইপ সম্বলিত করে একটা বড় প্রেস চালু করেছেন। সেই প্রেসে ম্যানেজার হিসাবে ছিলেন তখন দীপেন্দ্রনাথ সরকার অর্থাৎ মন্টু সরকার।

এই ফ্রি প্রেস থেকে 'প্রভাতী' ছাপা আরম্ভ হোলো। এই সঙ্গে একটা নতুন হিন্দী মাসিক পত্রিকা 'জ্যোৎস্না' ছাপা হচ্ছিল। আর ছিল নেপালের 'নেপাল সন্দেশ' সাপ্তাহিকীটি।

একটা মাসিক বাংলা পত্রিকা চালানো যে কত কঠিন, সেটা বোঝা গেল গোটা আট-নয়টি সংখ্যা বের করার পর। পত্রিকা ছাপানোর খরচ, কাগজের খরচ, বিজ্ঞাপন যোগাড় করা, সময়মত কাগজ বের করা, লেখা যোগাড় করা, সম্পাদনা করা, নির্দিষ্ট দিনে কাগজের পোস্টাল ডেসপ্যাচ,

সে যে কী ভীষণ অবস্থায় পড়তে হোতো বলার নয়। মানসিক চাপ বাড়তে লাগল ক্রমশ। প্রুফ দেখা থেকে আরম্ভ করে, কাগজ মোড়কে বাঁধা, সবই দুজনে মিলে করেছি—বুদ্ধদেব বাবু ও আমি।

অর্থাভাবটাই বেশি কাহিল করে রাখত। প্রতিমাসে প্রেসের বিল সময়মত চুকিয়ে দেওয়াটাই ছিল মস্ত বড় সমস্যা। এমন একটা কঠিন সময় এসে গিয়েছিল পরে যে, বুদ্ধদেব বাবুকে তাঁর স্ত্রীর গহনা জমা রেখে ধারকর্জ করতে হয়েছিল শুধু কাগজটাকে চালু রাখার জন্য।

তবুও চালিয়ে যেতে হয়েছিল এই পত্রিকা চুক্তি নির্ভর হয়ে আরো কয়েক মাস কারণ কথা ছিল বারোটি মাস চালিয়ে নিলে, সেটা হবে আমাদের সম্পদ। কথা রেখেছিলাম আমরা বারোটি সংখ্যা কেন, আঠারোটি সংখ্যা বের করে তার পরিসমাপ্তি ঘটাতে। শেষ সংখ্যা বেরিয়েছিল অগ্রহায়ণ ১৩৫৭তে অর্থাৎ ১৯৫০-এর ডিসেম্বর মাসে। এর পরেই প্রভাতীর প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ।

ইতিমধ্যে মণিদার মৃত্যু আমাদের কাছে বজ্রাহতের মতোই মনে হোলো। প্রভাতীর বারোটি সংখ্যা বের হবার পর তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল। এটা অবশ্য তিনি দেখে গিয়েছিলেন যে তাঁর সঙ্গে কথার কোনো বৈপরীত্য ঘটতে দিইনি আমরা। যতই কষ্ট হোক চালিয়ে গেছি নিজেদের অর্থ, শ্রম ও সত্তাকে বিপন্ন করে। প্রভাতীর একাদশ বর্ষের প্রথম সংখ্যা আষাঢ় ১৩৫৭—ইংরেজী অগাষ্ট ১৯৫০—মণীন্দ্র সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল এই মহৎ মানুষটিকে স্মরণ করে।

সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় সেই সংখ্যায় মণিদাকে স্মরণ করে লিখেছিলেন ঃ 'কতকগুলি মানুষ দৈহিক এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে এমন একটি উজ্জ্বল ছবি আমাদের মনের ওপর অঙ্কিত করে যে তাদের মৃত্যুর কথা—তারা যে আর নেই আমাদের মধ্যে, একথাটা বিশ্বাস করাটা কঠিন হয়ে পড়ে। মণীন্দ্র সমাদ্দার ছিলেন সেই শ্রেণীর একজন মানুষ। এর ওপর তাঁর মৃত্যুটাও হোলো অকালে ; মনটা যখন কোনো দিক দিয়েই তোয়ের ছিল না, সেই সময় হঠাৎ খবরের কাগজে দেখা গেল তিনি ইহলোক ত্যাগ করে গেছেন। একবার বোধহয় আশা হয়েছিল খবরের কাগজ-ওয়ালারা তো কখনো কখনো মিথ্যাও ছেপে বসে। সে আশা অবশ্য স্থায়ী হোতে পেলে না, মনটা নিঝুম হয়ে রইল খানিকটা মণীন্দ্রের স্মিতদীপ্ত প্রতিভাব্যঞ্জক মুখখানি মুখের সামনে ভাসতে লাগল।'

বিভূতিবাবু এই স্মরণিকায় আরো লিখেছিলেন ঃ 'বিহারে বিশেষ করে বিহার প্রবাসী বাঙালীর দৃষ্টিতে মণীন্দ্রের স্থায়ী কীর্তি "প্রভাতী"

কাগজখানি। এদিকে বছরখানেক থেকে কাগজটির সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ছিন্ন হয়। তবে যে সময়টা ছিল সম্বন্ধ, সে সময়ের ইতিহাস আমি কতক কতক জানি। বাঙালীর সাহিত্যপ্রীতির বড়াই করি আমরা, কিন্তু সেটা একটা অর্ধসত্য মাত্র। বাঙালীর লেখার ঝোঁক আছে, অর্থাৎ লেখক বনবার, কিন্তু পড়ার ঝোঁক নেই। সেইজন্য বাংলার বাইরে এই কাগজটিকে জন্ম দিতে তারপর বাঁচিয়ে রাখতে কী অসীম ধৈর্যের সঙ্গে তাঁকে কাজ করতে হয় তা আমি জানি---একটু ঘনিষ্ঠভাবেই জানি, কেননা, আমি ঐ সময় কয়েক বছরের জন্য পাটনাতেই ছিলাম "ইণ্ডিয়ান নেশন" অফিসে। বাংলার প্রায় অনেকগুলিই বিশিষ্ট লেখক, একেবারে ওপরের কয়েকজন, তখন প্রভাতীতে লিখছেন যা তাও নিতান্ত বাঁ হাতে অবহেলার দান নয়। প্রভাতীতে দুই-একখানা বই যা বেরিয়েছে তা সারা বাংলাদেশে সাড়া জাগিয়েছে। এই যে প্রবাসে বসেও একধরণের নবরত্ন সংগ্রহ-এর ভেতর অর্থবল ছিল না, ছিল মাত্র মণীন্দ্রের সম্মোহনী শক্তি। ওঁকে নিরাশ করলে লেখকরা মনে করতেন একজন নিতান্ত আপনজনের মুখখানি মলিন হোলো। শান্ত স্বল্পবাক মানুষটির এইটিই ছিল সবচেয়ে বড় কথা।

আমার পাটনা থেকে চলে আসার কিছুদিন পর থেকে "প্রভাতী"তে একটা পরিবর্তন এসে পড়ে। একেবারে গোড়ায় কি কথা হয়েছিল জানি না, তবে এটা খুব স্পষ্ট বোঝা গেল যে মণীন্দ্রের রাজনৈতিক মতবাদ যেন কতকটা বদলেছে এবং সেই অশান্তি তাঁর কাগজখানিতে প্রতিফলিত হচ্ছে। কাগজটি অনেকখানি পড়ে যায়। এক সময় নিয়মিত লিখেছিলাম বলে "প্রভাতী"র এই অবস্থা পরিবর্তনে বেদনা পেতাম, কিন্তু তার মধ্যেও একটা সান্ত্বনা ছিল, বিশ্বাস ছিল মানুষটি খাঁটি, রাজনৈতিক হাওয়া বুঝে পাল তুলে দিয়ে খানিকটা এগিয়ে যাবার লোক নয়, যা করছেন নিজের বিশ্বাসেই আর সত্যনিষ্ঠ থেকেই। উনি ভুল যা করেছিলেন তা মাত্র এই অল্পদিনের কাগজের শক্তিটার আন্দাজ করতে পারেননি। "প্রভাতী"র নিছক সাহিত্য পত্রিকা হয়ে থাকবার ক্ষমতা ছিল---হয়ে আসছিল বলাই ঠিক---মতবাদ প্রচারের দায়িত্ব নেবার শক্তি বা সম্বল তার কোথায়?

"প্রভাতী" ছাড়তে ওঁর প্রাণে যে কতটা লেগেছিল তা ওঁর এই সময়ের একটি চিঠিতে টের পাই; লিখেছিলেন যে আর একবার প্রাণপনে শেষ চেষ্টা করবেন। সফল হননি। নিজের মানসকন্যাকে যে সুযোগ্য হাতে দিয়ে যেতে পারলেন, এইটেই বোধহয় ওঁর শেষ সান্ত্বনা ছিল।'

"প্রভাতী"র পরিচালনা ও সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেবার পর আমরা কিন্তু এটাকে নিছক সাহিত্য পত্রিকা হিসাবে চালিয়েছি। রাজনৈতিক কোন মতবাদ প্রকাশ করিনি। তাছাড়া সেই সময় এখনকার মতো এতো রাজনৈতিক দলই বা ছিল কোথায় যে তাদের হয়ে মত প্রকাশ করব?

মণিদার সর্বগুণের নিরূপণ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় যেভাবে করে-ছেন এর পরে আমাদের আর কিছু বলার নেই। কত সহজেই না 'প্রভাতী'কে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। নিজের নির্মিত জিনিস স্বেচ্ছায় হস্তান্তরিত করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। তা সত্ত্বেও আমাদের 'প্রভাতী' চালাবার দায়িত্ব নেবার গভীর আগ্রহ ছিল বলেই বোধহয় স্বপ্রতিষ্ঠাকে অস্বীকার করতে পেরেছিলেন এবং দানপত্র লিখে দিয়েছিলেন। এ যে কত বড় ত্যাগ, সেকথা বলার নয়।

সেই চুক্তিপত্র এখনও আমার কাছে রয়েছে, এটা আমাদের কাছে আশীর্বাদ না ধিক্কার বলা কঠিন। কারণ আমরাও যে নিরুপায় হয়ে সেই পত্রিকার ছেদ টানতে বাধ্য হয়েছিলাম পুরো দেড়টি বছর চালিয়ে যাবার পর।

সাহিত্য-জগতে প্রতিষ্ঠা পাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। বলা হয় বটে প্রতিভা চাপা থাকে না কখনো, একদিন সেটা প্রকাশমান হবেই। সাহিত্যিক-সমাজে স্থান পেতে হলে অনেক কঠোর পরিশ্রম ও কঠিন পথ দিয়ে এগোতে হয়। সবচেয়ে বড় কথা প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাওয়ালা বা তাদের গোষ্ঠীর চেনামহলের একজন না হোলে যে সেসব লেখা কোনো পত্রিকাতেই স্থান পায় না। অনেক ভালো ভালো প্রতিভা এইভাবেই নষ্ট হয়ে গেছে—কোনোদিন তারা উঠতে পারেনি।

পাটনা সাহিত্য বাসরের লেখকদের নিজেদের গণ্ডীর বাইরে যে পাঠক সমাজ রয়েছে তার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য একটা নিজেদের সাহিত্য পত্রিকা বের করা হয়েছিল। সেটা ঘটেছিল ইংরেজী ১৯৫৫ সালে 'বাসর' নাম দিয়ে একটা ত্রৈমাসিক পত্রিকা বের করে। ভাঁজ করা প্রচার পত্রের মতো সেটির প্রথম প্রকাশ হয়েছিল। বাসরের বৈঠকে যেসব লেখা পড়া হোতো, তা থেকেই বেছে নিয়ে এই সাহিত্য পত্রিকায় সন্নিবেশিত করা হোতো। কয়েকটি সংখ্যা বের করার পর পাটনার পাঠক সমাজে তার চাহিদা বুঝে পরবর্তী সংখ্যাগুলো একটা মাঝারি পত্রিকার সাইজে প্রকাশিত হোলো।

নবকুমার সিংহ, অমল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির প্রবন্ধ ও গল্প একটা আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। কলকাতার নারায়ণ চৌধুরী ও

ভাগলপুরের বনফুলেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন দীপেন্দ্রনাথ সরকার ও রমণ গুপ্ত। উপদেষ্টায় ছিলেন বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। কীভাবে একটা সাহিত্য পত্রিকা ভালো ভালো গল্প-প্রবন্ধ এবং কবিতা দিয়ে সাজানো যায় তার একটা সুন্দর ছক এঁকে দিতেন তিনি। কাজেই অল্পকালের মধ্যে 'বাসর' পত্রিকা সবারই খুব প্রিয় হয়ে উঠল।

এই পত্রিকাটিও কয়েক বছর ফ্রি প্রেস পাটনা থেকেই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হোতো। তারপরে তপন প্রিন্টিং থেকে ছাপানো হয়। প্রথম ছয়টি সংখ্যা বাসরের মুখপত্র হিসাবেই রাখা হয়েছিল। সপ্তম সংখ্যা থেকে এটাকে বহু প্রসারী করার উদ্দেশ্যে এবং দেহে যাতে বলসঞ্চার হয় সেই কারণে এটাকে একটা ব্যবসার রূপ দেওয়া হোলো। অর্থ উপার্জনের কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, বড় বড় প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন না পেলে পত্রিকা চালানো দুরূহ ব্যাপার ছিল সেই কারণে। ফলে ভালো ভালো বিজ্ঞাপন সংগৃহীত হোলো। এই কারণে এই পত্রিকা কখনও অর্থাভাবে ক্লিষ্ট হয়নি বরং কলকাতার কয়েকজন নামী লেখকের গল্প ছাপানোর দরুন তাঁদের দক্ষিণাও দেওয়া হয়েছে। সুভাষ সমাজদার, প্রবোধচন্দ্র পাল, আর্যপুত্র সুপ্রিয়, বনফুল, হেমেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, ডঃ সোমনাথ রায়, সাংবাদিক গৌরচন্দ্র চক্রবর্তী, শুদ্ধসত্ব বসু, সুধীন্দ্রলাল রায়, বি,বি,সি-খ্যাত বিনয় রায়, শিবকুমার মিত্র---এঁদের কাছ থেকেও লেখা পাওয়া গেছে সৌজন্য হিসাবে। কাজেই লেখার দিক থেকে কোনো সময় অসুবিধায় পড়তে হয়নি। রইল বাকি কাগজ চালানোর জন্য আর্থিক বলভরসা। সেটার ব্যাপারেও কোনো চিন্তা করতে হয়নি। বিজ্ঞাপন থেকে আয় এবং পত্রিকার গ্রাহকদের চাঁদা নিয়মিতই ছিল। যা আয় হোতো সেটাই ব্যয়িত হোতো, কখনো কখনো উদ্‌বৃত্তও হয়েছে।

এইসবের জমাখরচ রাখার কাজে লিপ্ত ছিলেন সাহিত্য বাসরের একজন নিষ্ঠাবান মানুষ। নিজে কিছু লিখতেন না তবে ভালোবাসতেন পাঠ শুনতে এবং সাহিত্যালোচনায় যোগ দিতে। এমন মনোনিবেশকারী, মার্জিত রুচি এবং উৎসাহশীল শ্রোতা খুব কমই দেখা যায়। সবার সঙ্গেই ছিল অমায়িক হৃদ্যতা। অনেকবার তাঁর বাড়ীতে, যেটা পাটনার কেন্দ্র-বিন্দু থেকে ছিল বেশ দূরে, অর্থাৎ মিঠাপুরের প্রান্তিক এলাকায়, সেখানেও বৈঠক ডেকেছেন। সবাই হাজিরও হয়েছেন সেখানে। এমনই টান ছিল বাসরের একজনের সঙ্গে অপরের। তাই ঘুরে ফিরে বাসরের বৈঠক

হোতো এক একজনের বাড়ীতে। পাক্ষিক বৈঠকের বদলে সেটা তখন হোতো মাসে একটি করে।

সাহিত্য বাসরের বার্ষিক অনুষ্ঠানগুলোও ঘুরে ফিরে বিভিন্ন জায়গায় বড় আকারে পালিত হয়েছে। রামমোহন রায় সেমিনারি হলে, রবীন্দ্র ভবনে, মিঠাপুরের নিউ মেসে, আদালত গঞ্জে, ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স কোম্পানীর অফিস হলে এবং বিবেক মুস্তফীর কমার্সিয়াল ইনষ্টিটিউটেও অনুষ্ঠান করা হয়েছে। এছাড়াও আর, এন, রুদ্র-র চার্টার্ড একাউন্টেটের অফিস ঘরেও।

হেমন্ত দত্তের কথা একটু বেশি করে বলার প্রয়োজন রয়েছে এখানে। আমাকে বোধহয় ইনি একটু বেশি ভালোবাসতেন, শ্রদ্ধারও অন্ত ছিল না আমার প্রতি। আপন করে নিয়েছিলেন আমাদের পরিবারের সবাইকে।

তখন আমি থাকি গর্দানিবাগের সরকারী কোয়াটারে। উনি প্রায়ই আসতেন আমাদের সেই কোয়াটারে। ছুটির দিনে বাড়ীর সবাইকে নিয়ে আসতেন। সারাদিন কাটিয়ে, রাত্রির আহার সেরে ফিরে যেতেন। আমরাও কখনো কখনো তার ফিরতি দিতাম ঐভাবে সারাদিন কাটিয়ে হেমন্ত দত্তের বাড়ীতে।

সেদিন কী কারণে আমি অফিসে যাইনি। বাড়ীতেই। সন্ধ্যার দিকে এলেন হেমন্ত দত্ত গল্পগুজব করতে। বাইরের বাগানে বসে গল্প করছি আর চা-জলখাবার খাচ্ছি। এমন সময় অন্য কোয়াটার থেকে একজন এসে খবর দিয়ে গেলেন, লক্ষ্ণৌ থেকে টেলিফোন এসেছে আমার শ্বশুরমশায় হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সকালে মারা গেছেন। আমরা যেন রাত্রের ট্রেনেই রওনা হয়ে যাই।

এই দুঃসংবাদে আমি প্রথমটা একটু বিচলিত হয়ে পড়লাম। কী করব ভেবে পেলাম না, এই সময়ে কাকে কোয়াটারে রেখে চলে যাব। বাড়ী খালি রেখে তো যাওয়া চলে না। ঘন্টা দুয়েক পরেই লক্ষ্ণৌ যাওয়ার ট্রেন। এইসব নানা কথা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে।

এমন সময় হেমন্ত দত্ত বলে উঠলেন, দাদা, আপনি কোনো চিন্তা করবেন না, আমি আপনাদের যাওয়ার সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আপনারা শুধু তৈরী হয়ে নিন। বৌদিকেও এখন এই দুঃসংবাদটা দেবেন না, তাহলে কান্নাকাটিই করা হবে, যাবার জন্য তোয়ের হোতে পারবেন না। মোটে দু ঘন্টা হাতে আছে। আমি আমার পরিবার নিয়ে এ-বাড়ীতে চলে আসছি আপনাদের ট্রেনে উঠিয়ে দেবার পর।

মুহূর্তের মধ্যেই সব ব্যবস্থা পাকাপাকি। লক্ষ্ণৌ যাবার টিকিট কেটে

ফিরে এলেন উনি আমাদের ট্রেনে উঠিয়ে দেবার জন্য। অন্যের বিপদ নিজের মাথায় নিয়ে একটা সুন্দর ব্যবস্থা কজন করতে পারেন? একান্ত আপন মানুষও দিশাহারা হয়ে যায় এরকম অবস্থায় পড়লে। ট্রেনে তিনি আমাদের চাপিয়ে দিলেন। কথা হয়ে রইল যে আমরা ফিরে এলে উনি সপরিবারে শ্বশুরবাড়ীতে যাবেন নবদ্বীপে। সেখানেই ছোটমেয়ের মুখে-ভাত দেবেন।

আমরা তো বিষণ্ণ হৃদয় নিয়ে আর একটি হৃদয়বিদারক অবস্থায় পড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে রওনা হয়ে গেলাম। ঘরবাড়ী পড়ে রইল অগোছালো অবস্থায়---রান্নাঘরে ছড়ানো-ছিটানো রাত্রের আহারের সব ব্যবস্থাই তখন লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়ে। শুধু হেমন্ত দত্তের ভরসায় ও তাঁর স্ত্রীর সহযোগিতার প্রতিশ্রুত হয়ে।

লক্ষ্ণৌতে সব কাজ সারতে লেগে গেল দু সপ্তাহ। কদিন আগেই চিঠি দিয়েছিলাম পাটনাতে কবে ফিরব জানিয়ে। যেদিন ট্রেন ধরার জন্য বাড়ী থেকে বেরোতে যাচ্ছি---মালপত্র সব উঠে গেছে টাঙ্গাতে---এমন সময় একটা টেলিগ্রাম এসে হাজির---কাম এট ওয়ান্স, হেমন্ত সিরিয়াস।

বেরোবার মুখে এরকম একটা টেলিগ্রামে মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল। লক্ষ্ণৌতে আসার সময় এরকমই একটা দুশ্চিন্তা নিয়ে ট্রেনে উঠেছিলাম আবার পাটনায় ফেরার সময় সেই একই দুর্ভাবনায় অভিতপ্ত। সারা রাস্তায় দুজনের মধ্যেই নানা অমঙ্গলাশঙ্কা পীড়া দিতে লাগল। রাত এগারোটায় পাটনা ষ্টেশনে দুর্মনায়মন অবস্থায় প্ল্যাটফর্মে নামার সঙ্গে সঙ্গেই দেখি আমার এক নিকট বন্ধু ষ্টেশনে এসেছে আমাদের নিতে। বেশ অবাক হয়ে গেলাম, এতো জানত না আমরা লক্ষ্ণৌতে এবং আজই আমাদের ফেরার কথা। তবে কী দুঃসংবাদ ও বহন করে এনেছে আমাদের জন্য যে কারণে নিজেই অত রাত্রে ষ্টেশনে উপস্থিত?

আমার নানারকম উদ্বেগভরা প্রশ্নের উত্তর বন্ধুটি এড়িয়ে গেল বেশ বুঝতে পারলাম। শুধু বলতে লাগল, চল বাড়ী চল, ওখানেই সব জানতে পারবে। তোমরা ষ্টেশনেই কিছু খেয়ে নাও। বলতে বলতে দেখতে পাচ্ছিলাম ওর চোখ জলে ভিজে আসছে। গলার স্বরও দুঃখে অভিভূত, আর্তব্যঞ্জক।

কোনোরকমে একটা ফিটনে চেপে রওনা হলাম বাড়ীর উদ্দেশ্যে। পেছনে পেছনে মোটর সাইকেলে আমাদের অনুগমন করে চলেছে বন্ধুটি। আমাদের একা এই অবস্থায় সে ছেড়ে দিতে রাজী নয়। আমাদের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে তবে সে ফিরে যাবে।

রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করে আমাদের ফিটন এগিয়ে চলেছে গর্দানিবাগের দিকে। রাস্তায় কোনো মানুষজন নেই। মিউনিসিপ্যালিটির বাতিগুলো কোথাও জ্বলছে, কোথাও নয়। একটা আলো-আঁধারের পথ দিয়ে চলেছি আমরা। ফিটন গাড়ীর ঘোড়ার খুরের তলায় যে নাল লাগানো, তারই খটখট আওয়াজ হচ্ছে পিচের খটখটে রাস্তার ওপর আছাড় খেয়ে।

দূরে সেক্রেটেরিয়েটের টাওয়ার ক্লকের বারোটার ঘন্টাধ্বনি যখন সাড়া জাগিয়ে তুলল ঘুমন্ত এলাকাটাতে, তখন আমরা প্রবেশ করেছি সরকারী কোয়াটারের গেটের কাছে। চারিদিক নিস্তব্ধ, বাগানের চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে নিমগাছের শুকনো পাতা। লোকের অভাবে সেগুলো পরিষ্কার করা হয়নি, বোঝা গেল।

সেই শুকনো ঝরাপাতার ওপর পা ফেলে এসে ধীরে ধীরে দরজায় টোকা মারলাম। ঘরের ভেতর আলো জ্বলছিল, তারই একটু আভা দরজার ফাঁকফোকর দিয়ে বেরিয়ে আসছিল বাইরে।

ছোট্ট একটা খট শব্দ করে কে যেন কবাট খুলে দিল। সামনে দেখি, দরজা খুলে দাঁড়িয়ে অফিসের একজন চাপরাশী।

আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তখনও দাঁড়িয়ে। আমরা এসেছি খবর পেয়ে কাছাকাছি কোয়াটারের দুই একজন এসে ঘরে ভিড় করেছে। সবার মুখেই কুলুপ লাগানো, কেউ মুখ খুলতে চাইছে না। আমার শরীর তখন থরথর করে কাঁপছে, হৃদপিণ্ডের ধুকধুকানিও দ্বিগুণ হয়ে গেছে। ঘরের থমথমে ভাবটা যেন বেশি রকম পীড়া দিতে লাগল। কিছু বুঝতে না পেরে চীৎকার করেই জিজ্ঞাসা করলাম, কী হয়েছে, আমাকে বলছ না কেন তোমরা?

অফিসের চাপরাশী তখন কান্নাভরা গলায় বলে গেল, আপনার বন্ধু হেমন্তবাবুর গত পরশু অফিসে স্ট্রোক হয়েছিল। সেখান থেকে অফিসের লোকেরাই হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু তাঁর জ্ঞান ফিরে আসেনি আর। এই তো একটু আগে তাঁকে দাহ করে আমরা ফিরে এসেছি।

স্তব্ধ হয়ে রইলাম কিছুক্ষণ এই কথা শুনে। নিঃশ্বাস ফেলারও প্রয়োজন মনে করিনি। এরকম সহজ সরল হৃদয়বান অল্পবয়সী মানুষটি চলে গেল আমাদের ছেড়ে। বন্ধুজনের বিপদ দেখে এগিয়ে এসেছিল তাকে সাহায্যদানের জন্য, শেষ পর্যন্ত নিজের জীবনই বলি দিল বন্ধুকে বাঁচাতে গিয়ে। শুধুমাত্র আমার চৌদ্দ দিনের অনুপস্থিতির অপরাধস্বরূপ চির-দিনের জন্য মুক্ত করে নিল নিজেকে।

চোখ দিয়ে জল গড়ায়নি তখনও আমার। নিশ্চল নিথর হয়ে

দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ, মুখের বাক্য অস্ফুটই রয়ে গেল। আমার সামনে অতগুলো লোক দাঁড়িয়ে, তারাও যে অঝোরে চোখের জল ফেলেই চলেছে।

শুনেছিলাম ওঁর অফিসের লোকেরাই প্রাণপণ চেষ্টা করেছে বড় বড় ডাক্তার ডাকিয়ে চিকিৎসা করাতে। রাতদিন বসে সেবা করেছে। তাঁরাও কেঁদেছিল আকুলভাবে প্রাণতুল্য প্রিয় এই মানুষটির জন্য। বড় ভালোবাসত যে ওঁরা সবাই এঁকে।

ভোরের আলো ভালো করে না ফোটার আগেই দৌড়লাম হেমন্ত দত্তের বাড়ীতে। স্ত্রী সন্ধ্যা দত্ত খালি ঘরের মাটিতে শোয়া। এই ঘরেই এনে রাখা হয়েছিল হেমন্ত দত্তের নির্জীব দেহটাকে।

সারারাত আকুলভাবে কেঁদে ভোরের দিকে একটু ঘুমচ্ছে সন্ধ্যা, বল্লেন তার শাশুড়ী অর্থাৎ হেমন্ত দত্তের মা। উনি তাঁর মেজছেলের সঙ্গে এসেছেন আগের দিন কলকাতা থেকে বেলা বারোটায়। হেমন্ত দত্তের দুই মেয়ে মাকে জড়িয়ে পাশে শুয়ে। মায়ের আলুলায়িতকুন্তল মেঝেতে ছড়ানো।

ওদের ঘুম ভাঙ্গাতে বারণ করে রাস্তার দিকে দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে রইলাম। কী সান্ত্বনা দেব সন্ধ্যাকে ভেবে পাচ্ছি না। মেজভাই আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। কোনো কথাই কেউ বলছি না, বলার আছেই বা কী?

নীরবতা ভেঙ্গে হঠাৎ দেখি সন্ধ্যা এসে আমার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়েছে। একজন আপন লোক পেয়ে সে কী কান্না। বুকের সব কান্নাই যেন নিঃশেষ করতে চায় এমনভাবে কেঁদে চলেছে। কাঁদুক, প্রাণভরে কাঁদুক, কেঁদে কেঁদে বুকটা যদি হাল্কা হয় সেটাই ভালো।

মাঝে কাঁদতে কাঁদতে একবার শুধু বল্লে, আমার কী দশা হবে, আমাকে কে দেখবে দাদা?

এবার আমাকে কথা বলতেই হোলো। এতখানি অসহায় অবস্থায় না পড়লে কেউ এমন কথা বলে না। শ্বশুর-শাশুড়ী, ছোটছোট দেওররা সব থাকতে এমন কথা কেন?

দু-হাত দিয়ে মাটি থেকে ওকে তুলে নিয়ে আশ্বাস দিয়ে বল্লাম, আর কেউ না দেখুক, আমি তো রয়েছি। এমন প্রাণপ্রিয় বন্ধু, আমার জন্যই তো এই বিপদ ডেকে আনল, তার প্রতিদানে আমি কী এইটুকুও পারব না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো সন্ধ্যা।

শাশুড়ী তখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন আমার কাছে। তাঁর কানেও

কথাগুলি গেল। একটু উষ্মা নিয়েই বল্লেন, বউমাকে কত বলছি যে এবার সবাইকে নিয়ে আমাদের ওখানেই চল, আর কেন এখানে থাকা। কিন্তু যেতে চাইছে না, বলছে বাপের বাড়ীতে যাবে এখন। পরে দেখা যাবে কোথায় থাকবে। এটা কী কোনো কথা হোলো বাবা?

এসব কথা বলে উনি আমার উত্তরের অপেক্ষায় চেয়ে রইলেন। বল্লাম, এই সময়টা কিন্তু নিজের মা-বাবার কাছেই থাকা ভালো। মনটা হাল্কা হবে সেখানে।

মনে হোলো এই যুক্তি তাঁর পছন্দ নয়। দেওররাও জিদ ধরেছে তাদের ওখানেই নিয়ে যাবে বলে এবং সেইভাবে সব ব্যবস্থা শুরু করেও দিয়েছে।

বাড়ীতে ঢুকেই দাদার পকেট হাতড়ে দেখেছে এই ভাই কত টাকা আছে সেখানে। ব্যাংকের পাসবুকে কত আছে সেটাও দেখা হয়ে গেছে। আর কোথায় কী কী আছে তারও একটা মোটামোটি হিসেব জোগাড় হয়ে গেছে। বীমা কোম্পানীতে হেমন্ত দত্তের একটা পলিসি ছিল, সেটা বিয়ের আগে করা হয়েছিল বলে মায়ের নামে ছিল তার নমিনি। স্ত্রীর নামে আর বদলানো হয়নি। কাজেই সেই বীমার টাকা মায়ের প্রাপ্য বলে পলিসিটা হাতানো হয়ে গেছে। এসব কত কী সৃষ্টিছাড়া কাণ্ডকারখানা পরে শুনতে হয়েছে আমাকে।

এটাও শুনেছিলাম শাশুড়ী বাড়ীতে ঢুকেই ছেলের মৃতদেহটা এক নজরে দেখে অন্য ঘরে বসে সবার সঙ্গে গল্প জুড়েছেন তাঁর এই প্রথম প্লেনে চড়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে। কীভাবে উনি সিঁড়ি ভেঙ্গে প্লেনের মোটা পেটের ভেতরে এসে ঢুকলেন। তারপর সীটে বসেই কী আরাম মনে হোলো। বাইরের গরম হাওয়া কোথায় যেন উবে গেছে—কী যে ঠাণ্ডা ভেতরটা। মনে হচ্ছিল তখন একটা কিছু গায়ে জড়িয়ে বসলে আরাম পাব। দূর ছাই, আমি কী আর সেসব চাদর-মাদর সঙ্গে নিয়ে গেছি। অফিসের টেলিফোন রাত্রে পেয়েই তো কোনোরকমে ভোরের প্লেনে চেপেছি। তাতে উঠলুম, বসলুম আর নাবলুম। দেখতে দেখতেই তো পাটনার এয়ার পোর্টে পৌঁছে গেলুম। তারপর পাটনার অফিসের গাড়ীতেই তো ওরা পৌঁছে দিল এখানে।

মাঝখানে অবশ্য প্লেনের ভেতর আমাদের নাস্তা দেওয়া হয়েছিল। সুন্দর সুন্দর মুখওয়ালা সব মেয়েগুলো, মুচকি হেসে, আমাদের সামনে একটা করে ট্রে ধরে দিয়ে গেল। আমি কিন্তু সব খেয়ে নিয়েছিলাম, তাইতো বাড়ীতে এসে আর কিছু খাইনি।

এসব বলতে গিয়ে গলায় কোনো বিহ্বলতা প্রকাশ পায়নি পুত্রের অকাল মৃত্যুতে। মনে হোলো এই উপলক্ষে তিনি পেলনে চেপে কৃতার্থম্মন্য। ভাগ্যিস ছেলে মারা গিয়েছিল তা নাহলে এই সাধ জীবনে পূর্ণ হোতো কী কখনো ?

সন্ধ্যার বাবা দুদিন বাদে এখানে এসে পৌঁছেছিলেন কারণ নবদ্বীপে টেলিগ্রাম পৌঁছতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। এখানে এসেই তিনি একটা অদ্ভুত অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গেলেন। সন্ধ্যা চাইছে এই সময়টাতে তার নিজের মা-বাবার কাছে যেতে আর শাশুড়ী ও দেওর মিলে একটা ঘোঁট পাকাচ্ছে যেমন করে হোক এদের কলকাতায় নিয়ে ফেলতে। সেইভাবে জিনিসপত্তর বাঁধাছাঁদাও শুরু হয়ে গেছে তাদের। বড় দুটি সিলিং ফ্যানের একটা নামানোও হয়ে গেছে, বাসনপত্তরের কিছু কিছু প্যাকিংও শুরু। মনে হচ্ছে এসব যেন ওদেরই জিনিস। শুধু যাওয়ার দিনটা স্থির করা বাকী।

সন্ধ্যা আর সন্ধ্যার বাবা প্রফুল্ল সেন আমার মুখ চেয়ে আছেন আমি কোন ব্যবস্থায় সায় দিই। প্রফুল্ল সেন রোজই সকালে আমার কোয়াটারে চলে আসেন আর পরামর্শ চান এই ব্যাপারে। কান্নাকাটি করেন মেয়ের দুর্দশা দেখে। আর দেওরদের এবং শাশুড়ীর অন্যায় রকম দাবীর কথা শুনে হতবাক হয়ে যান। বলেন, আমার মেয়ে শ্বশুরবাড়ীতে বাঁচতে পারবে না। এখনই দেখছি কী রকম ব্যবহার পাচ্ছে মেয়েটা, ওখানে গেলে যে শুধু হেঁসেল ঠেলেই ওর দু মুঠো খাওয়া জুটবে।

এসব কথা বলেন আর কাঁদতে থাকেন সেন মশায়। আর একথাও বলেন, আমি এখন এদের নিয়ে যাই আমার কাছে, তারপরে মনটা ভালো হোলে শ্বশুরবাড়ীতে যাওয়া-আসা করবে। কিন্তু এই মুহূর্তে ওরা যদি জোর করে ওখানে নিয়ে যায় তাহলে মেয়ে আমার আর বাঁচবে না।

সত্যি আমার মনটাও তাই চাইছিল সেন মশায় ওদের তাঁর কাছেই নিয়ে যান। মা-বাবার কাছে যতটা শান্তি ও ভরসা পাবে মেয়ে এই অবস্থায়, শ্বশুরবাড়ীতে সেটা পেতে পারে না। আমার নিকট কয়েকজন বন্ধুদের ডেকে নিলাম। যাদের পরামর্শটাও এই ব্যাপারে নেওয়া দরকার। সবারই রায় হোলো সন্ধ্যা এখন বাপের বাড়ীতেই যাবে। কোনো বাধা আমরা হোতে দেব না।

প্রফুল্ল সেনের মনে আবার এই ভয়টাও হোলো যে দেওররা যদি ট্রেন থেকে জোর জবরদস্তি করে মাঝপথে নামিয়ে নিয়ে যায় কলকাতায়

তাহলে সেটা কে আটকাবে? এখানে তো বন্ধুবান্ধবরা অনেক, কাজেই কেউ কোনো বিরুদ্ধাচারণ করতে সাহস করবে না।

এই ভয়টা প্রফুল্ল সেন মশায়ের অহেতুক ছিল বলব না। মেজ দেওরটির হাবভাব দেখে তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল সে একটা ঝামেলা পাকাবার জন্য তৈরি। ছোট দেওরটিও ধীরে ধীরে তার মেজদার দিকেই ঝুঁকে পড়ছিল যদিও সে এখানেই মৃতদাদার কাছে থেকেই পড়াশোনা করছিল। কৃতজ্ঞতাও যেন হার মানতে চায় অবস্থা বিপাকে।

এই অদ্ভুত অবস্থায় স্থির হোলো যে ব্যাণ্ডেল অবধি পুলিশের পাহারায় ওঁরা যাবেন যাতে কোনো রকম হাঙ্গামায় পড়তে না হয় ট্রেনে। সেখানে থেকে ট্রেন বদল করে নবদ্বীপ যেতে কোনো অসুবিধায় পড়তে হবে না।

বাস্তবিকই পুলিশ বিভাগ থেকে দুজন সশস্ত্র প্রহরী দিয়ে পাঠাতে হয়েছিল ওঁদের ব্যাণ্ডেল অবধি।

হেমন্ত দত্তের মৃত্যুর পরেই কিন্তু 'বাসর' পত্রিকার ছেদ টেনে দেওয়া হয়েছিল।

আমার নিজের মেজকাকা ছাড়াও আর এক কাকা ছিলেন আমাদের সঙ্গে। আমরা তাঁকে ছোটকাকা বলে ডাকতাম। আমাদের এই একান্নবর্তী পরিবারে কে আপন, কে জেঠতুতো, কেইবা খুড়তাতো সেটা বুঝবার জো ছিল না। বাবাই ছিলেন পরিবারের কর্তা। বাবার ওপরে এক ভাই ছিলেন তিনি থাকতেন কলকাতাতে। আমাদের পাটনার বাড়ীতে পিসিমা ও জেঠিমাকে দেখতে পেতাম প্রায়ই এসে থাকতে। এই ছোটকাকা ছিলেন বাবার খুড়তাতো ভাই। কাজ করতেন পাটনার টেলিগ্রাফ অফিসে। ছোটকাকারও জনা পাঁচেক ছেলেমেয়ে ছিল। বড়দিদিকেও দেখতাম প্রায়ই এসে পাটনাতে থাকতে। ভাগনে-ভাগনিরাও পাটনাতেই মামা-বাড়ীতে থাকত বেশির ভাগ সময়।

বাবার উপার্জনের ওপরেই ছিল এই বড় সংসার। ছোটকাকা চাকরিতে ঢোকার পর বাবাকে সাহায্য করতেন। যা মাইনে পেতেন সবটাই বাবাকে দিয়ে দিতেন। বাবা তার থেকে কিছু দিয়ে দিতেন তাঁর হাতে নিজস্ব হাতখরচার জন্য। এমন ভাই না হোলে কী এমন কেউ করে? আগের দিনে বোধহয় এটাই ছিল একটা সুন্দর কর্তব্য-নির্দেশ, পারিবারিক মাধুর্য তা থেকেই স্পষ্ট হোতো।

বাবাকে দেখতাম খাতায় সংসারের যাবতীয় খরচ লিখে রাখতে। নাপিতকে দিয়ে দাড়ি কামানোর যে খরচ ছিল দু পয়সা, সেটা পর্যন্ত।

বাড়ীতে আসত দশ মণ কয়লা চারটে গরুর গাড়ী বোঝাই করে। টাল করে ভেতরে একটা খোলা জায়গায় রাখা হোতো সেটা। প্রয়োজন হোলে আবার আসত কয়লা। সারাদিন দুটো উনুন জ্বলত। সকাল থেকে সেটা ধরানো হোতো। মা ভোর চারটে না হোতে হোতেই উঠে পড়তেন। আমরা টেরও পেতাম না। উঠেই উনুন ধরিয়ে দিতেন। তারপর বাসি কাপড় ছেড়ে, একটু পুজোআর্চা করে, সেই যে রান্নাঘরে ঢুকতেন, কাজ শেষ করে সবাইকে খাইয়ে-দাইয়ে, খানিক বিশ্রাম করে তবে নিজের আহারপর্ব সারতেন। কাকীমা, পিসিমাদের দেখতাম খাইয়ে দিতেন তার আগেই, মা'র সঙ্গে একসঙ্গে বসবেন বলে দেরি করলে ধমক দিয়ে উঠতেন, তোমরা ছেলেমানুষ, অতক্ষণ বসে থাকবে কেন? পেটে পিত্তি পড়ে যাবে। অথচ নিজের শরীরে যে ওই পিত্তির প্রভাব পড়তে পারে সেটা সম্বন্ধে থাকতেন খেয়ালশূন্য। এটাতেই যেন আনন্দ পেতেন বেশি।

মা'র রান্নার হাত ছিল চমৎকার, সামান্য তরকারীর রান্না সেটাও যেন অমৃত বলে মনে হোতো। গোড়ার দিকে দেখেছি পিসিমা, কাকীমা বা বড়দিদি এঁরা সব ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে গোল করে বসিয়ে একটা বড় থালায় ভাত নিয়ে কোনো একটা ঝোল বা ডাল দিয়ে মেখে খাইয়ে দিতেন সবাইকে। আমরা কিন্তু হয় কাকীমা নয় বড়দিদির হাতেই খাওয়াটা বেশি পছন্দ করতাম। জেঠিমা খাওয়াতে এলে আমাদের মুখটা গম্ভীর হয়ে যেতো। হাসি-কোলাহল করে খাওয়ার মধ্যে যে-আনন্দটুকু পাওয়া যেতো, সেটা যেন নিমেষেই হারিয়ে ফেলতাম। কারণটা অবশ্য কিছুই ছিল না, জেঠিমার অসাধারণ গাম্ভীর্যটা আমরা ভয় করতাম খুব বেশি। একটু চেঁচামেচি করলেই কানের ওপর তাঁর বাঁ হাতটা উঠে আসত। আমাদের আর্তনাদ করারও উপায় ছিল না। কারণ তাতে শাস্তিটা আরো বেশি কঠোর হয়ে পড়ত, চক্রাকারে ঘুরে আহারের যে-গ্রাসটা মুখে এসে ঢুকত সেটা বাদ পড়ে যেতো। ইচ্ছে করেই তাঁর হাতটা একটা মুখ ডিঙিয়ে চলে যেতো অন্য মুখের কাছে নির্বি-কারে। তাতে আমাদের সবারই রাগ হোতো বেশি। কাজেই জেঠিমা খাওয়াবেন শুনলে প্রথমেই বলে উঠতাম, আমাদের আজ খিদে নেই।

মা কিন্তু এসবের কোনো আমল দিতেন না, ধমকে উঠতেন, বড়কে অশ্রদ্ধা করা হচ্ছে মনে করে। কিন্তু আমাদের আসল দুঃখটা রয়ে যেতো

মনে। তাই জেঠিমাকে আমাদের কারুরই বেশি পছন্দ হোতো না। অথচ মানুষটা ছিলেন খুবই ভালো। আমরা কলকাতায় গেলে কী খাওয়াবেন, এই ভেবে পাগল হয়ে উঠতেন।

ছোটবেলায় আমাদের পড়ার জায়গারও কোনো নির্দিষ্ট স্থান ছিল না। দিনের বেলাতে যেখানে সেখানে বসে পড়া চলতে পারত, কিন্তু রাত্রিতে একটা ঘরে বেশ বড় একটা শতরঞ্জি পেতে, তার মাঝে একটা ছোট্ট জলচৌকির ওপর মোটা পেটের কাঁচের লণ্ঠন বসানো থাকত। তার চতুর্দিকে ঘিরে পড়তে বসতাম বাড়ীর ছোটরা সব। লম্বা উঁচু কাঁচের ল্যাম্প আমাদের দেওয়া হোতো না পাছে উল্টে পড়ে কোনো অগ্নিকাণ্ড না করে বসি। যতটা পারা যায় সবাই চেঁচিয়েই পড়তাম কারণ তখন সব কিছু মুখস্থ করে গড়গড় করে না বলে গেলে পড়া হোতো না। বুদ্ধির বহর দেখানোর কোনো স্বাধীনতা ছিল না। যার যত মুখস্থ করার শক্তি, সেই তত ভালো পড়াশোনায়, এটাই ছিল বিদ্যাবুদ্ধি যাচাই করার মানদণ্ড। অবশ্য সেটা ছোট ক্লাশেই ছিল বেশি করে প্রচলিত।

মা বলতেন, যত ভোরে উঠে পড়বে তত ভালো মুখস্থ করতে পারবে পড়া। তাই খুব ভোরে উঠে পড়তাম আমি। বাবার ওষুধের ডিসপেনসারির চাবি নিয়ে দরজার তালা খুলতাম। কোনোরকমে চেয়ারগুলো ঝেড়ে নিয়ে বসে যেতাম পড়তে। আমার সেই পড়ার আওয়াজ সামনের মসজিদের আজান দেওয়ার যে-লোকটি ছিল তার চেয়ে বেশি প্রখর ছিল। ফলে পাশাপাশি যেসব বাড়ীর লোকেরা একটু দেরি করে উঠত তাদের ভোরের ঘুমের ব্যাঘাত হোতো প্রচণ্ড। ভোরবেলায় গঙ্গার ঘাটের স্নানার্থীরাও একবার তাকিয়ে দেখতেন আমার দিকে, ভাবতেন কী পড়ুয়া ছেলে, এমনটি তো দেখা যায় না অন্য বাড়ীতে।

সেই সময় গঙ্গার প্রতি সবারই ছিল প্রচণ্ড আকর্ষণ। যতটা না ভক্তির জন্য গঙ্গা টানত তাদের, তার চেয়ে বেশি টানত তার জলটুকু ব্যবহারের জন্য। পাটনায় তখন তো আর কলের জল ছিল না বাড়ীতে বাড়ীতে, আজকাল যেমনটি হয়েছে। কুয়ো ছিল সব বাড়ীতে, বালতি বালতি জল তুলে তবে স্নানপর্ব সারা হোতো। তার চেয়ে গঙ্গার পরিশুদ্ধ জলে স্নানটা ছিল তৃপ্তিদায়ক। প্রাণমন দুটোই জুড়িয়ে যেতো।

মা-গঙ্গার প্রতি অনুরাগ দেখাতে গিয়ে কপালে বড় বড় শ্বেত-লাল চন্দনের টিপটাও প্রদর্শনী হিসাবে সবাইকে দেখানোতেও ছিল একটা আনন্দ। তাই গঙ্গার প্রতিটি স্নানঘাটে একটা ছোট্ট চৌকি পেতে বসে থাকতেন কিছু ব্রাহ্মণ লালরঙের বেশ পরে আর বাটি বাটি চন্দন ও কিছু ফুল নিয়ে।

কিছু সাধুকেও দেখা যেত সারা শরীরে ভস্ম মেখে শুধু এক টুকরো নেংটি পরে, একটা বাঁকানো লাঠির ওপর বাঁ হাতটা ভর দিয়ে গঙ্গার দিকে মুখ করে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বসে থাকতে। কোনো কোনো ভক্ত স্নান সেরে সেই সাধুর কাছাকাছি গিয়ে টিপ করে প্রণাম করে সামনে একটা পয়সা ফেলে দিত। তখনকার দিনে একটা তামার পয়সারও মূল্য ছিল অনেক।

মাকে কখনো কখনো এসব সাধুদের ছাই মেখে বসে থাকার কারণটা কী জিজ্ঞাসা করলে, জিভটা বের করে দাঁত চেপে বলতেন, ছি-ছি, অমন কথা বোলো না। ওটা ছাই নয় বিভূতি এবং গড়গড় করে বলে যেতেন তার আটটি ঐশ্বর্যের নাম যেমন, অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িতা। বলেই হাতটা কপালে ঠেকাতেন বোধ-হয় সাধুদের উদ্দেশ্যে। এসবের মানে কী সেটা তিনি কোনোদিন আমাকে বোঝাননি। সেসবের গূঢ় অর্থ বড় হয়েও জানবার চেষ্টা করিনি। তবে একটা কথা বলতেন, ঘাটে ওরকম ভস্মমাখা কাউকে দেখলে কখনো কাছে যাবে না। সবাই সাধু নয়, ছোট ছোট বাচ্চাদের ধরে নিয়ে যায় কেউ কেউ পাহাড়ে।

আমাদের বাড়ী থেকে এক'শ গজ দূরে ছিল দ্বারভাঙ্গা মহারাজের স্নানের ঘাট এবং মহারাজার দালান বাড়ীর পূর্বপ্রান্তে ছিল কালীর মন্দির। এই কালীকে দর্শন করার জন্য সকাল বিকাল যখনই সুবিধা হোতো দেখতে যেতাম। হাতজোড় করে, দাঁড়িয়ে থাকতাম অনেকক্ষণ। কেন জানি, ভারি ভালো লাগত এই মন্দির। শান্ত পরিবেশ। ভক্তরা আসছে যাচ্ছে, পুজো দিয়ে যাচ্ছে কেউ কেউ বড় বড় লাল জবাফুল ও ফলমিষ্টি থালায় সাজিয়ে। কোনোরকম চাঞ্চল্য নেই, চেঁচামেচি নেই, সব কিছু হয়ে চলেছে সকালে ও সন্ধ্যায়। আমার শিশুমনে কিন্তু এটার প্রভাব পড়েছিল ভীষণভাবে। নিজে কিছু দোষ করলে বা অন্যকেও কিছু অন্যায় করতে দেখলে, দৌড়ে চলে যেতাম এই কালীমন্দিরে। হাতজোড় করে ক্ষমা চাইতাম তাঁর কাছে। এই বালকসুলভ ভক্তি বড় হয়েও থেকে গেছে কিন্তু। ঈশ্বর আছেন কী নেই, এসবের তত্ত্ব কথায় যাইনি কখনো, কিন্তু একটা শক্তি যে কাজ করছে ভেতরে ভেতরে সেটার উপলব্ধি করেছি অনেক সময়। এই উপলব্ধি জিনিসটা যার যার নিজের, সেটা ব্যাখ্যা করা যায় না কারুর কাছে।

কিন্তু বড় বীভৎস লাগত কালীমূর্তির সামনে পাঁঠাবলির ব্যাপারটা। প্রায়ই দেখতাম পাঁঠার মুণ্ডুটা কাটা অবস্থায়, শুধু ধড়টা নিয়ে চলেছে ভক্তরা। বেশির ভাগই ছিল বাঙালী পরিবারের মানুষ। মেয়েরা

লালপেড়ে গরদ গায়ে জড়িয়ে চলেছে ফিটনে চেপে পুজো সেরে। প্রতিদিনই দেখতাম এই দৃশ্য। অমাবস্যার দিনে রাত্রিতেও পাঁঠাবলি চলত। কেন যে এসবের ব্যবস্থা ছিল জানি না। মার কাছে জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, মানত থাকে যাদের, তাদের এটা করতেই হয়।

এইটুকু বলেই মা অন্য কাজে চলে যেতেন। দেবতাকে কিছু দেবার সংকল্প যাদের থাকে তারাই মানত করে থাকে। এই মানতটা কিন্তু পরিবর্তে কিছু পাবার উদ্দেশ্য নিয়েই। অর্থাৎ ঈপ্সিত জিনিসটা লভ্য হলেই তবে দেবার কাজটা সংঘটিত হবে। তার আগে নয়। এটা তো অনেকটা ঈশ্বরকে উৎকোচ দেবার মতো, অর্থাৎ কিছু লাভ হলেই তার পরিবর্তে পুরস্কার। গোটা সৃষ্টিটাই যাঁর ধরে নেওয়া হয়েছে এবং ফলমূল, পশুপক্ষী সবই যদি তাঁরই রচনাফল, তাহলে তাঁকে আলাদা করে ধরে দেওয়ার অর্থটা কী? বিশেষ করে একটা নিরীহ জীবকে ধরেবেঁধে তাঁর সামনে হাজির করে বধ করা একটা পৈশাচিক উল্লাস ছাড়া তো আর কিছু নয়। এতে শিবপত্নী কতখানি খুশি হয়ে মানতকারীকে শুভাশীষ দেন সেটা বিবেচ্য।

আমাদের বাড়ীতেও যে এরকম মাঝে মাঝে না হয়েছে এমন নয়। একটা কচি পাঁঠা আগে থেকেই কিনে রাখা হোতো। আমরা ছোটরা খুঁজে খুঁজে সবুজ ঘাস নিয়ে আসতাম খাওয়াতে, ছোলাও খেতে দেওয়া হোতো এই ছাগশিশুকে। আমাদের বেশ আনন্দ হোতো তখন। কিন্তু সেই আনন্দ কয়েকদিন পরেই নিরানন্দে পরিণত হোতো যখন দেখতাম আমাদের বাড়ীর চাকরটা সেটাকে একদিন পাঁজাকোলা করে নিয়ে চলেছে কালীমন্দিরের দিকে এবং খানিক পরেই তার মুণ্ডুবিহীন ধড়টাকে বাড়ীতে নিয়ে এসে ফেলেছে। পরে একজন কসাই বাড়ীতে এসে তার ছাল ছাড়িয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলত মাংসগুলো। সেই বলির পাঁঠার মাংস আবার অনেক ঘরে পাঠানো হোতো প্রসাদ হিসেবে।

চান্দ্র-বৈশাখের শুক্লা তৃতীয়ার দিনে মা খুব পরিপাটি করে এবং শুদ্ধাচারে একটা জিনিস তৈরী করতেন প্রতিবছর। একমাস আগে থেকেই তার যোগাড়যন্ত্রর শুরু হোতো, বিশেষ করে কালো সরষে কেনাটা। নানা দোকান থেকে সরষের নমুনা নিয়ে আসতাম আমি, সেটা খেয়ে পরখ করে তার ঝাঁজের আস্বাদ চেখে, তবে আনতে হোতো সেরা সরষেটা। কাসুন্দি তৈরী হোতো অক্ষয় তৃতীয়ার দিনটিতে। ছোট বড় নানা সাইজের

বোতল পরিষ্কার করে রাখা হোতো আগে থেকেই কারণ ওর ভেতরেই কাসুন্দি তৈরী হয়ে গেলে ভরা হোতো।

চান্দ্র-বৈশাখের এই শুক্লা তৃতীয়ার দিনটাই কেন রাখা হয়েছিল কাসুন্দি তৈরীর উপযুক্ত সময়, এসবের উত্তর মা দিতে পারতেন না। শুধু বলতেন, এই দিনটিতে কৈলাসে নাকি শিব পার্বতীকে আশীর্বাদ করেছিলেন ভূলোকে অক্ষয় হয়ে থাকবেন বলে। কেদার-বদ্রির মন্দির যেটা শীতের সময় বন্ধ থাকে বরফের জন্য, সেটা এই দিনটিতেই খোলা হয় আবার ভক্তদের জন্য।

এসবের সঙ্গে কাসুন্দির যে কী সম্পর্ক, সেটা বলতে পারতেন না। শুধু বলতেন, এই প্রথাই চলে আসছে চিরকাল। আমার শাশুড়ী এবং তাঁর শাশুড়ীও এই দিনেই কাসুন্দি তৈরী করতেন, কাজেই আমিও নিয়মমত করে চলেছি যতদিন পারি। এরপরে আমাদের কেউ করবে কিনা জানি না। তবে আমার বড়দিদি কিন্তু আমার মায়ের কাছ থেকে কী করে করতে হয় শিখে নিয়ে নিষ্ঠাভরে তৈরী করতেন কাসুন্দি।

কাসুন্দি তৈরী করার একটা মস্ত বড় ফর্দ তৈরী করতে হোতো আগে থেকে। সরষেটা তো ছিল প্রধান উপকরণ যেটা অনেক আগেই কেনা হোতো বলেছি। শুধু কিনে ঘরে ফেলে রাখলে চলবে না, সেটার আবার বাছাবাছি ছিল—অন্য কোনো সরষের দানা থাকবে না তাতে, কুলোতে রেখে সেটাকে ঝাড়াই বাছাই করতে হোতো। নিয়ম অনুসারে সওয়া সের বা সওয়া দুসের সরষে কুটতে হোতো, অর্থাৎ সিকিভাগ যুক্ত হোতো সেরের সঙ্গে। যেমনটি সত্য নারায়ণের পুজোর সিন্নি তোয়ের করতে সওয়ার হিসেব হয়ে থাকে।

অন্যান্য জিনিসের মধ্যে হোলো একটা বড় মাটির হাঁড়ি, একটা মাটির সরা হাঁড়ির ঢাকনার জন্য। তারপর একটা গোটা কাঁচা আম, আন্দাজ মতো গুঁড়ো সন্ধক লবণ, গোটা পাঁচেক আস্ত হলুদ।

অক্ষয় তৃতীয়ার দিন সকালবেলা উপোস করে বাড়ীর অন্যান্য বউদের নিয়ে গঙ্গার ঘাটে যেতেন মা। সেখানে স্নানটি সেরে সরষেটা একটা সাদা শুদ্ধ কাপড়ের টুকরোতে বেঁধে ধুয়ে নিতেন জলে। তারপরে গঙ্গার নামোচ্চারণ করতে করতে বাড়ীতে এসে সেই ধোয়া সরষে রোদে শুকোতে দিতেন।

বেলা তিনটে থেকে শুরু হোতো সেই সরষে হামানদিস্তায় ছেঁচিয়ে একেবারে মিহি করে গুঁড়ো করা। তারপর চলত সেই গুড়ো একটা নেকড়ার ওপরে রেখে চূর্ণীভূত জিনিসটা ছেঁকে নেওয়া। দেশের বাড়ীতে

ঢেঁকিতে পা দিয়ে বাড়ীর বউমারা নাকি এই কাজটা করতেন। শহরে তো ঢেঁকির কথা ভাবা যায় না, কাজেই হামানদিস্তায় কাজটা সারতে হয় এখানে।

একটা পরিষ্কার হাঁড়িতে জল গরম করার জন্য একটা আলাদা তোলা উনুনে চাপিয়ে দেওয়া হোতো। সেই জল সেদ্ধ হয়ে যখন তার ঘনত্ব বেড়ে যেতো তখনই সেটা উপযুক্ত মনে হোতো কাসুন্দি তৈরীর জন্য। যে-পরিমাণ সরষে নেওয়া হোতো কাসুন্দির জন্য, পুরোপুরি গুঁড়ো হয়ে গেলে সেটা অল্প অল্প করে মাটির হাঁড়িতে ফেলে সমপরিমাণ গরম জল তাতে ঢেলে ক্রমাগত নাড়াচাড়া করতে হোতো একটা কাঠের হাতা দিয়ে। এইভাবে গুঁড়ো সরষে গরম জলের ভেতর নাড়াচাড়া হোতে থাকত মাঝে মাঝে তাতে সন্ধক লবণ দিয়ে। এই করে তৈরী হোতো বাড়ীর কাসুন্দি। তারপর সেই হাঁড়ি সরা-চাপা অবস্থায় ঠাকুর ঘরে কিংবা ভাঁড়ার ঘরের একটা পবিত্র জায়গায় রাখা হোতো।

পরদিন ভোর থেকে যাতে সূর্যের আলো পায় এমন একটা খোলা জায়গায় রেখে দেওয়া হোতো বেলা চারটে অবধি। এইভাবে সাত দিন সূর্যের তাপ খাওয়াতে হোতো এই কাসুন্দিকে। তবেই তার ঝাঁজ বৃদ্ধি পেতো। সাতটা দিন পেরিয়ে যাবার পর এই কাসুন্দি বোতলে বোতলে ঢালা হোতো বিতরণের জন্য। চেনাজানা সব বাঙালীর বাড়ীতে পাঠানো হোতো প্রসাদ হিসাবে।

স্কুলের ছাত্র-জীবনটা ছিল কিন্তু ভারি মধুর। সংসারের দায়দায়িত্ব নেই, জীবনধারণের কোনো গ্লানি নেই। কোনোরকম বাছবিচারের কঠোরতা নেই। শুধু নিজের পড়াশোনাটা ঠিকমত করো আর খেলে বেড়াও। এরকম মুক্তজীবন কী আর কখনো আসতে পারে?

স্কুলে থাকাকালীন এক ক্লাসের সহপাঠী ছাড়াও বন্ধুত্বের ব্যাপ্তিটা উঁচু ক্লাসের কয়েকজনের সঙ্গেও ছড়িয়ে গিয়েছিল, যেমন প্রসারিত ছিল নীচু ক্লাসের দুই একজনের সঙ্গেও। সেটা তখন ক্লাসের নীচু-বড় পার্থক্য দিয়ে যাচাই করা হোতো না। বন্ধুত্বটা গড়ে উঠত খেলাধুলোর সঙ্গী-সাথী হিসেবে। তাই বিহারী-বাঙালী-মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ ছিল না স্কুলে। বন্ধুত্বটা নিবিড় হয়েছিল স্কুলে ফুটবল খেলার টিম তৈরী হওয়ার কারণবশত।

আজ খুব বেশি করে মনে পড়ছে অবাঙালী কয়েকজন বন্ধুর কথা

যাদের সঙ্গে হৃদ্যতাটা জমে উঠেছিল মাখামাখিভাবে। অবাঙালী বলে তাদের দূরে ঠেলে রাখা হয়নি কখনো। স্মৃতির কোঠায় যারা বড় বেশি উজ্জ্বল হয়ে আছে এখনও, তারা হোলো যোগেন্দর, নারায়ণ, সীতারাম, সমি আহমেদ, সুলেমান, চন্দ্রদেও ও নন্দলাল। বাঙালী নয় বলে খাঁটি বন্ধু হওয়ার কোনো বাধাবিশেষ হয়নি। এদের মধ্যে গুণ ছিল অনেক। পারস্পরিক প্রীতির অমর্যাদা ভাষা নিয়ে ওঠেনি কখনো। একটা জিনিস কিন্তু লক্ষ্য করার মতো ছিল সেইসময়। স্কুলে বাঙালী ছাত্রের সংখ্যা বেশি হওয়ায় অবাঙালীরাও কিন্তু বাংলা বলতে শিখে গিয়েছিল আমাদের সঙ্গে থাকতে থাকতে, যদিও উচ্চারণটা ঠিকমত হোতো না তাদের। আমরা অনেক সময় হাসাহাসি করেছি, বিদ্রূপও যে না করেছি এ নিয়ে এমন নয়। কিন্তু সেটা নিয়ে তাদের মনে কোনো ক্ষোভের সৃষ্টি হয়নি কখনো। হেসেই ঠাট্টা বিদ্রূপ উড়িয়ে দিত সবাই, বন্ধুত্বে চিড় ধরেনি কখনো তা নিয়ে।

অবাঙালী বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ছিল যোগেন্দর। চৌহাট্টায় আমাদের পাশের বাড়ীতেই থাকত। সে আমার চেয়ে এক ক্লাস ওপরে পড়ত একই স্কুলে। এর বাংলা শেখার আগ্রহটা ছিল প্রচণ্ড। আমার কাছেই বাংলা শিখত। বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ পড়েই কিন্তু শরৎচন্দ্রের বইয়ের প্রতি ঝোঁক চেপেছিল যার দরুন বাংলা পড়াটা তরতর করে এগিয়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলী'র প্রতিটি গানের ব্যাখ্যা কলেজে উঠে এমন সুন্দরভাবে করত যে আমরা নিজেরাই অবাক হয়ে যেতাম। বাঙালী হয়েও অত সুন্দর করে 'গীতাঞ্জলী'র মূলতত্ত্ব আমরা তখনও বুঝিনি।

এই যোগেন্দর কিন্তু পরিণত বয়সে তার দীক্ষাগুরু করেছিল কলকাতার একজন নামকরা বৈষ্ণবকে। তাঁর লিখিত সব বাংলা ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করে রীতিমত আলোচনা করেছে তাঁর গুরুর সঙ্গে যেটা অন্য কোনো বাঙালী শিষ্যের সাহসে কুলোত না। তাই গুরুর সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য ছিল এই যোগেন্দর। গুরু বাংলায় লিখতেন চিঠি এর কাছে, সেসব যোগেন্দর আবার আমার কাছে পড়ে শোনাত এবং বেশ গর্ববোধ করত বাংলা পড়তে পারছে বলে।

একবার যোগেন্দরের গুরু এলেন পাটনায় যোগেন্দরের বাসাতেই। যোগেন্দর তখন থাকত মহেন্দ্রু অঞ্চলে। ভাড়া বাড়ী। সংসারের তুলনায় রোজগার সামঞ্জস্য রেখে বাড়েনি। তবুও গুরুর খাতির করতে কোনো ত্রুটি রাখেনি। পাটনার অন্যান্য বিহারী শিষ্যরাও তখন যোগেন্দরের বাড়ীতে সকাল-বিকাল আনাগোনা করছে ও আহারপর্ব সারছে। এটাই

নাকি নিয়ম, যার ওখানে গুরু উঠবেন তাকেই সব শিষ্যকে ডাকতে হবে, খাতির করতে হবে কদিন।

আমাকে একদিন এসে বলে গেল যোগেন্দর তার গুরুকে দেখার জন্য। আমি যাতে দীক্ষা নি সেই চেষ্টাও সে করেছে আমাকে আগে অনেকবার। কিন্তু সফল হোতে পারেনি। প্রত্যেকবারই এই বলে ঠেকিয়ে রেখেছি যে আমার সেরকম কোনো ভক্তি শ্রদ্ধা নেই, মনের বাসনাও নেই কাউকে গুরু করার। মনের তাগিদ না এলে কী জোর করে কিছু করা যায়?

আমার এই কথায় দুঃখ পেয়েছে সে খুব। সতীর্থের এইভাবে অনুরোধের প্রত্যাখ্যান ভালো লাগেনি। সেদিন কেন জানি, ওর মহেন্দ্রুর বাসায় সন্ধ্যার সময় পৌঁছে গিয়েছিলাম ওর গুরুকে দেখার জন্য। আমি তখন থাকি গর্দানিবাগে। এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত বিরাট পথের পাড়ি দেওয়া। রাস্তায় কিছু ফুল ও ফল মিষ্টি কিনে নিলাম। আমার গুরু নয় বলে কী হবে, বন্ধুর গুরু তো, নৈবেদ্য নিয়ে না গেলে বন্ধুকেই অসম্মান করা হয়।

তখন সন্ধ্যে হয় হয়। চারিদিক লাল-নীল-সাদা টুনি বাল্‌ব দিয়ে সাজানো বাড়ীটা। পাশের বাড়ী থেকে বৈদ্যুতিক লাইন নিয়ে নাকি এই কাণ্ড করেছে সে। লোকজন গমগম করছে, সবাই ভক্তিশ্রদ্ধায় গদগদ। গুরু একটা লাল মোলায়েম কার্পেটের ওপর বসে আছেন, শুধু সাদা ধুতি ও নিমা গায়ে। কয়েকজন ভক্ত ঘিরে রয়েছে তাঁকে। সন্ধ্যার পর আরতি করে তবে গুরুর প্রবচন শুরু হবে। সেই প্রতীক্ষায় এক একজন করে এসে বসছে।

আমি যেতেই যোগেন্দরের হাসি আর ধরে না। নিয়ে গেল গুরুর কাছে আলাপ করিয়ে দিতে। শ্রদ্ধাবনত হয়ে ফুল-ফল সামনে রেখে তাঁর পায়ে প্রণাম করলাম। মনে হোলো তাঁর কাটা পায়ের ওপর আমার মাথাটা যেন আছড়ে পড়ল। শিউরে উঠলাম, কি জানি, তাঁর সেই ছিন্ন পায়ে আমি কোনো যন্ত্রণার সৃষ্টি করলাম না তো? গুরু শুধু হাত তুলে আমাকে আশীর্বাদ করলেন। বসতে বল্লেন।

আমি বিরাট আঙিনাজোড়া পাতা শতরঞ্জির একটা পাশে গিয়ে বসলাম। তাঁর পায়ে একটা ব্যথা দিয়ে এলাম, এটাই সংকুচিত করে রেখেছিল আমার মনটাকে। সত্যি তো কী দরকার ছিল অমন করে উবুড় হয়ে পড়ার। একটু যে সংশয় ও অস্থিরতা ছিল না আমার মনে এমন কথা বলব না। একজন পণ্ডিত ও ধার্মিক ব্যক্তির সান্নিধ্যে এলে কার না এমন হয়?

নিজেকে তখন অকিঞ্চিৎকরই মনে হয়। বাইরে যতই না বড় বড় বুলি আওড়াই, যে কোনো গুরুর সামনে মনে একটা আবেশ আসতে বাধ্য।

যোগেন্দরের গুরু ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র সেন। ইনি 'দেশ' পত্রিকার গোড়ার দিকে সম্পাদক ছিলেন। সেটা খুব সম্ভব ১৯৩৫-৪০ সালের কথা। একজন মস্ত বড় দেশভক্ত, বৈষ্ণবরসে আপ্লুত ছিলেন। দেশ-বিদেশের লোকেরাও এঁর কাছে এসেছেন অনেক কিছু জানতে। সবাইকে আবার দীক্ষা দেন না তিনি, আধারটা কেমন সেটা যাচাই করে নেন অন্তর থেকে। দিব্যদৃষ্টি প্রচণ্ড।

আগেই বলেছি যোগেন্দরের আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না, তাই ইচ্ছা থাকলেও গুরুকে যে প্রাণভরে কিছু দেবে, সেটা সম্ভব হোতো না। একবার গুরুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে কলকাতায় গিয়ে খুব ভালো লেগেছিল নানা জায়গায় ভক্ত সমভিব্যাহারে বসে গুরুর কথা শুনতে। প্রতিবছর যাওয়া সম্ভব হোতো না, অথচ গুরুজীর জন্য মনটা কেমন ব্যাকুল হয়ে থাকত।

দোল পূর্ণিমার দিন গুরুর জন্মদিন পালিত হোতো। কয়েক বছর যাওয়া হয়নি, এবার যাবে ঠিক করেছিল। শুধু স্ত্রীকে নিয়ে যাবে কারণ সেও এই গুরুর কাছেই দীক্ষিত। হাতে টাকা-পয়সা কিছু নেই। যাবার মতো অর্থ হাতে না থাকলে শুধু খালি হাতে কী যাওয়া চলে? এইসব সাতপাঁচ ভেবে নিজের গ্রামদেশের কিছু জমি বিক্রী করে সেই টাকা দিয়ে কলকাতায় যেমন করেই হোক গুরুর জন্মদিনে উপস্থিত হবে। এই মনের আকাঙ্ক্ষা কাউকে ব্যক্ত করেনি সে, এমনকি স্ত্রীকেও বলেনি। হঠাৎ দিন কয়েকের মধ্যে গুরুর কাছ থেকে একটা চিঠি এসে হাজির। লিখেছেন, জমি বিক্রী করে আমাকে দর্শন করার কোনো প্রয়োজন নেই। কোনো কাজ এমন কিছু করবে না যেটা আমার প্রাণে ব্যথা দেয়। নিবৃত্ত থেকো জমি বিক্রীর ব্যাপারে।

অবাক হয়ে গেল যোগেন্দর চিঠি পড়ে। এ কেমন করে হোলো, আমি তো কাউকে জানাইনি জমি বিক্রী করে যাব বলে?

সে কী কান্না যোগেন্দরের। কী করে জানলেন গুরু আমার অন্তরের কথা? নিশ্চয় তিনি আমার খুব কাছে কাছে থাকেন। এই বলে সে গুরুর ফোটোর ওপর লুটিয়ে পড়ে অঝোরে কাঁদতে লাগল।

বঙ্কিমচন্দ্র সেনের শেষ বইটি ছিল গীতার ওপর ব্যাখ্যা। বইটির নাম 'গীতা মাধুরী'। যোগেন্দরের এই বইটি আদ্যোপান্ত পড়া কয়েক-দিনের মধ্যেই হয়ে গেল। তার গূঢ় অর্থ রোজই রাত্রে একটা কেরোসিন ল্যাম্প জ্বেলে স্ত্রী-ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঘিরে তাদের বোঝাতে বসে। এমনি

একদিন হঠাৎ স্ত্রী চমকে ওঠে গুরুকে যোগেন্দ্ররের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। চীৎকার করে উঠতে যাবে প্রণাম করতে, এমন সময় গুরু হাত উঠিয়ে বারণ করলেন এবং মুহূর্তে অন্তর্ধান হলেন। একথা অবিশ্বাস্য হোলেও, কিন্তু ঘটনাটি সত্যি। গুরুশিষ্যের অন্তরের যোগাযোগটা বোধহয় এমনি হয়ে থাকে। সাধনা করে কিছু পাওয়া বোধহয় এটাই।

গুরুর একটা পা কী করে কাটা পড়েছিল তার ইতিহাস আছে। একদিন 'দেশ' পত্রিকার অফিস থেকে উঠে ছুটির পর রাস্তায় নেমে ট্রাম ধরতে যাবেন এমন সময় পা পিছলে একেবারে ট্রামের তলায়। ট্রাম চলছিল তখন, থেমে গেল। হৈ চৈ করে লোকজন ছুটে এলো, কে গেল ট্রামের তলায়। এক বিহারী বুড়ী খোঞ্চা নিয়ে পাশের ফুটপাতে তেলে ভাজা বিক্রী করছিল। সে দেখতে পেয়ে দৌড়ে গিয়ে তুলে নিল বঙ্কিমচন্দ্র সেনের মাথাটাকে নিজের কোলে। বেদনার্ত হয়ে কেঁদে উঠল সে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সেনের কোনো আর্তনাদ নেই। ধীরে ধীরে বের করা হোলো দেহটাকে। ততক্ষণ 'দেশ' পত্রিকার লোকজন সব ছুটে এসেছে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হোলো চিকিৎসার্থে। সার্জেন বল্লেন, এই পা জোড়া লাগাবার মতো নয়। ছেদন করা ছাড়া উপায় নেই।

ঋষিকল্প মানুষটির তাতে কোনো খেদ নেই। বল্লেন, যদি বিচ্ছিন্নই করতে হয় পা-টা, করে দাও। কিন্তু ছেড়াখোঁড়া করতে গিয়ে কোনো চেতনানাশক ওষুধ প্রয়োগ করা চলবে না, না চলবে বিশেষ স্থানটি অসাড় করার কোনো অবেদনিক কোনো দ্রব্যের ব্যবহার।

এই কথায় গোটা মেডিকাল কলেজ হাসপাতালে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হোলো ডাক্তারমহলে। এ আবার কেমন সৃষ্টিছাড়া কথা? সম্ভব নাকি কখনো সম্পূর্ণ সজ্ঞানে পা ছেদন করা? মানুষটি তবুও অনড়। কিছু হবে না, দেখ না তোমরা।

ইচ্ছানুরূপ তাই করা হোলো কিন্তু। কোনোরকম কাতরানি বা কষ্টবোধক শব্দ বেরোয়নি মুখ থেকে। সব কাজ শৃঙ্খলার সঙ্গেই শেষ হোলো। এই চমৎকারিতার কাহিনী কিন্তু ছাপা হয়েছিল কলকাতার দৈনিকগুলিতে। এমন চরণপদ্ম পুরুষের পায়ের অপারেশন করে ডাক্তাররাও ধন্য হয়েছিলেন সেদিন।

সেই নমস্য ব্যক্তির কর্তিত পায়ে সেদিন আমার মাথা ঠেকাতে গিয়ে আঘাত দিয়ে খুবই লজ্জিত হয়েছিলাম।

শতরঞ্জির এক পাশে গুরুর আসন থেকে অনেকখানি দূরত্ব রেখে,

একটু আড়াল করেই বলা চলে, বসেছিলাম নির্বিকার চিত্তে। প্রবচন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখি আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কথা বলে চলেছেন উনি, আমাকেই উদ্দেশ্য করে আমার আত্মগত কতকগুলি প্রশ্নের জবাব হিসাবে হয়ত। তার সার কথাটা এই—ভগবানের নাম নেবার জন্য কী আবার তাগিদের প্রয়োজন হয় নাকি? তাগিদটা তো কোনো রেশন-কার্ড নয় যে ঘরে ঘরে গিয়ে প্রত্যেক মানুষকে বিলিয়ে আসতে হবে তবে তারা নাম করবে ঈশ্বরের। ভক্তি আনতে হলে যেতে হবে মন্দিরে, সান্নিধ্যে আসতে হবে বড় বড় ভক্তদের। তাঁদের প্রবচন শুনে তবেই শুদ্ধ হবে মন।

এসব কত কী বলেই চলেছিলেন উনি একমাত্র আমার দিকে তাকিয়ে। চোখ যেন তাঁর কিছুতেই অন্য দিকে সরছিল না। নিবদ্ধ ছিল ধর্মেকর্মে আসক্তিহীন এই মানুষটির দিকে চেয়ে যদি কোনো পরিবর্তন আনা যায় দেবদ্বিজে মনটা টেনে এনে।

রাত ন'টা বাজতেই আমি নিঃশব্দে উঠে পড়লাম ভক্তদের সভাস্থল থেকে। কেউ টের পেয়েছিল কিনা জানি না, তবে গুরুজী দেখতে পেয়েছিলেন আমাকে ধীর পায়ে সভা ছেড়ে চলে যেতে।

সেদিন গুরুজীর কথাবার্তা শুনে মনে সামান্য পরিবর্তন এলেও কোনো দীক্ষা নেওয়া হয়নি কিন্তু আমার এঁর কাছে, কারণ কয়েক বছর বাদেই ইনি দেহরক্ষা করেছিলেন।

শৈশবের স্কুলপাঠ শেষ হয়েছিল ১৯৩৮ সালে। আমাদের স্কুল ফাইনালের টেস্ট-পরীক্ষার খাতা বড় মাস্টারমশায় পাঠিয়েছিলেন বাইরের কাউকে দিয়ে পরীক্ষা করাতে যাতে পক্ষপাতিত্বের কোনো দোষারোপ না হয় এবং সঠিক ওজনে খাতাগুলি দেখা হোতে পারে। তাই সবাই ভয়ে ভয়ে থাকতাম কী জানি পাশ করতে পারব কিনা। এই স্কুলের (টি, কে, ঘোষ একাডেমি) প্রাক্তন ভালো ছাত্রদের দিয়ে খাতাগুলি পরীক্ষা করানো হোতো, তার মধ্যে একজন ছিলেন ইণ্ডিয়ান সিভিল সারভিসের সদস্য—নাম ত্রিবেণীপ্রসাদ সিং। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন সারা প্রদেশে। তখন বিহার-উড়িষ্যা মিলে একটা প্রদেশ। বড় মাস্টারমশায়ের খুব প্রিয় ছাত্র ছিলেন ইনি। অঙ্কেতে মাথাটা ছিল তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, একেবারে আমাদের বড় মাস্টারমশায়ের মতো অঙ্কেতে মাথা। তাই একজন মনের মতো শিষ্য পেয়ে তাঁকে উজাড় করে

দিয়েছিলেন অঙ্ক-শাস্ত্রের সব কলাকৌশল শিখিয়ে পড়িয়ে। গুরু-ছাত্রের সম্পর্কটা তাই চিরকালই মধুর ছিল এঁর সঙ্গে। শিষ্য অনেক উঁচুতে উঠে যাওয়ার পরেও। এমন কি, আই, সি, এস, হয়ে বিহারের উচ্চপদে থাকা সত্ত্বেও। নিজের চোখে দেখেছি, বড় মাস্টারমশায় হয়ত হেঁটে চলেছেন বড় রাস্তা দিয়ে কোথাও, সেই সময় মোটরযানে ত্রিবেণীপ্রসাদ সিং সেক্রেটেরিয়েটে চলেছেন কাজে নিজে গাড়ী হাঁকিয়ে। গুরুকে রাস্তায় দেখতে পেয়ে গাড়ী থামিয়ে নেমে বড় মাস্টারমশায়ের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে তাঁর কুশল মঙ্গল জেনে তবে রওনা হয়েছেন আবার। আজকাল কজনকে এরকম দেখতে পাওয়া যাবে? নিজের পদমর্যাদার কথা ভেবে, এইভাবে রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে দশজনের সমক্ষে পায়ে হাত দিতে সংকুচিত হয়ে পড়বে যে সে?

স্কুল-পাশ শেষ করে নিকট বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই কলেজের আঙিনায় প্রবেশ করতে পারেনি। আর্থিক কারণটাই ছিল প্রধান--কেউ ছোট চাকুরিতে ঢুকে পড়েছিল আবার কারুর ভাগ্যে জুটেছিল বাপের তেজারতি কারবারে প্রবেশ করার। এদের মধ্যে এক বিহারী বন্ধু ছিল মুদির ছেলে। লজ্জা পেত আমাকে দেখে বাপের সঙ্গে মুদির দোকানে চৌকিতে বসে চাল-ডাল মেপে খদ্দেরের ঝোলাতে ভরে দেবার সময়।

আর একজন বন্ধু ছিল মুসলমান---মেওয়াওয়ালার বংশজ। আমাকে দেখলেই আহ্লাদে হাসিতে আটখানা। কম বয়সে বিয়ে হওয়াতে যা হয়, বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে ফলের দোকানে বসত। আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখিয়ে দিত ছেলেদের, দেখ আমার স্কুলের বন্ধু, একসঙ্গে পড়েছি। এখন কত বড় পোস্টে রয়েছে। অথচ আমি সেই ফলই বেচে চলেছি জীবনভর।

তারপরে সে আমার হাতে একটা ঠোঙ্গাতে কিছু কিসমিস ও আখরোট ভরে দিয়ে বলত, এই নাও বাড়ীতে নিয়ে যাও ছেলেপেলেদের জন্য।

দাম দিতে গেলে নিত না কিছুতেই। লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে যেতো বন্ধুর অসীম ভালোবাসা দেখে।

স্কুলের আর একজন সহপাঠী ছিল সীতারাম সিং। ভালো ফুটবল খেলোয়াড়। স্কুলের টিমে সেই ছিল ক্যাপটেন। সবার সঙ্গেই অমায়িক ব্যবহার। ম্যাট্রিকটা পাশ করা হয়নি তার। বাপের অকালমৃত্যু হওয়াতে অল্পবয়সেই চাকরি নিতে হয়েছিল সংসার চালাবার জন্য---পোস্টাফিসে ডাকবিলির পিওন। শেষ জীবন অবধি তাই ছিল।

আমাদের বাড়ীতে চিঠি দিতে এলে বসতে বলতাম তাকে কিন্তু লজ্জায় কোনোদিন চেয়ারে বসেনি। বড় খারাপ লাগত আমার। এড়িয়ে থাকত সব সময়। কোনোরকমে দরজার ফাঁক দিয়ে চিঠি গলিয়ে দৌড় লাগাত। একদিন আমার অফিসে সীতারাম সিং পিঠে চিঠির বড় ঝোলা নিয়ে খাকী ড্রেসে একটা রেজিস্ট্রি চিঠি আমাকে দিতে ঢুকেছে। ঘরে ঢুকে আমাকে দেখেই সে চমকে উঠল। আমি প্রথমেই তাকে আমার সামনের চেয়ারে বসতে বল্লাম। কিছুতেই বসবে না সে। শুধু হাত জোড় করে, না না বলে চলেছে। তখন রাগ হোলো আমার। বল্লাম, দেখ তুমি যদি চেয়ারে না বস, আমি চিঠি নেব না সই করে।

তখন দেখি সে অহেতুকী লজ্জাজনিত কুন্ঠা নিয়ে দেহটাকে কোনো-রকমে চেয়ারে ঠেকিয়ে বসেছে। এই যে ওর মধ্যে কুন্ঠা, সেটা বংশ পরম্পরাগত হয়ে মনে গেঁথে বসে আছে, তাই আপন করতে বাঁধছে যাঁরা একটু উঁচুতে। ওরও যে একটা স্বতন্ত্র মূল্য আছে সে সম্বন্ধে সে অজ্ঞান। মানুষের যেমন বাঁচার জন্য চাই খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, কর্ম ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা, তেমনি চাই প্রতিটি মানুষের মধ্যে একটা মর্যাদাবোধ। তখনই তার পক্ষে বেঁচে থাকাটা অর্থবহ হয়ে ওঠে। যার কোনো সম্মান নেই নিজের কাছে ও অপরের কাছে সে থাকে জীবন্মৃত হয়ে। এসব আমাদের সামাজিক অব্যবস্থার কুফল ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে? কেউ হয়ত ভাগ্য জোরে অনেক ওপরে উঠে এসেছে, কিন্তু ঊর্ধ্বে অবস্থিত হওয়ার অর্থ এই নয় যে ছোটকে ঘৃণিত হোতে হবে। উন্নীত হবার যোগ্যতা হয়ত তার অনেক বেশি ছিল কিন্তু অভাব অনটন তাকে বেশি দূর এগোতে দেয়নি। এটাই কী তার বড় অপরাধ? মানুষের মর্যাদা পাওয়ার অধিকারও কী তার নেই? আজ যদি সমাজটা অন্য রকম হোতো তাহলে মাথা উঁচু করে বসত সে আমার সামনের চেয়ারটায় যেটা তার অস্তিত্বরক্ষার পক্ষে অপরিহার্য। আজ সভ্যতার মানদণ্ডে আর্থিক সমৃদ্ধিই মর্যাদার একমাত্র উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এরা নিজেদের হীন মনে করে।

কলেজ জীবনে প্রবেশাধিকার হয়েছিল ১৯৩৯ সালে যদিও ১৯৩৮ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছিলাম। এক বছর পড়াশোনা থেকে বিরত থেকে কেন জানি খেয়াল হয়েছিল একটা নতুন বিদ্যা শেখার---সেটা হোলো শর্টহ্যাণ্ড ও টাইপিং। এটা আমার বড়দাদার কাছেই শিখতাম কারণ উনি ছিলেন এই বিদ্যায় দক্ষ এবং পাটনা হাইকোর্টে কাজ করতেন প্রধান বিচারপতির সেক্রেটারি হিসাবে। বাড়ীতেই একটা টাইপ রাইটার

ছিল, তার ওপরেই হাতের কসরত চলত যখন তখন ঘটাং ঘটাং করে। এক বছর লেগেছিল মোটামুটি এই দুটি জিনিস শিখতে। কাজ চালাবার মতো আর কী। তবে কলেজে ঢুকে কাজে লেগেছিল এই শিক্ষা। সব ক্লাসেই প্রায় লেকচারগুলো নোট করে নিতাম শর্টহ্যাণ্ডে পরে সেগুলো ইংরাজী অক্ষরে লিখে নিতাম। ফলে আমাকে বহু বই কিনতে হয়নি, লেকচার নোটস পড়েই কাজ চালিয়েছি। এই কারণে সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম––বহু সহপাঠী আমার এই নোটের জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করত।

আমাদের পাটনা কলেজে তখন বাঙালী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল অনেক। ইন্টারমিডিয়েট আর্টস-এ ছাত্রছাত্রী মিলিয়ে ছিল প্রায় চল্লিশের ওপর। সেটা বোঝা যেত বাংলা ক্লাসে। বাংলা পড়াটা তখন ছিল আবশ্যিক, এখনকার মতো ইচ্ছাধীন নয় যার ফলে বাঙালী ছাত্রছাত্রী বাংলা ছেড়ে পড়তে চাইছে শুধু হিন্দী।

বাঙালী ছাত্রদের সঙ্গে হৃদ্যতাটা যেন আপনা থেকেই গড়ে উঠেছিল সেটা হয়ত ভাষাগত ঐক্যের দরুণ কিংবা বাঙালী কালচারটা টেনে আনত একজন আর একজনকে কাছে। তাই যখন কোনো ক্লাস থাকত না, দলবেঁধে মাঠের একটা পাশে গোল করে বসে জমাটে আড্ডা চলত। সবাই সবাইকে তুমি বলে ছিল সম্বোধন, 'আপনি' বলাটাতে ছিল একটা ছাড়া ছাড়া ভাব। তাই আপনি-টা বাদ দিয়েই চলতাম সবাই। কে কোন সম্পন্ন ঘরের এবং ভবিষ্যতে কে কী হবে, এই প্রবৃত্তি নিয়ে কেউ মিশত না। তবে ভিন্নতর ভাবটা এসে গিয়েছিল পরে যখন কেউ কেউ চাকুরিসূত্রে বড় বড় সম্মানিত পোস্টে গিয়ে বসেছিল। কলেজের ক্লাসে এবং মাঠের সেই একাত্মবৎ ভাবটা যেন হারিয়ে গিয়েছিল। সেই চিরাচরিত শ্রেণীগত বৈষম্যটা তখন সতর্ক করে দিত নিজেকে একটু তফাত রাখতে।

কিন্তু কলেজে দেখেছি অবাঙালী ছাত্রদের একসঙ্গে বসে আড্ডা দেওয়ার প্রবণতাটা ছিল কম। সবাই খণ্ড খণ্ড ভাবে ঘুরে বেড়াত এদিক ওদিক। কোনোরকম জমাটে আড্ডা দেওয়ার মানসিকতার অভাব ছিল প্রচণ্ডরকম এদের মধ্যে। তাই আমাদের এক সঙ্গে বসে আড্ডা দিতে দেখলে টিটকারি দিতে কসুরও করত না––বাঙালীয়া কা জমায়েত বলে। এই 'বাঙালীয়া' কথাটার মধ্যে যে একটা কটাক্ষ বর্ষিত হোতো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কোথায় যেন একটা রুচির অভাব পরিলক্ষিত হোতো। মনে হোতো এই কথাটা বলে তারা যেন মনের আক্রোশ ঝেড়ে ফেলতে চায়। কিন্তু কেন যে এটা করত, সেটা বোঝা ছিল মুস্কিল।

আড্ডা জিনিসটা বিহারী জীবনধারায় একটু বেখাপ্পা বলেই মনে হোতো এদের। আড্ডাটা যে বাঙালীর প্রাণবিন্দু এটা ওদের ধারণার বাইরে ছিল। তাই আমাদের একসঙ্গে দেখলে বিরক্তিতে ভরে উঠত এদের মন। এটা যে তাদের হীনম্মন্যতার লক্ষণ, সেটা স্পষ্ট ধরা পড়ত যখন পরমুহূর্তেই কাউকে লক্ষ্য করে একটা অশ্রাব্য গালাগাল বেরিয়ে আসত। এসব কারণেই কিন্তু একটা আলাদা প্রাচীর গড়ে উঠেছিল বাঙালী-বিহারী ছাত্রদের মধ্যে। তবে এদের মধ্যে সবাই যে এধরনের প্রবৃত্তি নিয়ে ছিল তা নয়, দুই একজনের মধ্যে আবার সাংঘাতিক ব্যতিক্রমও দেখা গেছে। বাঙালী জীবনধারায় তাদের মেশবার ছিল প্রচণ্ড ঝোঁক। অনেকের আবার বাংলা শেখার ছিল অদম্য স্পৃহা।

আমার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে বন্ধুত্ব হয়েছিল একজন আদিবাসী ছাত্রর। সিঙ্গভূম জেলার ছেলে সে। পাশ করে ছিল রাঁচি জেলা স্কুল থেকে। খুব সুন্দর বাংলা বলত, সিঙ্গভূমের মানুষ বলেই বাংলাটা শিখে-ছিল ভালো। আমার প্রতি ওর আকর্ষণটা ছিল খুব বেশি রকম। পাঠ্য বিষয়গুলো একই হওয়ায় একই ক্লাসে বসতাম আমরা পাশাপাশি। আদিবাসী বলে হয়ত নিজেকে যতদূর সম্ভব অন্যদের কাছ থেকে এড়িয়ে থাকত। যা কিছু কথাবার্তা সব আমার সঙ্গেই বাংলাতে প্রাণখুলে করত। এর নাম ছিল সামুচরণ টুবিড।

আর একজন বিহারী বন্ধু হয়েছিল আমার কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়তে পড়তেই। তার নাম ছিল মহেশ নারায়ণ। থিওসফিকাল সোসাই-টির যে-হোস্টেলটি ছিল বি, এম, দাস রোডে, সেখানেই সে থাকত। কলেজের কোনো হোস্টেলে সে জায়গা পায়নি। আমরা এই তিনজন ছিলাম হরিহরতুল্য এক প্রাণের মতো বন্ধু। বি, এ, ফাইনাল অবধি একই সঙ্গে ছিলাম, কোনো চিড় ধরেনি বন্ধুত্বে।

এরপর সামুচরণ টুবিড হয়ে গেল মস্ত বড় রাজনৈতিক মানুষ। নিজের এলাকার দলনেতা। কংগ্রেসী টিকিটে অনেকবার জিতেছে নির্বাচনী লড়াইয়ে। একবার সে পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি হয়েছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে যতবার ভোটে লড়েছে জিতে এসেছে এবং বরাবরই উচ্চে উঠেছে। একবার বনমন্ত্রীও হয়েছিল। কিন্তু আমাকে ভোলেনি সে কখনো। মন্ত্রী হিসাবে ওর কাছে অনেকবারই যেতে হয়েছে অফিসের কাজে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে। কিন্তু কখনো পুরনো মৈত্রীর সম্বন্ধটা সে ভুলে যায়নি। সরকারি কাজের আলোচনা শেষে নিবিড়ভাবে গল্প করেছি।

বন্ধু মহেশ নারায়ণ ছিল আবার অন্য ধরনের মানুষ। কেমন যেন পরোপকারী ভাব ছিল শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। যে কোনো লোক তার কাছে গেলে অর্থ দিয়েই হোক বা কায়িক পরিশ্রম করেই হোক সাহায্য করতে এগিয়ে আসত আন্তরিকভাবেই। কোনোরকম লোকদেখানি ভাব ছিল না ওর ভেতর। এর সঙ্গেও আমার হৃদ্যতা ছিল ভীষণ। একসঙ্গে ওর হোস্টেলের রুমে বসে অনেক পাঠ আমরা আলোচনা করেছি যুক্তভাবে, নোট নিয়েছি একসঙ্গে। যুক্তিতর্কে কোনো অনৈক্য হোলে দৌড়ে গেছি প্রফেসারের কাছে যিনি মীমাংসা করে দিতেন আমাদের বিষয়ের মতদ্বৈধকে।

গ্র্যাজুয়েট হবার পর আমি বেরিয়ে পড়লাম চাকুরির অন্বেষণে। মহেশ নারায়ণ কিন্তু এম-এ-টা পাশ করে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরিতে ঢুকতে পেরেছিল। তারপর বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ফিরে শেষে এস-ডি-ও হয়ে এসেছিল দানাপুরে।

মাঝের কটা বছর ওর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত হয়নি কিন্তু। দানাপুরে আসার পরেই জানতে পেল আমি পাটনা সেক্রেটেরিয়েটে রয়েছি। দৌড়ে এসেছিল বাড়ীতে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। সেই থেকে প্রায়ই দেখা হোতো সেক্রেটেরিয়েটে। ওর বড় ছেলেটি জন্ম থেকেই শরীর সম্বন্ধীয় কোনো একটি অরগ্যানিক গণ্ডগোলে ভুগছিল যে কারণে ওর সব গ্লাণ্ডস ঠিকমত কাজ করত না। তাই শরীরের আকৃতিটা ছিল খর্ব-প্রকৃতির। এই ছেলেকে নিয়ে বিদেশেও যেতে হয়েছে তাকে চিকিৎসার জন্য। ফিরে এসে ওখান থেকে অনেক ওষুধপত্র আনাতে হোতো যার ফলে সরকারী সাহায্যদানের অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় ছিল না। যতখানি সম্ভব আমি তাকে সাহায্য করেছি এই ব্যাপারে। তাই কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ থাকত সব সময়।

এই বন্ধুটি হঠাৎ-ই কোথাও টুরে যেতে গিয়ে হার্টএ্যাটাকে মারা যায়। কদিন আগে তার স্ত্রী এসেছিল আমাদের বাড়ীতে সেই রুগ্ন ছেলেটিকে নিয়ে। স্ত্রীর চেহারায় অনেক পরিবর্তন হওয়ায় প্রথমটা তাকে চিনতেই পারিনি, পরে পরিচয় দেওয়াতে লজ্জিত হয়েছিলাম খুব।

সেই রুগ্ন ছেলেটি কিন্তু সম্পূর্ণ ভালো হয়ে গেছে, তবে খর্বাকৃতিটা যায়নি। এখন সে ডাক্তারি পড়ছে মনের জোরে। ইচ্ছা এমন কত মানুষ রয়েছে যারা জন্মগত কতকগুলো শারীরিক দোষ-ত্রুটি নিয়ে জন্মায়, আর জীবনটাই করে ফেলে দুর্বিসহ—তাদের জন্য ডাক্তার হয়ে কিছু করার বাসনা।

আদর্শ যে মহান সন্দেহ নেই। বাপের মতোই দরদী মন। তাই

বোধহয় খুঁজে বের করেছে তার বাবার কলেজ জীবনের বন্ধুটিকে এই খবরটা জানাবার জন্য।

আমাদের চৌহাট্টার বাড়ীতে একান্নবর্তী পরিবারের আনন্দময় পরিবেশটা ছিল ভারী মধুর। কাকীমা, পিসিমা, বড়দিদি, ভাগনে-ভাগনি, কাকা, দাদা ও ছোট বোনেরা সবাই মিলে বেশ হৈ চৈ-এর মধ্যে থাকা হোতো।

আমার মা'র পক্ষে এতগুলো লোকের রান্নাবান্না সারাটা ছিল বেশ কষ্টকর। বিশেষ করে ভারী ভারী হাঁড়ি-কড়া উনুনের ওপর চাপানো ও নামানোটা ছিল গায়ের জোরের ব্যাপার। শরীরটাকে সামনে ঝুঁকিয়ে নিয়ে করতে হোতো সেসব। সেটাতেই কষ্ট হোতো বেশি। এসব কারণে একজন বেহারী পাচক-ব্রাহ্মণ রাখা হয়েছিল মাকে সাহায্য করার জন্য। মা তবুও নিজেই রান্নাটা সারতেন, কারণ অন্য লোকের হাতের রান্না কারুর মুখে রুচতো না, মা নিজেও খেতে পারতেন না।

কাজেই বাবাজীটি রান্নার কাজে যতটা না ব্যস্ত থাকত, তার চেয়ে আমাদের খেলার সঙ্গী হিসাবে থাকতে আনন্দ পেত বেশি। তার ঘাড়ে-পিঠে চড়ে সারা বাড়ী ঘুরে বেড়িয়েছি অনেক সময় আমরা ছোটরা।

আমাদের এই পাচকঠাকুরটি প্রথম মহাযুদ্ধে সিপাহীর চাকরি নিয়ে সৈন্যদের সঙ্গে মিডিল-ঈষ্টে, ইজিপ্ট-মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি জায়গায় ঘুরে এসেছিল। গলার ওপর চোয়ালের দিকে একটা গুলিও লেগেছিল যুদ্ধ করতে গিয়ে। তার কাটা-দাগ স্পষ্ট দেখা যেত চোয়ালে। কথাগুলিও সে তাই জড়িয়ে জড়িয়ে বলত। ইংরেজী বলতে শিখেছিল ইংরেজ সিপাহীদের সঙ্গে থাকতে থাকতে। আমাদের সঙ্গে প্রায়ই ইংরেজীতে কথা বলে সবাইকে অবাক করে দিত।

আমাদের এক জেঠতুতো ভাই কলকাতা থেকে পাটনায় এসেছিলেন সায়েন্স কলেজে এম, এস-সি পড়তে অঙ্কেতে। পরে ইনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলারও হয়েছিলেন। দোতলায় এঁর জন্য একটা আলাদা ঘর দেওয়া হয়েছিল, ওখানেই ওঁর পড়াশোনা, শোয়া সবই হোতো। ইনি যখন পড়াশোনা করতেন, আমাদের তখন মৌনীবাবা হয়ে থাকতে হোতো। একটু চেঁচামেচি করলেই তাঁর অঙ্ক-কষার ব্যাঘাত হোতো প্রচণ্ডরকম। তাই মা-বাবা সবাই তটস্থ থাকতেন আমাদের ওপর। একটু চেঁচামেচি হলেই ধমক খেতাম জোর। কাজেই

উনি যতক্ষণ বাড়ীতে থাকতেন, আমাদের গলার আওয়াজ ফিসফিসানির চেয়ে ওপরে উঠতে পারত না। কখনো কখনো হাতের ইশারাতেই খেলা সারতে হয়েছে।

এই কারণে অনেক সময় আমরা পুতুলও খেলেছি। সবাই মিলে। পুতুলের বিয়ে দেওয়াটা ছিল একটা বিরাট উৎসবের মতো আমাদের কাছে। বড়রাও দেখতাম বেশ আনন্দ পেতেন আমাদের এই পুতুলখেলা দেখতে।

একবার কী একটা কারণে, সেজদাদা আমাদের ওপর চটে গিয়ে পুতুলের বিয়ের আগের দিন রাত্রে কনেকে দিলেন গায়েব করে। বেশ সাজিয়ে-গুছিয়ে তাকে শুইয়ে রাখা হয়েছিল ছোট্ট বিছানাতে রাত্রিতে। সকালে উঠে দেখা গেল কনে নিরুদ্দেশ। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কনেকে পাওয়া গেল না কোথাও। সেজদাদাকে সরাসরি চার্জ করতে পারছে না কেউ। অথচ আমরা সবাই জানি, সেজদাদা ছাড়া আর কেউ একাজ করতে পারে না।

সারাদিন তল্লাসী করেও যখন কনের কোনো হদিস পাওয়া গেল না, তখন বাড়ীর বড়কর্তার দরবারে নালিশ করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। সন্ধ্যার লগ্নেই যে বিয়ে সারতে হবে। নিমন্ত্রিতেরা তো সবাই এসে পড়বে ঠিক সময়মতো, তখন কনের মা'র তো মুখ দেখাবার মতো অবস্থা থাকবে না।

যখন কিছুতেই কনেকে খুঁজে পাওয়া গেল না, বিকেল পাঁচটা নাগাদ নালিশ দায়ের করা হোলো বড়কর্তার কাছে অর্থাৎ আমার পিতৃদেবের আদালতে। সেজদাদা যে মাঝেমধ্যেই বাচ্চাদের ওপর এধরনের খুনসুড়ি করত, এটা বাবাও জানতেন।

আমরা ছোটরা সব সারাদিন হয়রান হয়ে সারবেঁধে কর্তার দরবারে হাজির হলাম। বিয়ের কনে গায়েব—এটা বড় রকমের অপরাধ। সামান্য অপরাধ নয়, একেবারে ফৌজদারি মামলা। আজকেই যার বিয়ে তাকে না পাওয়া গেলে কী অবস্থাই না হবে। কনের মা অর্থাৎ আমার ছোট ভাগনিটিতো কেঁদে ফেলল তার দাদুর কাছে।

দাদু তো প্রথমটা একটু মুচকি হেসে নিলেন এধরনের অভিযোগ শুনে। বাদী স্বয়ং তাঁর নাতনি, সুতরাং আসামীকে কঠিন শাস্তি দেওয়াই প্রয়োজন।

ডাক পড়ল সেজদাদার। সে আশেপাশেই ঘোরাঘুরি করছিল। হাজির হোলো এক ডাকেই, সেপাহী পেয়াদার প্রয়োজন পড়েনি। একটা গম্ভীর ডাকেই অভিযুক্ত হাজির।

হাতে করে বিয়ের পুতুলটি নিয়ে এসে উপস্থিত। আলমারির মাথায় সারাদিন থাকায়, ঝুলকালি মেখে কনের যা অবস্থা হয়েছে, দেখলেও কান্না পায়। আবার নতুন সাজে সাজাতে হবে তাকে। তবুও যাই হোক, কনেকে তো পাওয়া গেল লগ্ন বয়ে যাওয়ার আগে।

এরকম ঘটনা কেন হোলো, জিজ্ঞাসা করাতে প্রতিবাদীর উত্তর হোলো, তাকে নাকি বিয়েতে নেমন্তন্ন করা হয়নি। তাই এই অপমানের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে এই কাণ্ড।

সমস্বরে বাচ্চারা তখন চীৎকার করতে শুরু করেছে, কোর্টের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেই—না, না, বলা হয়েছিল বিয়েতে আসতে, তবে কোনো কিছু খেতে দেওয়া হবে না, কারণ ভোজ্যসামগ্রী সব গোনাগুণতি। শুধু বাচ্চাদের জন্য কয়েক জোড়া ছোট ছোট জিলিপী ফরমায়েশ দিয়ে আনানো হয়েছে। বড়রা কেউ কিছু পাবে না, বিয়ে দেখতে পারবে শুধু।

কনে ফেরত পেয়ে সবাই খুশী। কাজেই কী শাস্তি অভিযুক্তকে দেওয়া হোলো তার দিকে আর কোনো খেয়াল নেই তাদের। এক ছুটে সবাই কোর্ট ছেড়ে চলে গিয়েছে বিয়ের ব্যবস্থা করতে।

এসবই ছিল আমাদের শৈশবকালের জীবনযাত্রার বিচিত্র হাসিকান্না মেশানো কাণ্ডকারখানা।

আনন্দভরা দিনগুলোর মাঝে হঠাৎ একটা দুঃখের ঘটনা ঘটল আমাদের বাড়ীতে—ন'দার মৃত্যুটা। আমার চেয়ে দুবছরের বড় ছিল এই ন'দা।

অতর্কিতভাবে একদিন বিকেলে স্কুল থেকে খেলাধুলো সেরে ফিরে এসেই, বলা নেই কওয়া নেই, গলা দিয়ে আচকা রক্তবমন। বাবার মুখে কোনো কথা নেই। চিকিৎসক মানুষ, বুঝলেন রক্তবমির অন্তরালে কোন রোগ প্রবেশ করেছে শরীরে। বড় বড় কয়েকজন ডাক্তারও এলেন বাড়ীতে। তাঁদের মুখও রুগী দেখার পর গম্ভীর হয়ে গেল। হঠাৎ এই ব্যামো এলো কোত্থেকে, ভেবে কোনো কূলকিনারা পাওয়া গেল না। বাবা নিজের ছেলের চিকিৎসায় হাত দিলেন না। রায় বাহাদুর ডাক্তার সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ ও ডাক্তার সনৎ বরাট সেই সময় পাটনার নামকরা ডাক্তার এবং বাবার বিশেষ বন্ধু। তাঁদের ডেকে পাঠালেন বাবা। তাঁরাই যুক্তভাবে পরামর্শ করে আরম্ভ করলেন চিকিৎসা। কিন্তু কোনো কিছুই হোলো না। রক্তবমি আর থামানো গেল না। রোজই হয়ে যায় গামলা গামলা।

আমি ন'দার ঘরের জানালার শিক ধরে বাইরে থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম ন'দার এই কষ্টটা। আমাদের ঘরের ভেতর যাওয়াটা ছিল বারণ। মা আর কাকীমারই প্রবেশাধিকার ছিল সেই ঘরে। মা শুতেন একাই সেই ঘরে, ন'দার পাশে।

ধীরে ধীরে শেষ হয়ে এলো ন'দার জীবন। খাটের সঙ্গে যেন মিশে গেছে শরীরটা, কথাও বলতে পারে না আর। বলতে চায় কিছু, কিন্তু অস্পষ্ট হয়ে বেরিয়ে আসে শুধু একটা ক্ষীণ আওয়াজ। মুখটা হয়ে গিয়েছিল একেবারে ফ্যাকাশে।

একদিন শেষরাত্রে মায়ের অঝোরে ডাকছাড়া কান্না শুনে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি তখন দোতলায় শুই, বাবার বিছানার এক পাশে। জেগে দেখি, বাবা পাশে নেই। সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম একতলার ঘরে, যেখানে ন'দা রয়েছে। দেখি ঘরভর্তি লোক, কাকা, পিসিমা, দাদারা সবাই ঘিরে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলছেন। মা ন'দাকে আঁকড়ে বুক ফাটিয়ে চীৎকার করে কেঁদে চলেছেন। কাকীমাও এক পাশে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলে চলেছেন। বাবা নেই সেখানে, উনি বারান্দায় বসে আছেন চেয়ারে উবু হয়ে, হাত দুটো চেপে, মাথাটা নীচু করে। চোখ দিয়ে টপটপ করে জল ঝরছে।

আমি যেমন নীরবে নীচে নেমে এসেছিলাম তেমনিভাবে ওপরে উঠে এলাম। চোখে কিন্তু তখনও এক ফোঁটা আমার জল আসেনি, কেন, জানি না। ভাবতেও পারছিলাম না যে ন'দা আর নেই। এরকম যে একটা কিছু হবে স্বপ্নেও ভাবিনি। একেবারে ভয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। হাপুস নয়নে কাঁদবার ক্ষমতাটাও যেন হারিয়ে ফেলেছিলাম।

সেই শোকাবিষ্ট বাড়ীতে আবার আনন্দের পরিবেশ ঘটতে লেগেছিল প্রায় ছয় সাত বছর—বড়দাদার বিয়ের সময় পর্যন্ত। বিয়ের একমাস আগে থেকে দূর দূর থেকে এসেছিলেন পিসিমারা, পরে এলেন জেঠিমারা, জেঠতুতো ভাইয়েরা, যাদের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল তাদের বউয়েরা, জামাইরা, দিদিরা, সঙ্গে তাদের ছেলেমেয়েরা। শোকদুঃখ ভুলে গিয়ে তখন আনন্দের একটা নতুন জোয়ার নেমে এলো সবার প্রাণে।

তখনকার দিনে একটা রীতি ছিল নাইয়র-নাইয়রী যাঁরা আসতেন বিয়ে উপলক্ষ্যে, তাঁদের সবাইকে আসা-যাওয়ার খরচ দেওয়া। বাবাকে তাই দেখতাম রেজিস্টার্ড ইন্সিওরেন্স খামে টাকা পাঠাতে বিভিন্ন জায়গায়। সেই টাকা পেয়ে তবে তাঁরা আসার তারিখ ঠিক করতেন।

এখনকার মতো তো আগে থেকে টিকিট করে, সীট রিজার্ভ করে ট্রেনে চাপার বালাই ছিল না। একটা ভালো দিন দেখে, যাত্রা শুভ কিনা বিচার করে, টিকিট কেটে ট্রেনে উঠে পড়লেই হোলো।

বিয়ে উপলক্ষে কলকাতা থেকে আনা হয়েছিল বস্তা ভরতি ঝুনো নারকেল, ঢাকা থেকে স্টীমার পথে এসেছিল দু'টিন গাওয়া ঘি। পাটনার মারুফগঞ্জ থেকে কেনা হয়েছিল কয়েক বস্তা চাল, খাঁটি আতপচালও এসেছিল অনেকখানি বিধবাদের জন্য। কয়েকটি টিন ভর্তি সরষের তেল। নানারকমের ডাল, মসলাপাতি। চিনিই তো এসেছিল আড়াই-মণ ওজনের একটা বস্তা। রোজকার জলখাবারের জন্য লুচির ময়দা এক মণ। এইসব জিনিস দিয়ে ঠাসা হয়েছিল একটা ঘর আলাদা করে।

যে-বস্তাভরা ঝুনো নারকেল এসেছিল কলকাতা থেকে, তা দিয়ে তৈরী হয়েছিল নানারকম নারকেলের মিষ্টি---সবই প্রায় শুকনো মিষ্টি। ষোলটি মাটির হাঁড়িতে ভরে সেই মিষ্টি নানারঙের কাগজে মুড়ে সাজিয়ে গুছিয়ে বিয়ের অধিবাসে পাঠানো হয়েছিল কনের বাড়ীতে। সেসব একটা দেখবার মতো তত্ত্ব ছিল।

এসব করেছিলেন পিসিমারা এক জায়গায় কয়েকজনে বসে। বিয়ের কয়েকদিন আগে থেকে আরম্ভ হয়েছিল মিষ্টি তয়েরের কারবার। সেসব তৈরী মিষ্টির এক একটার নামই ছিল আলাদা---রসকরা, চন্দ্র-পুলি, গুড়ের নাড়ু, চিনির নাড়ু, চিকন-চিড়া, মোটা-চিড়া, ইচামুড়া, ভাজা-পুলি, লিচু, রসপুলি, গঙ্গাজলি প্রভৃতি। আরো অনেকগুলোর নাম মনে নেই আমার। প্রাচীনাদের বেশির ভাগই জীবিত নেই, যাঁদের ধরে নামগুলো সব আদায় করা যাবে। এসব ছিল পূব-বাংলার মিষ্টির বৈশিষ্ট্য। সবই হোতো নারকেল-কোরা দিয়ে তৈরী। বিভিন্নভাবে তৈরী সেসব মিষ্টির নাম ছিল আলাদা আলাদা। রসকরা, চন্দ্রপুলি, রসপুলি, ভাজাপুলি এখনকার অনেক গৃহিণী তাঁদের মা-দিদিমার কাছ থেকে শিখেছেন। তাঁরা এখনও সেসব মিষ্টি তৈরী করেন কোনো উৎসব উপলক্ষে অতিথিদের আপ্যায়িত করার জন্য---বিশেষ করে বিজয়ার মিষ্টি খাওয়াবার সময়।

কিন্তু চিকন-চিড়া এবং মোটা-চিড়া তৈরী করার পদ্ধতিটা ছিল এতো কঠিন ও ধৈর্যসাপেক্ষ যে এখনকার বউয়েরা সেসব তৈরী করার কথা ভাবতেই পারে না। চিকন-চিড়া বানাবার নিয়ম ছিল প্রথমে নারকেলের ভেতর থেকে সাদা শাঁসটা খুলে নিয়ে তার পেছনের ঈষৎ কালচে ছালটা

ছাড়িয়ে নিতে হবে বঁটি দিয়ে, তারপর সরু সরু করে কাটতে হবে শাঁসটিকে যাতে পাতলা চিড়ের মতো সাইজের হয়। প্রথম থেকেই সেটাকে ঠাণ্ডা জলে ফেলে ভালো করে কয়েকবার ধুয়ে নিতে হবে যাতে তাতে কোনো কালচে দাগ না থাকে। পরে কয়েকবার গরম জলে ফেলে নারকেলের তৈলাক্ত ভাবটা কাটিয়ে নিতে হবে। এসব হয়ে গেলে চিনির রসে পাক দিতে হবে ধীরে ধীরে হাল্কা আঁচে, আর অনবরত নেড়ে যেতে হবে একটা লোহার খুন্তি দিয়ে। নজর রাখতে হবে কোনোরকমেই যেন সেটা লাল না হয়ে যায়। ধবধবে সাদা থাকা চাই। তারপরে রসটা শুকিয়ে গেলে ঝরঝরে অবস্থায় নামানো চাই। নারকেলের মিহি টুকরোগুলোর কোনো-টাই যেন সেঁটে না যায় একটার সঙ্গে আর একটায়। এটার খেয়াল থাকা চাই সতর্ক দৃষ্টি রেখে। এটাই হোলো চিকন-চিড়া তৈরীর প্রণালী।

মোটা-চিড়া তৈরীর পদ্ধতিটাও একই রকমের। তবে এক্ষেত্রে নারকেল-শাঁসটা কাটার মধ্যে ছিল একটু তফাত। এটাকে সাধারণ যে চিড়া আমরা ব্যবহার করি সেই সাইজের মতো কাটতে হবে নারকেল-শাঁসের টুকরোগুলো একটু মোটা করে। পরে তার এক একটা টুকরো দু আঙ্গুলের মাঝখানে ধরে দুদিকের আগাটা শিলের ওপর ঘষতে হবে যাতে সরু অংশটা একটু চেপ্টা হয়ে যায়। এ কাজটায় ভীষণ ধীরতার দরকার, একটুও ধৈর্যচ্যুতি হোলে চলবে না। তা না হোলে শিলের ওপর ঘষতে গেলে টুকরোগুলো ভেঙ্গে যাবে।

পিসিমাদের দেখেছি অসম্ভব ধৈর্য ছিল বটে এসব কাজে। নিজেরা গোল করে বসে গল্প করতে করতেই এ জিনিস তৈরি করতেন। মুঠো মুঠো চিড়ে খাওয়ার মতো আমরাও যখন তখন দৌড়ে এসে হাত পাততাম তাঁদের সামনে।

আমার মা'র গঙ্গাজলি তৈরী করার হাতটা ছিল খুব পাকা। ছাঁচ থেকে কোনো একটিও ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে যেতো না। পটুহাতে চটপট করে ফেলতেন গঙ্গাজলি। এটা তৈরী করার প্রণালীটা ছিল চিকন-চিড়া বা মোটা-চিড়া করা থেকে একেবারে ভিন্ন। নারকেল-কোরাটাকে একটা সাদা পরিষ্কার ন্যাকড়ায় বেঁধে নিয়ে সেটাকে চেপে দুধটা বের করে নেওয়া হোতো, পরে সেই নারকেল-কোরা বারবার গরম জলে ধুইয়ে তেলা-ভাবটা কাটিয়ে নিতেন পুরোপুরি। এরপর সেই নারকেল সাদা চিনির সঙ্গে অল্প ধীর আঁচে পাক দিতেন আর অনবরত খন্তা দিয়ে নাড়তে থাকতেন যাতে সেটা লাল ভাব না হয়ে যায় এবং ধবধবে সাদা থাকে। একেবারে শুকিয়ে গেলে কড়াইটা নামিয়ে ফেলতেন। খেয়াল রাখতেন যেন সেটা

ঝরঝরে থাকে, ডেলা পাকিয়ে না যায়। একেবারে শুকনো কড়কড়ে হয়ে গেলে সেটাকে ঠাণ্ডা করে নিয়ে শিলের ওপর অল্প করে নিয়ে আস্তে আস্তে বেটে গুঁড়ো করে নিতেন একেবারে পাউডারের মতো। তারপর সেই গুঁড়ো ছোট একটা চন্দন বাটির সাইজের ছাঁচে ভরে বারুদ ঠাসার মতো বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে চেপে চেপে ঠেসে যেতেন। ঠাসাটা ভালো হয়ে গেলে খুব আস্তে আস্তে শিলের একটা পাশে ঠুকে ঠুকে জমাট বাঁধা জিনিসটা বেরিয়ে আসত ঠিক একটা ছোট গোল কেকের মতো। এই গোল পদার্থটি মুখের ভেতর রাখলেই জলের মতো হয়ে যেতো এবং স্বাদটা থাকত অপূর্ব। গঙ্গাজলি নামটা কেন হয়েছিল সেটা মা বলতে পারতেন না। খুব সম্ভব তৈরী বস্তুটি মুখে পুরলেই গঙ্গাজলের মতো মধুর হয়ে গলার ভেতর প্রবেশ করত বলেই বোধহয় এই নাম।

এসবই ছিল পূব-বাংলার গৃহিণীদের গৃহজাত মিষ্টিশিল্পের নিদর্শন। বাগান ভরা ছিল নারকেল গাছ তাই অসুবিধা ছিল না এসব তৈরীর মূল উপাদান সংগ্রহের ব্যাপারে। শুধু একটু পরিশ্রম। লক্ষ্মীপুজোর সময়ও ছিল এসব করার চমৎকার ব্যবস্থা।

বড়দাদার বিয়ের অধিবাসের তত্ত্বে নারকেলের ষোলো রকমের মিষ্টি দেখে কনেবাড়ীর সবাই তো অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। সাধারণ রস-গোল্লা, সন্দেশ ও ছানার মিষ্টি দেখতেই ছিলেন সবাই অভ্যস্ত। এ যে একেবারে মল দেশের গাঁয়ের আপন জিনিস।

আমার বাবা ছিলেন আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক। প্রায় এক'শ বছরের কাছাকাছি পাটনাতেই কাটিয়েছেন জীবন। সেই আমলে অনেক রোগের চিকিৎসা ভালো করে হোতে পারত না এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা মতে। জোরালো ওষুধের অভাবে, যেমন টাইফয়েড, প্লুরেসিস, পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগ, তাদের চিকিৎসাসাধ্য ছিল না। অথচ আয়ুর্বেদীয় মতে এসবের ভালো চিকিৎসা হোতো। তাই এ্যালোপ্যাথ ডাক্তাররা এসব রুগী পাঠাতেন বাবার কাছে চিকিৎসার জন্য। রুগী সারাবার হাতযশও ছিল বাবার চমৎকার। বহু এ্যাংলোইণ্ডিয়ান পরিবারের রুগীকেও দেখেছি বাবার কাছে আসতে। স্থানীয় বিহারীদের বাড়ীতেও ডাক পড়ত সব সময় রুগী দেখার জন্য। রাতবিরেতে দৌড়েছেন মুমূর্ষু রুগীকে দেখতে। কাউকে নিরাশ করতে দেখিনি বেশি রাত হয়ে গেছে বলে।

ডিসপেনসারিতে রুগী এলে কোনো ফী নিতেন না। বাড়ীতে গিয়ে

দেখলে দু টাকা ধার্য ছিল, শেষ জীবন অবধি তাই ছিল। পাড়ার ভেতরে রুগী দেখতে গেলে হেঁটেই চলে যেতেন। দূরেরগুলোতে যেতেন ফিটনে চেপে—–পাটনাসিটি, গুলজারবাগ এবং অন্যদিকে খগৌল, দানাপুর অবধি জায়গাতে বরাবরই ফিটনে করে গেছেন রুগী দেখতে। সঙ্গে থাকত একটা বড় কাঠের বাক্স। হোমিওপ্যাথিক বাক্সের মতো গোল গোল বড় ছেঁদাওয়ালা একটা কাঠের বাক্সে ছোট ছোট সাইজের শিশিতে ভরা থাকত বিভিন্ন ধরনের ওষুধ যাতে রুগী দেখে সেখানেই ওষুধের ব্যবস্থা করে আসতে সুবিধে হয়। আরো দূরের রুগী দেখতে যেতে হয়েছে ট্রেনে চেপে কিংবা স্টীমারে। সুদূর গ্রামের ভেতরেও ঢুকেছেন হাতীতে চড়ে। রেলস্টেশনে ফিটনগাড়ীর মতো হাতী দাঁড়িয়ে থাকত তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য, যেখানে এই বাহন ছাড়া গ্রামের ভেতর ঢোকার উপায় ছিল না। অনেক বড় বড় জমিদার ও রাজাদের বাড়ীতে যেতে হয়েছে এইভাবে। কয়েক দিন থেকেও আসতে হয়েছে সেখানে কঠিন রুগীকে কিছুটা সুস্থ করে আসার জন্য।

বাবাকে দেখতাম সারাদিনই রুগী নিয়ে ব্যস্ত থাকতে। অনেক সময় এতো বেশি রুগী আসত ডিসপেনসারিতে যে সবাইকে বসতে দেওয়ার জায়গা হোতো না। অনেকে বাইরের রোয়াকে দাঁড়িয়ে থাকত। এতো রুগী দেখার পরেও কিন্তু কোনোদিন বাবাকে ক্লান্ত হোতে দেখিনি। অসাধারণ ছিল কার্যক্ষমতা, ধৈর্যচ্যুতও হোতে দেখিনি কখনো। নিজের হাতেই তৈরী করতেন সব ওষুধ। নানারকম আয়ুর্বেদীয় তেল তৈরী করেছেন কত। বড় বড় লোহার কড়াই ছিল তারজন্য, সবই জ্বাল দেওয়া হোতো কাঠের উনুনে যাতে তাপ নিয়ন্ত্রণ করতে সুবিধে হয়। এমন কি মকরধ্বজও তৈরী করেছেন ইনি, যেটা এ্যালোপ্যাথ ওষুধের কুরামিনের মত কাজ করত।

এসব তৈরী করতে বাবাকে সাহায্য করতেন আর একজন, তিনি হলেন আমাদের জেঠামশায়ের বড় ছেলে। আমরা তাঁকে দাদা বলেই সম্বোধন করতাম। আয়ুর্বেদীয় তেল, চ্যবণপ্রাশ এবং মকরধ্বজ তৈরী করার হাত ছিল তাঁর চমৎকার। নিজেও কবিরাজী পড়েছিলেন কলকাতাতেই, তেল ইত্যাদি তৈরী করার কুশলতাটা আয়ত্ত করেছিলেন সাংঘাতিকভাবে যেটার প্রশংসা বাবা সবসময়েই করতেন এবং বলতেনও, আশু না থাকলে এসব তৈরী করার সাহসই আমি করতাম না।

আমার এই দাদার নাম ছিল আশুতোষ। কবিরাজী ওষুধ তৈরী করার বিদ্যায় প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত হলে কী হবে, চিকিৎসার ব্যাপারে তেমন

আগ্রহশীল ছিলেন না। কবিরাজী পাশ করে প্রথমে আসানসোলে ডিসপেনসারি খুলেছিলেন কিন্তু তেমন ভাবে পসার জমাতে পারেননি। বাবা তাঁকে নিয়ে বসালেন মোকামাতে যাতে বিহারের মাটিতে বসে প্র্যাকটিস্ করতে সুবিধা হয় কারণ এখানকার মানুষ তখন পর্যন্ত অংরেজী দাওয়ার প্রতি বিমুখতাই প্রকাশ করত।

কিন্তু দাদার চিকিৎসার ব্যাপারে একটু ধীরতার অভাব ছিল, তাছাড়া মোকামাতে একা একা থাকতেও ভালো লাগত না। কারণ বৌদি তখন পাটনাতেই থাকতেন, সঙ্গে রাখার উপায় ছিল না খরচের দিকে চিন্তা করে। এই কারণে প্রায়ই চলে আসতেন পাটনায় যার জন্য বাবার কাছে বকুনিও কম খেতেন না। শেষ পর্যন্ত ব্যবসা উঠিয়েই দিলেন। বাড়ীতেই বসে থাকতেন। ঢাকায় দেশের বাড়ীতে কয়েক বছর কাটিয়ে ছিলেন। পরে পাকাপাকিভাবে চলে এলেন কলকাতায়।

আমার মেজদাদারও ঠিক এরকম না হোলেও, কাজকর্ম করার অন্তরালের মনোবৃত্তিটা ছিল অনুরূপ। কোনো ধৈর্য বলে জিনিস ছিল না, একটু অস্থিরমতি। কোনো কিছুর ফললাভ করতে হোলে তাতে যে-সময়টুকু দেওয়ার প্রয়োজন এবং ধৈর্য ধারণ না করলে কোনো পরিশ্রমই ফলদায়ক হোতে পারে না, সেই ব্যাপারে সামগ্রিক বোধের ছিল বড় অভাব। কাজেই তিনিও আমার জেঠাতো দাদার মতো আয়ুর্বেদ-জ্ঞান লাভ করেও জীবনে বড় হোতে পারেননি। বাবার কাছাকাছি থেকেও জীবনলক্ষ্যে পৌঁছবার যে স্থির-ধীর প্রত্যয়ের একটা অপূর্ব দৃষ্টান্ত ছিল সামনে, সেটাকেও পর্যন্ত কোনোদিন অনুসরণ করেননি। যে-কোনো পেশায় উন্নতি করতে হোলে সেই কাজটাকে ভালোবাসতে হবে, শিখে নিতে হবে তার রীতিনীতি, তবেই কর্মপন্থায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এনে, সেই কাজে সফলকাম হওয়া যায়। রাতারাতি কেউ বড় হোতে পারে না, ধীর পদক্ষেপে এগোতে হবে কর্মসাধনের পথ দিয়ে তবে স্থির লক্ষ্যে পৌঁছনো সম্ভব। ধনলক্ষ্মীর শুভাগমনও হয় তখনি।

মেজদাদা পাটনার আয়ুর্বেদিক কলেজ থেকে পাশ করেছিলেন, শেষ-গ্র্যাজুয়েট পরীক্ষা দিয়ে প্রথম বিভাগে। খুব ভালো ছাত্র ছিলেন আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞানের। বাবা পাটনার মহেন্দ্রু অঞ্চলে ডিসপেনসারি দিয়ে বসিয়ে দিলেন সেখানে প্র্যাকটিস করার জন্য। উদ্দেশ্য ছিল ধীরে ধীরে বাবার যেসব রুগী ওই এলাকাতে রয়েছে, তাদের মেজদাদার কাছেই পাঠাবেন। এমনি করেই রুগীর সংখ্যা বাড়বে এবং অভিজ্ঞতাও সঞ্চিত হবে। শুধু বই পাঠ করে তো রুগী সারানো যায় না, রোগ পরীক্ষা করে তবে তাকে

ওষুধ দিয়ে রোগমুক্ত করা যায়। এ কাজের জন্য যে ধৈর্য ও সাধনার দরকার সেটার অভাব ছিল পুরোমাত্রায়। কাজেই কর্ম ও ধনাগমের মধ্যে ফাঁক ছিল যথেষ্ট। দু বছর পরেই ধৈর্য হারিয়ে উঠিয়ে দিলেন ডিসপেনসারি। বসে রইলেন বাড়ীতে নুলো সেজে। একজন উদ্যমহীন নিরুৎসাহ যুবা পুরুষ, যদি লেখাপড়া শিখেও কোনোরকম খাটাখাটি না করে, চুপচাপ বসে থাকে বাড়ীতে, তখন সেই মানুষটি সবারই বিরাগ-ভাজন হয়ে পড়ে। সহানুভূতির পরিবর্তে ঝাঁজালো কথাই বর্ষিত হোতে থাকে যখন তখন।

মেজদাদার এই অবস্থাটা আমার খুব খারাপ লাগত---দুঃখ হোতো সবাই যখন নিন্দায় মুখরিত হয়ে উঠত। আমার নিজের কোনো সাধ্যি ছিল না যে তাঁকে সাহায্য করি কিছু অর্থ দিয়ে। আমি তখন তো কলেজের ছাত্র, নিজেই পরমুখাপেক্ষী। তবে বড়দাদাকে দেখতাম মাঝে মাঝে কিছু টাকা মেজদার হাতে গুঁজে দিতে পকেট খরচ বাবদ। এইভাবে বসে থাকতে দেখা গিয়েছিল মেজদাকে কয়েকটি বছর। তারপরে হঠাৎ-ই যেন অদৃষ্ট প্রসন্ন হোলো। ভাগ্যলিপি গেল বদলে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমাদের দেশে একটা অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছিল সাংঘাতিকভাবে। চাকুরির ক্ষেত্রটা প্রসারিত হয়ে পড়েছিল দিকে দিকে। সামান্য শিক্ষিত যুবকেরও যে কোনো জায়গায় চাকরি জুটে যেতো। বিভিন্ন ধরনের অফিস পাটনাতে খোলা হয়েছিল তখন---মিলিটারি এবং সেমি-মিলিটারি দুরকমেরই। আমেরিকান বা বৃটিশ বংশজাত ছিল সেসব অফিস। লোকের হাতে এসেছিল প্রচুর টাকা। কন্ট্রাকটারি করেই হোক, বা চাকুরি করেই হোক টাকার প্রবেশ ঘটেছিল সর্বত্র। মুদ্রাস্ফীতি তাই চরমে পৌঁছেছিল। সেই সময় ভারতীয় ব্যাংকগুলোর, বিশেষ করে বাঙালীর প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকগুলোর নানা জায়গায় শাখা খোলার প্রচণ্ড ধুম পড়ে গিয়েছিল। ছত্রাকের মতোই গজিয়েছিল পাটনাতে বহু ব্যাংক। বাড়ীতে টাকা না রেখে বিনিয়োগ করে দেশের শিল্পবাণিজ্য যাতে বৃদ্ধিলাভ করে সেটাই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য।

এই রকম যখন অবস্থা চলেছে, সেই সময় হঠাৎ একদিন শুনতে পেলাম আমাদের মেজদাদা দার্জিলিং ব্যাংকের পাটনা শাখার ম্যানেজার নিযুক্ত হয়েছেন। বাড়ীর সবাই অবাক মেজদাদার এই ভাগ্য পরিবর্তন দেখে। ইতিমধ্যে কয়েক সপ্তাহের জন্য কলকাতা থেকে একটা ট্রেনিংও নিয়ে এলেন। যে মেজদাদাকে দেখতাম ধুতি-পাঞ্জাবী পরে ঘুরে বেড়াতে, তাঁর দেহে আশ্রয় পেল কোট-প্যান্ট-শার্ট ও নেকটাই। শু পায়ে দিয়ে

গটগট করে ঘুরে বেড়াতেন সাহেব সেজে। কবিরাজ থেকে ব্যাংকের ম্যানেজার পদে রূপান্তর, একটা অলৌকিক কাণ্ড বৈকি !

এখানে উল্লেখ করে নিলে ভালো হয় যে আমাদের চৌহাট্টার বাড়ী ছাড়তে হয়েছিল বিশেষ কারণে। সেই সময় চৌহাট্টা পাড়ার উত্তরাঞ্চল বিহার সরকার দখল করে নিয়েছিল পাটনা মেডিকাল কলেজের হাস-পাতালের পরিসর বাড়াবার জন্য। সরকারী আদেশ, কাজে কাজেই সেই বাড়ী ছেড়ে আমাদের চলে আসতে হয়েছিল বি, এম, দাশ রোডের একটা বাড়ীতে। তবে এই বাড়ীতে আসার সময় আমাদের বৃহৎ পরি-বারের দুটো ভাগ হয়ে গেল। কোনো ঝগড়াঝাঁটির সূত্র নিয়ে নয় কিন্তু, এটা হয়েছিল শুধু স্থানসংকুলানের দরুণ। বহুলোকে সমাকীর্ণ ছিল যে বাড়ী, সেখানে এই ছোট্ট নতুন বাড়ীতে এতগুলো লোকের ঠাঁই পাওয়া ছিল কঠিন। আর সেই সময় সরকারী কোয়াটার পাওয়ার সুযোগও পেয়েছিলেন বড়দাদা। হাইকোর্টে কাজ করতেন, তার কাছাকাছি থাকলেই কাজেরও সুবিধা ছিল। তাই বড়দাদা সপরিবারে চলে গেলেন আদালতগঞ্জের হাইকোর্ট কোয়াটারে। আমাদের ছোট কাকাও। কাকী-মা তখন বেঁচে নেই, তাঁর ছেলেমেয়েরা সব তাদের মামাবাড়ীতে।

আমরা কজন মা-বাবা ছোট দু'বোন সমেত চলে এলাম বি, এম, দাশ রোডের বাড়ীতে। মেজদাদার বিয়েটাও এই বাড়ী থেকে সম্পন্ন হয়েছিল।

আমার মেজদাদার ব্যাংকের চাকরিটা, দুঃখের বিষয়, যেন কয়েক বছরের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। আগেই বলেছি যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নতুন নতুন ব্যাংক শাখাপ্রশাখা নিয়ে ধা ধা করে এক এক জায়গায় খোলার যেমন ধুম পড়েছিল, সেসবের আবার ধুলোখেলার মতো পটাপট কাত হয়ে পড়তেও সময় বেশি লাগেনি। কয়েক বছরের মধ্যেই একটা দুশ্চিন্তার ঝড় শুরু হোলো ব্যাংকগুলোতে। ডিপোজিটাররা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ছোটাছুটি করতে লাগলেন তাঁদের গচ্ছিত টাকা তুলে নিতে। বিরাট রান্ সামাল দেওয়ার জন্য অত টাকা মজুত ছিল না ব্যাংকগুলোতে। তাই এক এক করে সবার কপাট গেল বন্ধ হয়ে। আমানতকারীরা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। ব্যাংক-ফেলের সঙ্গে সঙ্গে অনেকের হার্ট-ফেল করার মতো অবস্থা।

হিমালয়ের শিখর অঞ্চলে দার্জিলিঙ-এর অবস্থান হোলে কী হবে, ভূপৃষ্ঠের ঝড়ে সেই ব্যাংকও কাত হবার মতো অবস্থা। গোড়ার দিকে

মৃদু স্পন্দন কাটিয়ে উঠলেও, পরে দ্রুত বাদ্যধ্বনির মতো তারও জোরে রান্ শুরু হয়ে গেল। লাঞ্ছনা এড়াবার জন্য পাটনার সব ব্যাংক ম্যানেজার উধাও হয়ে গেলেন রাতারাতি। দুর্গত আমানতকারীদের বাঁচাবার কোনো পথই খোলা রইল না আর। এইভাবে পাটনা শাখার কত ব্যাংক যে বিপন্ন হয়েছিল সেটা বলার নয়। দার্জিলিঙ ব্যাংকের ভাগ্য বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মেজদাদারও অদৃষ্টের পরিবর্তন ঘটল চক্রবৎ আবর্ত-নের মতন।

প্রায় এক বছর কোনো সাড়াশব্দ না করে তিনি বসে রইলেন কলকাতাতে। আবার সেই কর্মহীন জীবনের কঠোর প্রাণধারণো-পায়ের কষ্টের প্রারম্ভ। ব্যাংক জীবনের সেই সুখের দিনগুলি নির্বাপিত হয়ে শুরু হোলো সমস্যাসংকুল দিনের অতিবাহন। মেজবৌদি পাটনায়, মেজদাদা কলকাতাতে, এটা একটা অদ্ভুত আক্ষিপ্ত অবস্থা। কিন্তু কিছুই করার উপায় ছিল না।

বেকার হয়ে বসে রইলেন মেজদা প্রায় দু বছর, তারপর সৌভাগ্যের উদয় হোলো একটা নতুন চাকরি পেয়ে। তাও কবিরাজীর চাকরি, সেই সুদূর আহমেদাবাদে কোনো একটি কবিরাজী প্রতিষ্ঠানে। শিখেছিলেন কবিরাজী, তাই সেই ডিগ্রি কাজে লাগল এই চাকরিটি পেতে। কম মাইনে, তাও ভালো, মাস গেলে তো হাতে আসবে সেটা নিয়মমত। এটাই তখন মেজদাদার কাছে হয়ে গেল বিরাট সিদ্ধি। অথচ স্বাধীনভাবে প্র্যাকটিস করার যে সাজসরঞ্জাম নিয়ে বসেছিলেন পাটনাতে, বাবার তত্ত্বাবধানে, সেটা ভালো লাগেনি তাঁর। আগুনের তাপে পক্ক না হোলে কোনো দ্রব্যই যে হজম হোতে চায় না, এটাও তাই। চারিদিকের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার পর মনে হোলো কবিরাজীতেই স্থিতিলাভ করা বাঞ্ছনীয়। দুঃখ শুধু এটাই, যে-প্রতিপত্তি ও অর্থ পেতে পারতেন স্বাধীনভাবে ব্যবসা করে, সেটা আর কোনোদিন পাওয়া হোলো না। আহমেদাবাদে গিয়েই আকুল হোয়ে পড়লেন মেজবউদিকে সেখানে নিয়ে যেতে।

এই রকম যখন পরিস্থিতি সেই সময় হঠাৎ মারা গেলেন আমাদের বড়বউদি—হাসপাতালে গিয়ে বাচ্চা হবার সময়। পেটের বাচ্চা পেটেই রয়ে গেল। সে যে কী করুণ দৃশ্য, চোখে দেখা যায় না।

সেদিনটা ছিল বিজয়া দশমীর দিন। একদিক দিয়ে দুর্গা প্রতিমার বিসর্জনের মিছিল চলেছে, অন্যদিকে কাঁধে করে নিয়ে চলেছি আমরা কজন বড়বউদির শবদেহ। অনেক বাঙালী বাড়ীর জানালা দিয়ে বউয়েরা সেই

দৃশ্য দেখে মন্তব্য ছুড়লেন, কী ভালো দিনেই না মৃত্যু হোলো এই সৌভাগ্যবতী কুললক্ষ্মীর। মাথায় সিঁদুর নিয়ে কী সুন্দরভাবে চলেছে মা ভগবতীর সঙ্গে অমরলোকে। পাঁজিপুঁথি দেখেই বোধহয় এদের জন্মমৃত্যু স্থির করা থাকে।

এদিকে কতবড় বিপদ নেমে এলো আমাদের সংসারে, সেটা আমরাই জানি। আদালতগঞ্জে বড়দাদার সংসারের ভার কে বইবে, সেটাই হয়ে দাঁড়াল একটা বড় সমস্যা। চারটি ছেলেমেয়ে তাঁর, সবই কচি কচি। মেয়েই বড়, তবে ছেলেমানুষি কাটেনি তার। বয়স তখন এগারো কী বারো। পাকাবুদ্ধির চেয়ে চিত্তচাঞ্চল্যই বেশী। বালিকার ন্যায় আচরণ। এসব দেখে বাবা নীরব। হতভম্ব। বড়দাদার মুখে কোনো রা নেই। এমনটি যে হবে, তাঁর ধারণার অতীত। চেয়ে থাকেন শুধু বাবার দিকে উনি কী ব্যবস্থা করেন। অল্পবয়সী এতগুলো সন্তান নিয়ে তো একা থাকা যায় না। রান্নাবান্না করে দেবে কে, অফিসেই বা এদের একা ফেলে যাবেন কী করে? অসুখে-বিসুখে সেবাশুশ্রূষা করার আপনজনও যে আর কেউ থাকল না কাছে।

মা'র দিকে চেয়ে রইলেন বাবা। উপায় যে একটা করতেই হবে, তা না হোলে ছেলেমেয়ে নিয়ে বড়ছেলে যে ভেসেই যাবে।

মা বাক্যরহিত অবস্থায় স্থির হয়ে রইলেন। বড়ছেলের প্রতি স্নেহভালোবাসামাখানো হৃদয়টা বুঝি একটু ঝাঁকানি খেলো. প্রসারিত হোয়ে দেখা দিল কর্তব্যবোধটা, যেটা বড়দাদার বিয়ের পর নতুন বউ পেয়ে খানিকটা অবহেলাপ্রাপ্ত হয়েছিল। ভাবলেন নিজের দুঃখটুকু বড় করে দেখে আর লাভ কী? একটা ভেসে-পড়া সংসারকে বাঁচাতে হোলে আত্মপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হোতেই হবে। আর কিছু না ভেবে তিনি কর্তব্যে যত্নশীল হোয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বড়দাদার সংসারটাকে উদ্ধার করার জন্য।

আমরা কজন রয়ে গেলাম বি, এম, দাশ রোডের বাড়ীতেই মেজ বউদির ভরসায়।

মা বড়দাদার সংসার নিয়ে ছিলেন ভারি তৃপ্ত। নাতি-নাতনিদের বহু উৎপাত অত্যাচারও গ্রাহ্যের মধ্যে আনেননি। ক্ষমা, সহনশীলতা ও ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েছিলেন সেই সংসারে থেকে। লক্ষ্য যে ছিল শুধু একটি—বড় ছেলের রোদনভরা মুখ একটু হাসিযুক্ত করে তোলা। স্ত্রীকে হারিয়ে তাঁর জীবন যে হয়েছিল মর্মপীড়ক, বেঁচে থাকাটাই অর্থহীন। সেই মর্মাহত মানুষটির হৃদয়ে যদি বেঁচে থাকার মলয়পবন একটু সঞ্চালিত করা যায়, সেই চেষ্টায় নিজের জীবনটুকুও মা করে তুলেছিলেন একেবারে

অর্থশূন্য। সংসার সমুদ্রে ডুবে থাকতেই যেন ভালোবাসতেন। সবাইকে খাইয়ে দাইয়ে, দৈনন্দিন সব কাজ সেরে খেতে বসতেন বেলা তিনটেতে। এটাই ছিল তাঁর জীবনের প্রাত্যহিক কর্মনীতি। শেষ অবধি টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন এই সংসার এমনি করেই। করুণাকর মা, যিনি নিজের কর্তব্যকর্ম করতে গিয়ে যথার্থ রূপেই দেহক্ষয় করেছিলেন একটি সংসারকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য।

কলেজের শেষ পরীক্ষা দেওয়ার পরেই কিন্তু আমার চাকুরি জীবন শুরু হয়েছিল। পরীক্ষার ফল বেরোয়নি তখনও। শর্টহ্যাণ্ড ও টাইপিং-এর যেটুকু জ্ঞানলাভ করেছিলাম কলেজে ঢোকার আগে, সেটা কিন্তু কাজে লেগেছিল প্রথম চাকুরি পেতে। এটা একেবারেই বিনা-চেষ্টায় লাভ।

পাটনা কলেজে বি, এ, পড়ার সময় আমার একজন নতুন বন্ধুলাভ হয়েছিল। নাম ছিল ভোলানাথ বরাট। ইন্টারমিডিয়েটে সে বিহার ন্যাশনাল কলেজে পড়ত। তারপর অনার্স পড়ার লোভে চলে এলো পাটনা কলেজে পড়তে। কিন্তু ফোর্থ ইয়ারে ওঠার পরেই সে কলেজ ছেড়ে চাকরিতে ঢুকে পড়ল দানাপুরে মিলিটারি অফিসে। সেটা ১৯৪৩ সালের কথা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন পুরোদমে চলেছে, দানাপুরের ছাউনি সৈন্যভরা। বিভিন্ন দপ্তরও ভাড়া-করা বাড়ীতে খোলা হয়েছে।

একদিন হঠাৎ ভোলানাথ বরাট আমাদের বাড়ীতে এসে হাজির। কলেজে থাকতে, সে প্রায়ই আসত আমাদের বাড়ীতে। এসেই বল্ল, চাকরি করবি? একজন পার্সোনাল এসিসটেন্টের দরকার আমাদের মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সারভিস অফিসে। এখানকার কর্ণেল আমাকে প্রায়ই বলেন একজন লোকের কথা। তুই তো শর্টহ্যাণ্ড ও টাইপিং জানিস, হয়ে যাবে তোর।

আমার তখন সবে পরীক্ষা শেষ হয়েছে। বসেই আছি বাড়ীতে। রাজী হয়ে গেলাম।

পরদিন আমি ভোলানাথের দানাপুরের বাড়ীতে সকালে গিয়ে হাজির। আমাকে নিয়ে গেল সে তার কর্ণেলের কাছে। আর্মির ড্রেসে কর্ণেল ঘরে বসে। ইংরেজের লাল টকটকে চেহারা দেখে একটু থতমত খাওয়ার অবস্থা আমার।

প্রথমেই তো গুড মর্ণিং করে কর্ণেলের ঘরে ঢুকলাম। সঙ্গে ভোলানাথ

ছিল। সে-ই কর্ণেলকে বল্ল, তুমি একজন পি, এ-র খোঁজ করছিলে, তাই একে নিয়ে এসেছি। পরীক্ষা করে দেখ, তোমার চলবে কিনা।

কর্ণেল সাহেব তো আগাগোড়া আমার চেহারাটা নিরীক্ষণ করে বলে উঠলেন, অল রাইট, লেট মী টেস্ট্ ইউ।

বুঝলাম উনি আমার শর্টহ্যাণ্ড-এর বিদ্যাটা যাচাই করে নিতে চান। সঙ্গে আমার পেন্সিল ও নোটবুক ছিলই। মুখোমুখি টেবিলের সামনে বসে পড়লাম। টেবিলের ওপরেই আর্মি জেনারেল হেড কোয়ার্টারের একটা চিঠি রাখা ছিল। সেটা থেকেই উনি আমাকে দশ লাইনের একটা ডিকটেশন দিলেন।

কোনোদিন তো ইংরেজ সাহেবের ডিকটেশন নিইনি, কাজেই হাতটা একটু কাঁপছিল। ভয়ও হচ্ছিল, কি জানি পারব কিনা ইংরেজের উচ্চারণ বুঝে সবটা লিখতে। এমনিতেই তো সব কথা ওদের বোঝা মুশকিল, খানিকটা চাপা থাকে জিভের তলায়।

দশ-লাইন ডিকটেট্ করেই সাহেবের হুম শব্দে আজ্ঞা হোলো, নাউ গেট্ ইট্ টাইপড্।

ভোলানাথ তখন আমার পাশে আর দাঁড়িয়ে নেই। একটু ভরসা পাব ভেবেছিলাম, সেটাও উবে গেল মুহূর্তে। একটু নিরুদ্যমই হোয়ে পড়লাম। কোথায় টাইপ করব ডিকটেটেড় পিসটা? কর্ণেলের ঘরে তো কোনো টাইপ মেশিন নজরে পড়ছিল না। দাঁড়িয়ে আছি চুপ করে।

সাহেব হয়ত বুঝতে পেরেছিলেন আমি কীসের অপেক্ষায় রয়েছি। উঠে এসে দেখিয়ে দিলেন পাশের ঘরে রাখা টাইপ রাইটার, কাগজপত্র সবই।

আমি ধীরে ধীরে সেটা টাইপ করে ফেল্লাম। স্পীড় দেখাবার প্রয়োজন ছিল না। ভালো করে দু-তিন বার দেখে নিয়ে এলাম কর্ণেলের কাছে। আগাগোড়া সেটা পড়ে তিনি মহাখুশী। উল্লাসের স্বরেই বলে উঠলেন, হাউ ইজ্ ইট্, ইউ এপিয়ার টু বী ওয়েল একাসটমড্ উইথ ইউরোপীয়ান এ্যাক্‌সেন্ট?

একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম এই কথায়। বুঝলাম আমার ডিকটেশন নেওয়ায় কোনো ভুল ছিল না। এবং টাইপেও উতরে গেছি। তবে স্পীডের কথা তুললেই হোতো বিপদ, কারণ আমার তো আর প্র্যাকটিস নেই বহুকাল। কর্ণেল আর এসব কথা তুললেন না। শুধু বল্লেন, আই এ্যাম সরি, আই ক্যান্ট কিপ্ ইউ হিয়ার উইথ মী। মাই ফ্রেণ্ড মেজর আর ডি ওয়ালশ নীডস্ এ স্টেনো ইন গয়া। ইউ আর টু রিপোর্ট

দেয়ার। আই উইল গিভ এ লেটার রেকমেণ্ডিং ইউ ফর এপয়েন্টমেন্ট ইন দ্যাট পোস্ট।

এইসব কথা বলেই তিনি তাঁর স্টেনোকে দিয়ে একটা চিঠি টাইপ করিয়ে আমার হাতে দিলেন এবং দাঁড়িয়ে উঠে আমার সঙ্গে শেক্‌হ্যাণ্ড করে বিদায় দিলেন।

কী করব ভেবে পাচ্ছি না। বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। ভোলানাথ বরাট কোথায় বসে, তাও জানি না। অতবড় এম. ঈ. এস, অফিস দানাপুরে, তার আণ্ডারে হোলো গয়ার অফিস।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি বোকার মতো। কোথা থেকে দেখি ছুটে এলো বরাট। বল্লে, দেখি কী লিখেছে সাহেব? এই বলে চিঠিখানা খুলে পড়তে লাগল। তারপর হাসি হাসি মুখ করে বল্ল, তোর চাকরি তো হয়েই গেল। এ যখন রেকমেণ্ড করে দিয়েছে তখন গয়ার মেজর সাহেবের কিছু বলার নেই। ওখানে রিপোর্ট করলেই হবে। কী সাংঘাতিক প্রশংসা করেছে তোর, দেখেছিস। এমন করে কোনো ইংরেজ সাহেব লেখে না।

এবার সে জোরেজোরেই চিঠিখানা পড়তে শুরু করল, গুপ্তা উইল বী এ্যান এ্যাসেট টু ইউ। হী ইজ একাসটমড্ টু ইউরোপীয়ান এ্যাক্‌সেন্ট।

তারপরেই সে ঠাট্টা ছুড়ে মারল, তুই কী কোনো ইংরেজ টিউটর রেখে বাড়ীতে ইংরেজী পড়তিস নাকি যে, এত বড় একটা সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়েছে?

ক্রোধযুক্ত অবস্থা তখন আমার। কোথায় ভেবেছিলাম পাটনাতে বসে চাকরি করব দানাপুরে গিয়ে, তা না ঠেলে দিচ্ছে একেবারে গয়ায়। পিণ্ডদানের ব্যবস্থা এখনি। সেখানে গিয়ে যে কোথায় থাকব তারও নেই কোনো ঠিক-ঠিকানা। দরকার নেই, আমার এই চাকরির।

এই নে, রাখ তোর এই চিঠি। আমি চল্লাম বাড়ী। ক্ষিদের জ্বালায় এখন আমার পেট ছেঁকা খাচ্ছে। এই বলে চিঠিখানা ভোলানাথ বরাটের হাতে দিয়ে আমি চলে আসার উদ্যোগ করছি।

বরাট আমার হাতটা চেপে ধরে বল্লে, একটু অপেক্ষা কর। আধ-ঘন্টা পরেই আমাদের লাঞ্চের ছুটি। ক্যানটিনে এক সঙ্গে বসে খেয়ে নেব, তারপর তুই যা ভালো মনে করিস করবি। চাকরি পেয়ে চট করে ছাড়তে নেই। গয়াতেই যে থাকবি চিরকাল, তা তো নয়। হয়ত দেখবি, দানাপুরেই এই কর্ণেল তোকে টেনে নিয়ে আসবে। তোর ওপর তো দেখছি একটা ভালো ইম্‌প্রেশন হয়েছে।

দুদিন ভেবেচিন্তে পরে একদিন হঠাৎ একটা সুটকেস ও ছোট একটি বিছানার বাণ্ডিল নিয়ে রওনা হলাম দুপুরের গাড়ীতে গয়ায়।

সন্ধ্যা নাগাদ ট্রেন পৌঁছল গয়া স্টেশনে। কোথায় গিয়ে উঠব সেই জায়গায় খুঁজে বের করতে হবে আমাকে।

আমাদের চৌহাট্টার পাশের বাড়ীটা ছিল গয়া জেলার রামিবিঘা এস্টেটের পাটনার আবাস। এই বাড়ীতেই যোগেন্দর বলে ছেলেটি, যার কথা আগেই বলেছি, সে সেখানে থাকত। এর কাকা ছিলেন এই এস্টেটের মুনশী। সেই সূত্রেই রামিবিঘা এস্টেটের যিনি জমিদার—নাম কৃষ্ণবল্লভ নারায়ণ সিং—মাঝে মাঝে এখানে এসে উঠতেন বৃহৎ একটা দল নিয়ে। সবাই জমিদারের কর্মচারী। সঙ্গে থাকত দু-তিনখানা মোটরগাড়ী। বন্দুকধারী দেহরক্ষী, গোমস্তা এবং ফাইফরমাস খাটার সেবক দল। পাশের বাড়ীর আমাদের সকলের সঙ্গেই পরিচয় ছিল এই জমিদার তনয়ের। ইনি কী করে জানতে পেরে গিয়েছিলেন, আমি গয়াতে যাচ্ছি একটা চাকরিতে যোগদান করতে। খুব সম্ভব আমার বন্ধু যোগেন্দরই এঁর কানে কথাটা তুলে ফেলেছিল।

আমাকে জমিদারবাবু ডেকে বল্লেন, গয়াতে যখন যাচ্ছ, তখন আমার গয়ার বাড়ীতেই উঠবে প্রথম। তারপর যেখানে সুবিধা হবে সেখানে থাকবে। সংকোচের কোনো কারণ নেই। তার পরে গোমস্তাজীকে ডেকে বল্লেন, এর যেন কোনো অসুবিধা না হয় গয়াতে, খেয়াল রাখবে।

গোমস্তাজী আমাকে চিনতই, ঘাড় নেড়ে শুধু সম্মতি জানিয়ে দিল।

কাজেই ট্রেন থেকে নেমে একটা রিক্সায় চেপে রামিবিঘার জমিদার বাড়ীতে চলে এলাম। তখনকার দিনে গয়া জেলার নামকরা জমিদার, তাই রিক্সওয়ালাকে এই এস্টেটের নাম বলতেই এখানে নিয়ে এলো কোনোরকম বাকচাতুরি না করেই।

বিরাট বাড়ী। জমিদারের উপযুক্তই বটে। দোতালার বারান্দায় কে একজন দাঁড়িয়েছিলেন, খুব সম্ভব জমিদারের শ্যালক। আমাকে দেখেই চিনতে পেরে খুব খুশী মনে দোতালায় উঠে আসার ইঙ্গিত করলেন।

চেয়ারে বসতে না বসতেই একজন পরিচারক একটা ডবলমাপের গেলাসে সরবৎ নিয়ে এলো। নেবুর সরবৎ। গরমের দিন ছিল, কাজেই খুব ভালো লাগল খেতে।

তারপর ওই পরিচারকটি আমার স্নানের ব্যবস্থা করে দিল। স্নান সেরে একটা খাটিয়াতে দেহ এলিয়ে নানারকম গল্প হোলো ওই শ্যালকের সঙ্গে। আমরা একই বয়সী ছিলাম। পাটনায় এলে এঁর সঙ্গে বসে

অনেক গল্পগুজব করেছি। কাজেই কোনো সংকোচের প্রশ্ন ছিল না। একটু পরেই দেখি, ওই পরিচারকটি এসেছে আমার গোর দাবাতে অর্থাৎ আমার পা টিপে দিতে।

সত্যি বলতে কি, এবার একটু বিপন্ন বোধ করলাম। খাটিয়ার ওপর পা সোজা রেখে আরামে শুয়েছিলাম, ট্রেন জার্নির ক্লান্তি দূর করার জন্য। পরিচারক নিজে মেঝেতে বসে আমার পায়ে হাত দিতেই তড়াক করে উঠে বসলাম। কী রকম যেন কুন্ঠিত বোধ করলাম। পা টেপানোর অভ্যাস নেই আমাদের বংশের কারুরই, আজ জমিদার বাড়ীতে উঠেছি বলে, সেই সংস্কার কাটিয়ে উঠিয়ে, কাউকে দিয়ে পা দলাই-মলাই করান এটা ভাবতেও যেন কেমন লাগছিল। আমার দরকার নেই, বলতেই সে উঠে পড়ল।

অন্য খাটিয়াতে দেখি ওই শ্যালকবাবুটি তখন চোখ বুজে আরামে শুয়ে আছে, আর সমস্ত অঙ্গ ডলা-মলা করে চলেছে অন্য আর একজন পরিচারক। খানিক বাদেই দেখি, সেই নরম মোটা ধবধবে নধরটা যেন আলগাভাবে একপাশে কাত হোয়ে নাক ডাকা শুরু করেছে। একেই বলে জমিদারকুলের আয়াস, জীবনভর শুধু সুখভোগেই কাটিয়ে যাও দিনের পর দিন। কর্মপ্রবৃত্তি শূন্য হোয়ে এই আরামী জীবনেও হয়ত ক্লান্তি আসবে একদিন।

রাত আটটা বাজতেই দেখি একটা কর্মব্যস্ততা শুরু হয়েছে গোটা বাড়ীতে। অন্দরে এবং বাহিরে। অন্দরমহলে মেয়েদের চুড়ির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। এটা একেবারেই অন্তঃপুর মহল, মুসলমানী কায়দায় যাকে বলা হয় জেনানা মহল। সেখানে বাইরের লোকের প্রবেশ যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি মেয়েরাও আসতে পারবে না অন্তঃপুর ছেড়ে বাইরে। শুধু জ্ঞাতিকুটুম্বদেরই ভিতর বাটিতে প্রবেশাধিকার রয়েছে। অতিথি পরিচর্যার দায়দায়িত্ব থেকেও তারা মুক্ত। এসবের জন্য নানাকাজের একাধিক পরিচারকইতো রয়েছে সদা তৎপর, আজ্ঞা পালনের জন্য।

এক ফাঁকে দেখি, একজন এসে আমাদের দুই খাটিয়ার মাঝখানে একটা ছোট্ট টেবিল রেখে গেল এবং নিদ্রিত শ্যালকটিকে হাঁকাহাঁকি করে বলে গেল, ভোজন তৈয়ার।

বুঝলাম, এবার রাত্তিরের আহারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আমি তো জেগেই ছিলাম। শ্যালকবাবু উঠে বসল গা মোড়ামুড়ি দিয়ে। আমার দিকে তাকিয়ে বল্লে, আরে তুমি একটু কাত হোয়ে নিলে না কেন, একটু জিরিয়ে নেওয়া উচিত ছিল।

আমার হাতে তখন একটা 'দেশ' পত্রিকা। বল্লাম, এটা পড়ছিলাম।

বরাহিলজী নিয়ে এলেন দুটো চকচকে পেতলের থালায় আমাদের দুজনের ভোজনসামগ্রী। বিহারের গ্রামদেশের বড় বড় জমিদার বাড়ীর পাচককে বলা হয় বরাহিল। এরা রান্নাবান্না নিয়েই থাকে এবং পরিবেশনটা এদেরই করতে হয়। কাজেই নিজের হাতে দুটো থালা নিয়ে এসে, সেই ছোট্ট টেবিলের ওপর রেখে গেল সে।

থালাতে কয়েকটি চাপাটি, তার সঙ্গে একটু ভুজিয়া। একটা বাটিতে রহড়ের ডাল, তার ওপর খাঁটি ভয়সা ঘি ভেসে আছে। থালার এক পাশে কিছু সব্জি, একটা লঙ্কা-মরিচ, একখণ্ড নেবুর নিমকি অর্থাৎ নেবুর আচার।

হাত ধুয়ে খেতে বসা গেল। দুজনেই বেশ তৃপ্তি করে খেয়ে চলেছি গল্প করতে করতে। খানিক পরেই পাচকঠাকুর নিয়ে এলো বড় দুটি গেলাস ভরা খাঁটি গরুর দুধ।

ন'টা বাজতে না বাজতেই দেখি, একজন পরিচারক নিয়ে এলো চারটি ছোট বাঁশের টুকরোতে কুণ্ডলাকারে জড়ানো একটি মশারি। বুঝলাম খাটিয়ার চার পায়াতে ক্রুশের মতো করে এটাকে টাঙ্গানো হবে গয়ার মশাকে ঠেকানোর জন্য।

পরদিন সকালে সাতটা বাজতে না বাজতেই বেরিয়ে পড়লাম আমার চাকুরিস্থলে যোগদান করার জন্য। সৈন্যদের এলাকায় সহজে প্রবেশ করাও মুশকিল, যত্রতত্র পরিচয় দিতে দিতে মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসের মেজর আর, ডি, ওয়ালশ-এর দপ্তর খুঁজে পেলাম। আর্মির অফিসগুলোতে তখন সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটা অবধি কাজ চলে। সন্ধ্যার পরেই তো ব্ল্যাকআউট। তাই বেলাবেলিতেই অফিস বন্ধ হয়ে যায়।

খোদ অফিসের বড়বাবুর কাছেই গিয়ে দাঁড়ালাম দানাপুরের কর্ণেলের চিঠিখানা নিয়ে। উনি চিঠিখানার আদ্যন্ত পাঠ করে এমনভাবে কটমট করে আমার দিকে তাকালেন যেন আমার ভুল হয়ে গেছে এখানে আসাটা। আমার উৎসাহ একটু নিরুদ্যম হোলো, সন্দেহ নেই।

বড়বাবু অনেকক্ষণ কী যেন ভাবলেন। তারপরে বল্লেন, মেজর সাহেব তো এখন টুরে, দুদিন লাগবে ফিরতে। তাছাড়া আপনার ফিজিকাল ফিটনেস সার্টিফিকেট কোথায়? সেটাও তো আনতে হবে। এখানকার আর্মি হসপিটালের মেজরের কাছ থেকে নিয়ে আসুন তাহলে। এই অফিস থেকে চিঠি দিয়ে দিচ্ছি ওঁকে, চলে যান ওখানে।

এ আবার কোন ফ্যাসাদে পড়লাম জানি না। যুদ্ধক্ষেত্রে আবার পাঠাবে নাকি এরা যার জন্য শারীরিক যোগ্যতার একটা প্রমাণপত্র চাই? মনটা কেমন যেন দমে গেল এসব কথা শুনে। বড়বাবু একটা ছাপানো ফর্মেই কী যেন লিখে আমাকে দিয়ে দিলেন নিজেই মেজরের বকলমে সই করে।

এইবার অফিসঘরের চারদিকে একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম। এতক্ষণ তো বড়বাবুর মুখোমুখি হয়ে বসেছিলাম। চতুর্দিকে কী রয়েছে, সেটা তাকিয়েও দেখিনি। এইবার মনে হোলো অফিসের কতকগুলো মুখ আমার দিকে যেন হাঁ করে চেয়ে দেখছে গিলে খাবার মতো।

আমি একটু দুঃখিত ও চঞ্চল মনে অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম বড়বাবুর চিঠিখানা হাতে নিয়ে। গয়াতে আর্মি হসপিটালের অবস্থান যে কোথায়, তাও জানি না। গোটা শহরটাইতো সৈন্য দিয়ে ভরা। বড় বড় ট্রাক, ট্যাংক সবই চলছে শহরের রাস্তার ওপর দিয়ে। হোটেলগুলোতেও সৈন্যরা বসে চা-কফি খাচ্ছে। সিভিলিয়ান কেউ আছে বলে বোঝাই যায় না।

আমি বাইরে দাঁড়িয়ে ভাবছি, কাকে জিজ্ঞাসা করি আর্মি হসপিটালটা কোন দিকে। এমন সময় একজন বাঙালীর মিষ্টি-ডাক কানে এলো। ছেলেটি এই অফিসেই কাজ করে, এতক্ষণ বোধহয় টেবিলে বসে আমাকে নিরীক্ষণ করছিল। প্রথমেই সে নিজের নামের পরিচয় দিল। বল্লে, আমি অসীম পাল। বছর পাঁচেক হোলো এই অফিসে কাজ করছি। এখানে যে কজন ক্লার্ক আছে সবাই বাঙালী। এখানকার প্যালেস্ হোটেলে দুখানা ঘর নিয়ে ছয়জন থাকি। হোটেলেই খাওয়াদাওয়া সব একসঙ্গে হয়। সকালে মিলিটারি জীপ নায় আমাদের অফিসে নিয়ে আসতে, আর পৌঁছেও দেয়।

এইসব নানা কথা হোতে হোতে আমাকে সে খুলেই বল্ল, আপনি যে এখানে এসে এই পোস্টে জয়েন করছেন, তাতে আমাদের বড়বাবু খুশি হোতে পারছেন না। ওই পোস্টে বড়বাবুর একজন আত্মীয়, যিনি ক্লার্ক হিসাবে এখানেই কাজ করছেন, তাকে দিয়েই মেজর তাঁর স্টেনোর কাজ চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, যাতে ভবিষ্যতে ওকে ওই পোস্টেই রাখা হয়। আপনার আগমন তাই চক্ষুশূলের মতোই হয়ে পড়েছে। কাজেই আপনি জয়েন করলেও বড়বাবু আপনাকে টিকতে দেবে কিনা সন্দেহ। মেজর সাহেব তো মাসের বেশির ভাগ দিন টুরেতেই, বড়বাবুই তখন

হর্তাকর্তা। কাজেই ওঁর তদ্বির না করতে পারলে চাকরিটি নষ্ট্ হয়ে যাবে।

অসীম পালকে সত্যি আমার খুব ভালো লাগল তার খোলামনের কথা-বার্তা শুনে। তাকে চিনি না জানি না, তবুও বন্ধুর মতো এসে আমাকে ভেতরের কথা নিঃসংকোচে বলে গেল।

ওকে বল্লাম, ঠিক আছে। আমি ততক্ষণে ফিজিকাল ফিটনেস সার্টিফিকেটটাতো নিয়ে আসি, তারপর মেজর ফিরে এলে জয়েন করব, কী করব না, সেটা ভাবা যাবে। তবে ততদিন আপনাদের হোটেলে আমার জন্য একটা সীট-এর ব্যবস্থা করে রাখবেন। জমিদারের ডেরায় তো বেশিদিন থাকা চলে না।

আর্মি হসপিটাল বের করতে কোনো অসুবিধা হয়নি। রিক্সওয়ালারা সবই চেনে জানে দেখলাম। যুদ্ধের সময় ওদেরই লাভের ব্যবসা চলছে দ্রুতগতিতে। এক একটা রিক্সয় তিন-চার জন সৈন্য চাপিয়ে হোটেলে-রেস্টুরেন্টে-বারে এমন কি অস্থানে কুস্থানে নিয়ে যায় এরাই। ভাড়া হিসেবে কুড়ি পঁচিশ তিরিশ টাকা যা হাতে উঠে আসে, মুঠো করে তুলে দেয় হাতে। স্বদেশ ছেড়ে তারা এখানে এসেছে যুদ্ধের জন্য। টাকা পাচ্ছে প্রচুর, তাই বিলিয়েও দিচ্ছে স্ফূর্তি করার জন্য। সেখানে কোনো কার্পণ্য নেই। এই আর্মির দৌলতে কত ছোট ছোট ব্যবসায়ী বড় হয়ে গেল, কত বড় ব্যবসায়ী লাখপতি হোলো, এসব তো চোখের সামনে দেখা।

আর্মি হসপিটালে পৌঁছতে বেশি সময় লাগেনি। ইংরেজ মেজর ডাক্তার তখন তাঁর চেম্বারেই বসে। চিঠিখানা তাঁর হাতে দিতেই উনি ডেকে পাঠালেন তাঁর এ্যাসিসটেন্ট এক সুবেদারকে। আমাকে নিয়ে গেল সে হাসপাতালের এক নিভৃত কক্ষে। সেই ঘরে রয়েছে ডাক্তারি পরীক্ষা-নিরীক্ষার সব সরঞ্জাম। পেছনে পেছনে এলেন মেজর নিজেই। একটা কঠিন পরীক্ষা দিতে হবে মনে হোলো। আমার ওপর আদেশ হোলো বিবস্ত্র হয়ে যাওয়ার।

সে এক লজ্জাকর পরিস্থিতি। এমনিতেই কারুর সামনে আদুলগায়ে থাকিনি কখনো, নিদেনপক্ষে একটা গেঞ্জি থাকে গায়ে সর্বদাই। তাই সব বস্ত্র খুলে ফেল্লার আদেশে নিজের অভিমানে আঘাত লাগল সাংঘাতিক। একটু কিন্তু করছি, কী করব ভেবে। এমন সময় আবার একটা কড়া হুকুম হোলো মেজরের জোর গলায়। আর্মির ব্যাপার, যখন এসে পড়েছি এদের কবলে, তখন নিষ্কৃতি পাওয়ার জো নেই। আর্মি আইন অনুযায়ী, চাকরি পেতে হোলে, মেডিকাল চেক-আপ করার প্রয়োজনে এটা করবেই। কাজেই নিরাবরণ হোতেই হোলো।

এই অবস্থায় দেহের ওজন, শরীরের উচ্চতা এবং কয়েকবার ওঠ-বস করিয়েও নিল। অনেক যন্ত্রপাতিরও প্রয়োগ করা হোলো বিভিন্ন অঙ্গের অবস্থা ঠিক আছে কিনা দেখতে। সব কিছুর যাচ হয়ে যাওয়ার পর হুকুম হোলো ভদ্রস্থ হোতে।

নিজের চেম্বারে ফিরে এসে মেজর ডাক্তার একটা সার্টিফিকেট ঝট্পট লিখে দিলেন—ফিট ফর সার্ভিসেস এনী হোয়ার ইন ইণ্ডিয়া।

মনে মনে তো নিকুচি করে চলেছি এ ধরণের অসভ্য ব্যবহারের জন্য, তার ওপরে লিখছে কিনা ভারতের যে-কোনো জায়গায় চাকরি করার মতো স্বাস্থ্য! একটানে তো হাতে নিয়ে নিলাম মেডিকাল সার্টিফিকেটটা, এখন চাকরিতে জয়েন করা না করা তো আমার ইচ্ছাধীন।

আবার এম, ঈ, এস, অফিসে ফিরে এলাম। তখন একটা বেজে গেছে, সবাই লাঞ্চের জন্য বাইরে। টেবিলে বসে আছে শুধু সেই অসীম পাল। কী একটা আর্জেন্ট-ফাইল পড়ছে।

আমাকে দেখেই বল্লে, পেলেন সার্টিফিকেট? তবে আজকে জয়েন করে কী লাভ? আজকের মাইনে তো দেবে না আপনাকে। আফটার-নুনে জয়েন করলে আগামী কাল থেকে মাইনের হিসেব হবে। ফোর-নুনে হোলে আজকের মাইনে পেয়ে যেতেন।

মনে মনে ভাবলাম, এসব কী আর বুঝি ছাই। তোমাদের অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাই বিজ্ঞ সেজে বসে আছ। ভালোই হোলো, একটা দিন তো পাওয়া গেল ভাববার জন্য।

অসীম পালের হোটেলে সেদিনই বিকেলে জমিদার বাড়ীর আয়াস ত্যাগ করে চলে এলাম হোটেলের ভাত খেতে।

তিনদিন বসে রইলাম হোটেলে কারণ মেজর আর, ডি, ওয়ালশ তখনও টুর থেকে ফিরে আসেননি। কাজেই বড়বাবুর অধীনে থেকে তাঁর তদ্বির করার বাসনা একদম ছিল না।

চারদিনের দিন ভোরের ট্রেন ধরে পাটনায় ফিরে এলাম গয়া ছেড়ে। প্রথম-পাওয়া চাকরির পরিসমাপ্তি এইভাবে ঘটেছিল। অসীম পালের সেই বিনম্র খোলাখুলি কথাগুলো আমি এখনও ভুলিনি। চোখ খুলে গেছিল সেদিন থেকেই। জাত্যপ্রীতির দৌলতে অনেকেই ইংরেজ আমলে সাহেবের মোসাহেবি করে এইভাবে নিজের জ্ঞাতিগুষ্টির চাকরি জুটিয়েছে। চাকুরিক্ষেত্রে এটা হাল আমলের অর্থাৎ স্বাধীনোত্তর যুগের নৈতিক অবনতি, আমরা বৃথাই বলে থাকি।

আমার গয়ার চাকরি ছেড়ে পাটনায় চলে আসার এই অবিবেকতা কিন্তু ভালো চোখে দেখেনি কেউ। তবে আমার মূঢ়তার জন্য কারুর কাছে গালমন্দও শুনতে হয়নি। নিজের চেষ্টায় চাকরি, নিজেই পরিত্যাগ করেছিলাম বলেই বোধ হয়, আমার হঠকারিতার কোনো কঠোর সমালোচনা হোতে পারেনি।

তবে এই চাকরি ছেড়ে আমাকে বসে থাকতে হয়নি বেশি দিন। দু'সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই আর একটা চাকরি জুটে গেল।

আগেই বলেছি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আনুকূল্যে পাটনাতে বহু নতুন নতুন অফিস খোলা হয়েছিল। তারমধ্যে ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের ঈস্টার্ণ কমাণ্ডের মিলিটারি একাউন্টস-এর দপ্তর মীরাট থেকে এখানে পাকা-পাকিভাবে খোলা হয়েছিল। যুদ্ধ তখন ভারতের পূর্বসীমান্তে বিস্তারিত হোতে শুরু করেছে। গুটিকয়েক অফিসার এবং বেশ কিছু বাঙালী স্টাফ, এখানে সেই সুবাদে স্থানান্তরিত হয়ে আসে। তা সত্ত্বেও বহু লোক চাই এই অফিসে---গ্র্যাজুয়েট, আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট, যে-কোনো শিক্ষিত ব্যক্তির নিয়োগপথ ছিল অবারিত তখন এই অফিসে। এখানে অডিটরের চাকরির জন্য দরখাস্ত করেছিলাম।

একদিনেই হয়ে গেল চাকরি এই অফিসে। ঢুকে দেখি বিরাট দপ্তর। বিভিন্ন তার শাখা-প্রশাখা। যে সেকশনেই ঢোকা যাক না কেন, বেশির ভাগই বাঙালীর মুখ। এ যে দেখছি একেবারে বাঙালী-দপ্তর !

আমার সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্টের নাম ছিল সর্বরঞ্জন বরাট। অফিসের কাজকর্ম ছাড়াও তাঁর কতকগুলো বিশেষ গুণ ছিল---সাহিত্য, সংগীত ও নৃত্য ইত্যাদিতে ছিল বিশেষ আকর্ষণ। কয়েকটি নাটকও লিখেছিলেন তিনি। কলকাতা থেকেই সেগুলো প্রকাশিত হয়েছিল, তার-মধ্যে একটি নাটক---নাম 'বড়বাবু'---কলকাতার পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নিজেও নাটক পরিচালনা করতে ভালোবাসতেন এবং মীরাটে থাকাকালীন বহু নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন বারোয়ারী পুজা-মণ্ডপে। আমার নিজেরও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ থাকায় এঁর সঙ্গে যোগাযোগটা একটু বেশি করেই ঘনীভূত হয়েছিল।

কয়েক মাসের মধ্যেই পাটনার মিলিটারি একাউন্টস বিভাগে একটা সাহিত্য বৈঠকের ব্যবস্থা হোলো। উদ্যোক্তা সর্বরঞ্জন বরাট। মীরাটেও নাকি এঁরই উদ্যোগে সাহিত্য বৈঠক নিয়মিত হোতো। এতো বড় একটা ডিপার্টমেন্টে, যেখানে বাঙালীর সংখ্যাই বৃহৎ, সেখানে সাহিত্যরচনাকারী অনেকেই ছিলেন। কেউ কবিতা লিখতেন, কেউ গল্প প্রবন্ধ।

গানবাজনা ও নাচের ব্যাপারেও অনেকেই গুণাঢ্য ছিলেন। নাচের রাজা সেই সময় ছিলেন নবেন্দু ঘোষ। আজ যিনি বোম্বের ফিল্ম জগতে একজন স্ক্রিপ্ট-রাইটার ও পরিচালক।

এইভাবে অফিসের পরিমণ্ডলের বাইরে বরাটমশায়ের বাড়ীতেই একটা সাহিত্য বৈঠক চালু হোলো। আমাদের নিজেদেরই তখন আলাদা-ভাবে একটা সাহিত্য বাসর প্রতিষ্ঠিত ছিল যার কথা আগেই একবার বলা হয়েছে। তাই যেসব গল্প প্রবন্ধ বাসরের বৈঠকে পড়তাম সেগুলোকেই পুনরাবৃত্তি করতাম মিলিটারি একাউন্টসের সাহিত্য বৈঠকে। এরজন্য আলাদা করে আর নতুন কিছু লেখার প্রয়োজন পড়ত না।

বরাটমশায়ের একবার কী খেয়াল হোলো একটা নাটক মঞ্চস্থ করার, তারজন্য কয়েকজন অল্পবয়সী ছেলে চান 'বাল্মীকি প্রতিভা' করার জন্য। আমার ওপর ভার পড়ল কয়েকজন ছোট্ট ছোট্ট শিল্পী যোগাড় করে দেওয়ার। লঙ্গরটুলির 'রায় বাড়ী' তখন নাট্যযজ্ঞের ছোটখাটো একটা কর্মশালা। সকলেই অভিনয়ে অভ্যস্ত। বাড়ীতে স্টেজ্ খাটিয়ে ছোটদের অনেক নাটক তারা নামিয়েছে। ওখানে কথাটা পাড়তেই সবাই হৈ হৈ করে আনন্দে নেচে উঠল, নিজেদের নাট্যকুশলতা একটা বড় মঞ্চে, বহু দর্শক সমক্ষে, উপস্থাপিত করার একটা সুযোগ এসেছে বলে। আমারও তখন অদম্য উৎসাহ। ছুটির দিনে এবাড়ীর কয়েকজন—সুপ্রকাশ রায়, শেষপ্রকাশ রায়, শঙ্করলাল রায়, সোমনাথ রায় প্রভৃতিকে নিয়ে বরাট-মশায়ের বাড়ীতে জামাল রোডে চলে যেতাম রিহার্সাল দেবার জন্য। এরাই তখন মিলিটারি একাউন্টস অফিসের নাটকর্মের সবচেয়ে বড় অবলম্বন। নাটকের কুশীলবও এরাই। নিজে ঠেকনো সেজে এই দংগল নিয়ে যেতাম সেখানে। নেপথ্যে গান গাইত বরাটমশায়ের বড় মেয়ে হেনা আর এদিক থেকে ছিল সুব্রত রায়। রায়বাড়ীতে তখন রোজই চলত পাঠ মুখস্থের পালা। সবাই ব্যস্ত ও চিন্তিত, কী করে ওতরানো যাবে নাটকটা। শেষদিন অবধি তাই ছিল। রিহার্সাল পূর্ণ হয়ে গেলে একদিন হোতো স্টেজে মহড়া। সবাই চমৎকৃত হোতো এদের নাট্য-যোগ্যতা দেখে। পাটনার লেডি স্টিফেনসন হলটাই ছিল তখন নাচ-গান-নাটকের একমাত্র প্রদর্শন ক্ষেত্র। ভাড়াও ছিল নামমাত্র, এখনকার তুলনায়।

এসব নাটক ও গানের সবটাই ছিল ঘরোয়া ব্যাপার। কারুর কাছ থেকে চাঁদা চেয়ে নয়। বরাটমশায় যেমন ছিলেন এসব সংগঠনের ব্যাপারে প্রাণপুরুষ, তেমনি খরচের ব্যাপারেও ছিলেন প্রধান। সাংস্কৃতিক

জীবনযাত্রায়, সত্যি বলতে কী, তাঁর মতো একজন উৎসাহদাতা তখনকার দিনে, বিশেষকরে অফিসক্ষেত্রের অন্দরে, খুবই বিরল ছিল।

এতো গেল নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যাপার। সাহিত্য সভার আয়োজনেও তেমনি ছিলেন উদ্যমী মানুষ। প্রাণময় করে রেখেছিলেন সবাইকে সাহিত্যকর্মে। পাটনার মিলিটারি একাউন্টসের সাহিত্য সভার একবছর পূর্ণ হবার পর, একটা বার্ষিক উৎসব পালন করা হোলো। সেটা ১৯৪৪ সালের কথা। সভাপতি হয়ে এলেন সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। আয়োজন সেই লেডি স্টিফেনসন হলেই। যার যার গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা পাঠ ছাড়াও একটা ছোট্ট একাঙ্কিকা নাটকও প্রদর্শিত হয়েছিল। সেখানেও ছিল এই রায়বাড়ীর নাট্যদংগল। উদ্বোধন সংগীত পরিবেশন করে-ছিলেন পাটনা সাহিত্য বাসরের কয়েকজন সদস্য একসঙ্গে। এই সঙ্গীতের পরিকল্পনায় প্রধান ভূমিকায় ছিলেন আরতি গুহ ও সুব্রত রায়।

অত বড় একজন নামকরা সাহিত্যিকের কাছাকাছি হয়ে কবিতা গল্প পড়াটা ছিল খুবই গৌরবময় ব্যাপার। আমি খুব ভয়ে ভয়ে, অনেক জড়তা নিয়ে, একটা এক-পাতা-সাইজের গল্প পড়েছিলাম সেই সাহিত্য সভায়। তখনকার দিনে মাইকের ব্যবস্থা ছিল না। কাজেই যতদূর গলা উঁচু করে পাঠ করা যায় সেইভাবে, অনেকটা চেঁচিয়েই বলতে পারি, পড়তে হয়েছিল গল্পটি যাতে হলভর্তি শ্রোতাদের সবাই শুনতে পায়।

এমনি করেই আনন্দময় পরিবেশের ভেতর দিয়ে চলছিল আমার ডিফেন্স একাউন্টসের চাকুরি জীবন।

প্রায় তিনবছর এখানে কাটাবার পর মাথায় ঢুকল আবার চাকুরি বদল করার। কলকাতার পোস্টাল একাউন্টসে কয়েকটি পদ খালি আছে দেখে, অফিসকে না জানিয়ে সরাসরি দরখাস্ত করে বসলাম সেখানে। থ্রু প্রপার চ্যানালে গেলাম না, এই ভয়ে, যদি আটকে দেয় দরখাস্ত। ইন্টারভিউয়ের জন্য যথাসময়ে ডাক এলো সেখান থেকে। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলাম সেখানে পরীক্ষা দিয়ে। তাই চাকরি হয়ে গেল কলকাতার পোস্টাল একাউন্টস বিভাগে। মিলিটারি একাউন্টসের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দিলাম স্রেফ ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে। আমার ত্যাগপত্র গৃহীত হোলো কিনা, তার অপেক্ষা না করেই কলকাতায় চলে গেলাম নতুন চাকরিতে জয়েন করতে।

জি, পি, ও-র পাশে, কয়লাঘাট স্ট্রীটের ওপর একটা বড় বিল্ডিং-এ ছিল এই অফিস। সেটা ১৯৪৪ সালের শেষের কথা। ওখানে চারদিন কাজ করেই রাত্তির বেলায় কলকাতার সেই ঠুলিপরা লাইটের আলোতে

জীবন কাটাতে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। তখন চলছিল ব্ল্যাক-আউটের জমানা, দিনে ও রাতে মাঝে মাঝেই সাইরেন বেজে উঠত। সেটা ছিল আর এক বিপদ, দৌড় লাগিয়ে কাছাকাছি যে-কোনো ট্রেঞ্চের ভেতর শেল্টার নিতে হোতো। দোকানের সামনে ছিল বড় বড় ব্যাফল্-ওয়াল, বোমার টুকরোতে নিজের অঙ্গ যাতে ক্ষতবিক্ষত না হয় তা থেকে রক্ষা পাবার জন্য এবং বোমা ফাটার যে বিকট শব্দ, তাতে যাতে নিজের কানও ফেটে না যায়, সে থেকে খানিকটা মুক্ত থাকার উপায় হিসেবে।

মনে হোতো গোটা শহরটাই কালো আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে একেবারে কালোমুখ করে। রাস্তায় রাস্তায় সিভিলিয়ানদের চলাচল অপেক্ষা সৈন্যদের চলাফেরাতেই ছিল বেশি চাঞ্চল্য। সামরিক সাজে সৈন্যরা, বেশির ভাগই বৃটিশ সৈন্য, ফারপো, গ্র্যাণ্ড ও গ্রেট ঈস্টার্ণ-এর মতো হোটেলগুলোতে বসে খাদ্য উদরসাৎ করেই চলেছে। পানীয়ই বেশি। সারা দিনরাতই ভিড় সেখানে। সিভিলিয়ানরা ভয়ে ত্রাসে কেউ যেতোই না সেখানে। দিবারাত্র আকাশে উড়ছে খাকি রঙের আর্মি-প্লেন, হেলিকপ্টর। রাস্তায় রাস্তায় চলাফেরা করছে সৈন্যদের ট্রাক, জীপ ও কামান-বাহী গাড়ী।

ছোটবেলার দেখা সেই কলকাতার জ্বলজ্বলে চেহারাটাই মনে আঁকা ছিল আমার, কিন্তু তার সেই আলোময় অবয়ব যে এভাবে পাল্টে যাবে স্বপ্নেও ভাবিনি। শৈশবের দেখা কলকাতাতে চাকরি করব একদিন, এটাই ছিল অভিলাষ। কিন্তু রূপ-পাল্টে-যাওয়া কলকাতার রুক্ষ কর্কশ কালো চেহারাটা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছিলাম না। রাত্রে বাস-ট্রামগাড়ীগুলো চলছে কালো ঘোমটা পরে, রাস্তার বড় লাইট-গুলোও কালি দিয়ে লেপামোছা সে যেন এক অদ্ভুত মনে হচ্ছিল আমার। আর এক মুহূর্তও সেখানে থাকবার বাসনা ছিল না, মনটাই ভেঙ্গে গিয়েছিল কলকাতার কালো চেহারাটা দেখে। সুতরাং এই চাকরিরও শেষ-আঁচড় টেনে দিলাম চারদিনের মাথায়।

আমার ত্যাগপত্র দেখে, অফিসের যিনি হেড, তিনি খুবই ক্ষুব্ধ হলেন। বল্লেন, আপনি চাকরি করবেন না, এটাতে আমার আপত্তি করার কিছু নেই। কিন্তু আপনি মিছিমিছি একটা লোকের রুজি-রোজগারের পথ আটকে দিয়ে গেলেন।

তাঁর এসব কথা আমার বোধগম্য হোলো না। আমার ইস্তফাতে কার রোজগার বন্ধ হয়ে গেল ভেবে পেলাম না।

তিনি আবার বল্লেন, আপনি হয়ত জানেন না যে বেঙ্গলে যেসব

চাকরি খালি হয় তাতে হিন্দু-মুসলিমের জন্য আলাদা পার্সেন্টেজ অনুযায়ী রিজার্ভেশন করা থাকে। তাতে হিন্দুর যে কোটা ছিল, তা থেকেই আপনি চাকরিটা পেয়ে ছিলেন। কিন্তু এই খালি জায়গাতে তো আর কোনো লোক নিয়োগ করা যাবে না এখন। ভেক্যান্ট পড়ে থাকবে। একজন হিন্দুর চাকরি বিনা কারণে নষ্ট হোলো শুধু শুধু। আপনি জয়েন না করে, প্রথমেই যদি রিফুইজ করে দিতেন, তাহলে আমরা পরের জনকে নিতে পারতাম। এখন তো আর সেটা সম্ভব নয়। এটাই দুঃখ আমার।

তাঁর এই কথা শুনে আমার মনটা সত্যি খুব খারাপ হয়ে গেল। বেঙ্গলে যে আলাদা করে হিন্দু-মুসলিমের সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে, এটা আমার জানা ছিল না। চোখে আমার কে যেন একটা খোঁচা মারল। দুঃখ হোলো, সত্যি তো, আমার জন্য একজন বেকার হিন্দু ছেলের চাকরি হোতে গেল না। কিন্তু আমার পক্ষে যে এখানে থাকা আর সম্ভব ছিল না। আমার ইস্তফা গৃহীত হোলো। চারদিনের মাইনে না নিয়েই আমি সেই অফিস ছেড়ে দিলাম। পাটনায় চলে এলাম।

কলকাতা থেকেই আমি আমার পুরনো অফিসের সিনিয়র সুপারিন-টেনডেন্ট বরাটমশায়কে একটা টেলিগ্রাম করলাম—উইথড্র রেজিগনেশন, জয়েনিং শর্টলি।

টেলিগ্রামখানা ঠিক সময়েই তাঁর হাতে পৌঁছেছিল। এই অবস্থায় তিনি কি করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। সাংঘাতিক স্নেহ করতেন আমাকে, কিছু না বলে কয়ে, নীরবে কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যাওয়াতে খুবই দুঃখ পেয়েছিলেন। আবার ফিরে আসতে চাচ্ছি জেনে, খুবই আনন্দ হচ্ছিল তাঁর। কিন্তু ডিসিপ্লিনেরও একটা প্রশ্ন রয়েছে, কাজ থেকে নিবৃত্তি নিয়ে আবার ফিরে আসার প্রবৃত্তিতে, একটা সুরের অমিল রয়েছে সন্দেহ নেই; কিন্তু নিয়মানুবর্তিতার দোহাই দিয়ে একটু কর্কশ হওয়াও যেন একটা অশান্তির সৃষ্টি করছে তাঁর মনে। আমার টেলিগ্রামটা প্রত্যাখ্যান করতেও কষ্ট হচ্ছিল। ওপরওয়ালাকেও কী সব বুঝিয়ে তাঁকে নিজের মতে নিয়ে এসে আমাকে যাতে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে না দেওয়া হয় তার একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করে এলেন। পদত্যাগ তো আমি করেই গিয়েছিলাম সেটা অস্বীকার করে আমাকে আবার কর্মযুক্ত করা হবে কিনা, এটাই ছিল বড় প্রশ্ন।

আমাকে নিয়ে গেলেন তিনি ডেপুটি কন্ট্রোলারের কাছে। তিনি ছিলেন এস, কে, মুখার্জী—অডিট এণ্ড একাউন্টস সার্ভিসের লোক। ভারি

ভারিক্কি মেজাজের, সাহেবী আচার-ব্যবহার, সব সময় ইংরেজী বুলি মুখে। তবে বাঙালীর প্রতি প্রীতি ও দুর্বলতা যে ভেতরে জাগরূক ছিল সব সময় সেটা বোঝা গেল যখন তিনি আমাকে সামান্য ধমকধামক দিয়ে বল্লেন, এরকম ছেলেমানুষি ভবিষ্যতে আর করবেন না, তাহলে চাকরি রাখা দায় হবে।

তারপর বরাটমশায়কে বল্লেন, রেজিগনেশনের চিঠিখানা ও উইথ-ড্রয়ালের টেলিগ্রাম দুটোই চেপে দিন। তার বদলে এঁর কাছ থেকে কাঁদনের ছুটির দরখাস্ত নিয়ে নিন। ছুটি থাকলে সেটা মঞ্জুর করে দিন, না থাকলে লীভ উইদাউট পে করে দিন।

এইভাবে আবার আমার মিলিটারি একাউন্টস অফিসে পুনর্বাসের ব্যবস্থা হয়েছিল। বরাটমশায়ের সেই উদার মানবিকগুণের কথা ভুলবার নয়।

সেই থেকে ভালো মানুষের মতো রয়ে গেলাম এখানে। মনের মধ্যে আর কোনো চাঞ্চল্য না রেখেই একাগ্রচিত্তে ভালোভাবেই কাজ করে প্রতি-বচ্ছর একসেলেন্ট রিপোর্ট পেয়েছি।

এখানে এক নাগাড়ে প্রায় সাড়ে তিন বছর কাজ করার পর নিয়ম-মাফিক আমার বদলি হোলো জামালপুরে লোকাল অডিট অফিসে। যুদ্ধের সময় সেখানে বিরাট একটা অর্ডন্যান্স ডিপো ছিল, তার সঙ্গে ছিল আর্মস এণ্ড এমুনিশন ডিপো, স্যালভেজ ডিপো আর রিটার্ন্ড স্টোরস ডিপো। এসবের অডিটের জন্য ছিল সেখানে একজন লোকাল অফিসার।

আবার চেপে বসলাম ট্রেনে একটা সুটকেশ ও বেডিং নিয়ে। যাত্রার আর বিরাম নেই দেখছি। চরখির মতোই বোধহয় ঘুরতে হবে সারা-জীবন এদিক থেকে সেদিক। এতে চিত্তস্থৈর্য যে ধরে রাখা কঠিন।

জামালপুরে বদলির অর্ডারটা হাতে নিয়ে সমস্যা হোলো ওখানে কোথায় থাকা যাবে। শুনেছিলাম জামালপুরে একটা দোতলা বাড়ী ভাড়া নিয়ে মেস করে থাকে কয়েকজন আমাদের অডিট স্টাফ। বেশির ভাগই বাঙালী। ঠাকুর-চাকর আছে। বাড়ীটাও মুঙ্গের রোডের ওপরে। রেলওয়ের রোড ব্রীজ পেরিয়ে, পাহাড়ের দিকে রয়েছে মিলিটারির সব ডিপো। মোট কথা পাহাড়ের গা ঘেঁষে লেকের ধারে সৈন্যদের আস্তানা। এদিকটা তখন বলা হোতো সিভিল লাইন্‌স—রেলওয়ে ওয়ার্কশপের বড় বড় অফিসারদের বিরাট বিরাট কম্পাউণ্ড নিয়ে লাল লাল একতলা কোয়ার্টার।

প্রথম দিন রাত্রে ট্রেন থেকে নেমেই সেই মেসে গিয়ে উঠলাম আমরা দুজন---ব্যোমকেশ মুখার্জী ও আমি। এই দুইজনেই একসঙ্গে বদলি হয়েছিলাম ওখানে। পরদিনও সেখানেই ছিলাম। তবে একটা ঘরে বেশিজন মিলে ভিড় করে থাকাটা আমার পছন্দ হচ্ছিল না। তাই একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে আমি চলে এলাম একটা হোটেলে---প্যারাডাইজ হোটেল---জুবিলী ওয়েলের উত্তর দিকে। মুঙ্গের রোডের দশগজ দূরে এই হোটেলে, মাস হিসাবে খাওয়া ও থাকার খরচ চুক্তি করে। ব্যোমকেশ মেসেই রয়ে গেল।

সেই সময় দেশের শাসন ভার স্বদেশবাসীদের হাতে তুলে দিয়ে ইংরেজ শাসকদল যাব যাব করছে। কিন্তু যাবার আগে দেশটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে, লণ্ডভণ্ড করে এক একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে তুলছিল তারা হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাঁধিয়ে দিয়ে। পূর্বপ্রান্তে গ্রেট ক্যালকাটা রায়ট থেকে হোলো শুরু, পরে তার ছোঁয়া সংক্রামিত হোলো গিয়ে পুব-বাংলার গ্রামান্তরে। নোয়াখালি পর্যন্ত হোলো তার পরিব্যাপ্তি। হাজার হাজার নিরীহ হিন্দুর মৃত্যু যন্ত্রণার কাতরানি বিহারের মাটিকেও শিহরিত করে তুলছিল তখন। প্রতিহিংসার আগুনে তখন তাপিত এখানকার হিন্দুদের রক্ত। সভ্যতা মনুষ্যত্ব ও অহিংসার শত উপদেশ, মন্ত্রণা, যুক্তি সবই তখন অর্থহীন। প্রতিঘাতে উন্মত্ত তখন এরাও। মুঙ্গের জেলার জামালপুরেও পৌঁছল সেই উন্মাদনা। রাত্রির অন্ধকারে শুরু হোলো মারামারি। এক-দিকে হুসেনগঞ্জ অন্যদিকে রামপুর কলোনি---মুসলমান ও হিন্দুর দুটি আলাদা আলাদা এলাকা।

দূর থেকে কানে আসছে আল্লা-হো-আকবরের আকাশভেদী ধ্বনি। আগুনের লেলিহান শিখায় রাত্রির তমসাবৃত আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। দাউ দাউ করে জ্বলছে বাঁশের কাঠামোর ওপর দাঁড় করানো কিছু ঝুপড়িঘর। বড় বড় মশাল নিয়ে এগিয়ে আসছে রেলওয়ে কলোনির দিকে পরাক্রান্ত একটা দল। বিরাট তার সংখ্যা। অন্যদিকে রামপুর কলোনির মানুষও তৈরী মশাল হাতে বড় বড় বল্লম, ফলক বসানো লাঠিসোটা নিয়ে। টাঙ্গি হাতে কেউ। বলশালী বেশ। বড় বড় পালোয়ান তারা। কারুর হাতে রামদা, তলোয়ার, হকিস্টিক। মোট কথা কেউ নিরস্ত্র নয়। অন্যদল যেমন এগিয়ে আসছে দ্রুতগতিতে,---এই দলও তেমনি মুখো-মুখি হবার জন্য দাঁড়িয়ে এক লাইনে স্থির হয়ে। মাঝে মাঝে উচ্চারিত হচ্ছে জয় বজরঙ্গবলী। কলোনিতে প্রবেশের চেষ্টা করলেই শুরু

হয়ে যাবে দু-পক্ষের দাঙ্গা। তাতে কয়েকজনের লাশ মাটিতে পড়বে সন্দেহ নেই।

এমন দাঙ্গার দৃশ্য আমি সামনাসামনি জীবনে দেখিনি কখনো। হোটেল বাড়ীর দোতলার ছাদ থেকে আমরা দেখছি এইসব কাণ্ড। সাহস নেই এগিয়ে যাবার। যোগাড় করে রাখা হয়েছে ইটের বড় বড় খণ্ড ছাদের ওপরে। মিসাইল হিসাবে এগুলিই বর্ষিত হবে আক্রমণকারীদের ওপর যদি হোটেল আক্রমণ করতে আসে। এতে কিছু তো ঘায়েল হবে সন্দেহ নেই। তারপরে কপালে যা থাকে হবে।

এইসব দেখছি আর ভয়ে কাঁপছি আমরা সবাই। যে-কোনো মুহূর্তে ভয়ংকর একটা কিছু হয়ে যেতে পারে। আশেপাশে কোনো পুলিশেরও দেখা নেই যদিও মুঙ্গের রোডের ওপরেই রয়েছে জামালপুরের বড় থানা। তারাও যেন উধাও হয়ে গেছে কোথায়, দাঙ্গা-হাঙ্গামাকারীদের তাদের নিজস্ব অধিকার আপোষে লড়াই করে বুঝে নেবার জন্য। আইন-শৃঙখলার ধ্বজাধারী যারা তাদেরই যদি এই মনোবৃত্তি, তবে সারাদেশের অবস্থাটা কী দাঁড়াতে পারে, সেটা সহজেই অনুমেয়।

উত্তেজনাময় এই অবস্থা বেশ কিছুক্ষণ চলার পর দূর থেকে শোনা যাচ্ছিল করুণ আর্তনাদ। আর্তস্বর শুনে স্পষ্ট হচ্ছিল কিছু কিছু মানুষ ধরাশায়ী হচ্ছে অস্ত্রের আঘাতে। কার সর্বনাশ হোলো কে জানে। এইভাবে দাঙ্গা চলল প্রায় ঘন্টাখানেক। তারপরেই সব শান্ত। ধীরে ধীরে মারামারি কাটাকাটিতে নিরত দুটি দল বিশ্লিষ্ট হোলো যার যার এলাকাতে ফিরে যেয়ে। উত্তেজনায় তখন কাঁপছে গোটা জামালপুরের বাসিন্দা।

পরদিন ভোর হতেই রেলস্টেশনের স্টল থেকে সকালের একটা খবরের কাগজ কেনার জন্য বেরিয়েই দেখি বীভৎসভাবে পড়ে আছে কয়েকটা লাশ। অস্ত্রাঘাতে কারুর একটা পা খণ্ডিত হয়ে পড়ে আছে একটু দূরে, দেহটা অন্য পাশে। কারুর শরীরের মুণ্ডুটা গড়াগড়ি খাচ্ছে একটা নালার ওপর। এইভাবে কত লাশই যে পড়ে রয়েছে স্টেশন রোডের ওপর যা দেখে ভয়ে শিউরে উঠতে হয়। আর পারলাম না এগিয়ে যেতে স্টেশনে, এসব লাশ ডিঙ্গিয়ে পার হোতে হোতে।

মনে ভয়ও হোলো, কী জানি, এসময় যদি পুলিশের ভ্যান চলে আসে হঠাৎ, আমাকেই হয়ত একজন দুষ্কৃতকারী ভেবে তুলে নেবে গাড়ীতে। প্রয়োজনে তো এদের দেখা মেলা ভার। সব শান্ত হয়ে গেলে তবে শুরু হয় এদের হম্বিতম্বি। উত্ত্যক্ত করে তোলে কিছু নিরীহ মানুষকে।

কোনোরকমে কয়েকজনকে হাতে লোহার বালা পরিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে আদালতে হাজির করেই হবে তারা খালাস।

কয়েকদিনের ভেতরেই জামালপুর শান্ত হোলো ঠিকই। কাজকর্ম স্বাভাবিকভাবেই চালু হোলো, দোকানপাট সব খুলল এক এক করে। কিন্তু আমার প্যারাডাইজ হোটেলের মালিক বন্ধ করে দিল তার কারবার স্থায়ীভাবে আমাকে হোটেলচ্যুত করে।

আবার খুঁজে বের করতে হোলো একটা নতুন আবাস। একখানা ঘর খালি ছিল কাছেই, সেটাকে ভাড়ায় নিয়ে নিলাম। রান্নাবান্নার কোনো পাট রাখলাম না সেখানে; পাশেই ছিল একজন বাঙালী বিধবা মহিলার হোটেল, ওখানেই দু-বেলার দুটো মীলের ব্যবস্থা করে নিলাম। মাস গেলে তার হিসেব। তবে প্রতি মাসের শুরুতেই কিছু আগাম দিয়ে একটু পাকাপাকি হবার আশ্বাসন দিতে হোতো।

এই হোটেলটির নাম ছিল 'সেনস্ বোর্ডিং'। সাইনবোর্ডটি যে কতদিন আগের লেখা সেটা বোঝা কঠিন হোতো। পুরনো লোককে জিজ্ঞাসা করলে সহজেই চিনিয়ে দিত তারা এই হোটেল। নতুনেরা নামটিও জানত না।

একজন বিধবা মহিলাই ছিলেন এই হোটেলের মালিক। হোটেলটি খুলেছিলেন তাঁর স্বামী। তিনি মারা যাওয়ার পর একা নিজের ভরসাতেই চালিয়ে যাচ্ছেন এই হোটেল। এই হোটেলবাড়ীটি ছাড়াও, পাশেই আর একটা বাড়ী ভাড়া করেছিলেন কয়েকজন স্থায়ী বোর্ডারের জন্য, আর দুই একটা ঘর খালি রাখতেন ক্যাজুয়ালদের জন্য যারা নির্দিষ্ট মূল্য দিয়ে আহার ও বাসস্থান পেতে পারে কয়েকদিনের জন্য। এধরনের খদ্দেরের বেশির ভাগই ছিলেন রিপ্রেজেনটেটিভ শ্রেণীর। একটা সময় ছিল যখন এঁদের বলা হোতো ক্যানভাসার বাবু---ব্যাগ হাতে সওদা করে যেতেন তাঁরা দোকানে দোকানে। হাতে একটা বড় ব্যাগ দেখলে, এঁদের দূর থেকে চিহ্নিত করতে কোনো অসুবিধা হোতো না।

জামালপুরে সন্ধ্যার ট্রেনে পৌঁছে এঁরা বেশির ভাগই এই হোটেলে উঠতেন এবং পরের দিন, দিনে দিনে কাজটি সেরে পাড়ি দিতেন অন্যত্র। কাছেই ছিল মুঙ্গের শহর, সেটাই ছিল বড় ব্যবসা কেন্দ্র।

একজন রান্নার লোক ও দুজন চাকর নিয়েই হোলো বৃদ্ধার হোটেলের সংসার। দু-বেলা মীল সাপ্লাই করেন শুধু। সকালের চা-টা কেউ চাইলে তিনি দেন, তবে এটার কোনো নিয়ম বাঁধা নেই।

আমরা অফিসযাত্রীরা জনা পাঁচেক সংখ্যায় হবে, সকাল দশটার মধ্যেই ভাত খেয়ে অফিসে চলে যেতাম। এটাই ছিল আমাদের কাছে সুবিধাজনক, কিন্তু বৃদ্ধার পক্ষে হোতো অসুবিধার ব্যাপার। কারণ সাতসকালে তোড়জোড় করে শুধু আমাদের কজনের জন্য ভাতের ব্যবস্থা করতে বেশ হিমশিম খেতে হোতো তাঁকে। এটা তিনি নিজেই করে দিতেন কারণ রান্নার লোকটির সকালের ঘুমের জড়তা কাটাতে কাটাতেই হয়ে যেতো প্রায় ন'টা। কাজেই তার ওপরে ভরসা করে অফিসযাত্রীদের চলতে পারে না। বাকী বোর্ডাররা খেতেন বারোটার পর একসঙ্গে সার বেঁধে টেবিলে বসে।

খাওয়ানোর ব্যাপারে বৃদ্ধার নজর ছিল সবার ওপর সমান। সামনে দাঁড়িয়ে সবাইকে খাওয়াতেন এবং কার কী লাগবে, সেটা বুঝে রান্নার লোকটিকে বলতেন দিয়ে যেতে। মাস গেলে হিসেব হোতো কার কটা মীল খাওয়া হয়েছে। কেউ যদি কোনো মীল বাদ দিতে চান তবে তাঁকে সকালেই বলে দিতে হোতো।

এসব হিসেব রাখাটাখার ব্যাপারে পাচক ঠাকুরটিই ছিল বৃদ্ধার সবচেয়ে বড় সহযোগী। নিজে লেখাপড়া না জানার দরুন এর ওপরেই সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন উনি। এই কারণে পাচকটির হম্বিতম্বি ছিল বেশি-মাত্রায়, কথাবার্তাগুলোও ছিল রোখারোখা। কখনো কখনো মনে হোতো হোটেলটা বুঝি ওরই, বৃদ্ধা শুধু আজ্ঞাধীন ব্যক্তি। অনেক সময় আমার নজরেও পড়েছে বৃদ্ধা রান্নার লোকটিকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য এবং তার মর্জিটা যাতে ধীর থাকে সেই কারণে বড় বড় মাছের টুকরো, কখনো মুড়োটা-ন্যাজাটাও ওর পাতে দিয়ে দিতেন। চাকর-বাকরদের পাতে সেসব কখনো নাড়াচাড়া খাচ্ছে দেখিনি।

চাকর ছুটিতে গেলে এই মহিলাই কাড়িকাড়ি বাসন মাজতে বসতেন কুয়োর ধারে। এরজন্য পাচকটির কোনো সহানুভূতি ছিল বলে মনে হোতো না। বরং নিজের আরাম ও আয়েসের জন্য ছিল সর্বদাই সচেতন। অনাবশ্যক কারণে অসুখের ভান করে শুয়ে থাকতেও দেখেছি অনেক সময়। তখন এই মহিলাকেই রুগ্ন শরীরটাকে নিয়ে রান্নাবান্না সারতে হয়েছে। এতগুলো বোর্ডারের দুবেলা আহারের ব্যবস্থা ঠিক রাখা একটু-খানি কথা নয়।

এসব সত্ত্বেও বৃদ্ধা মহিলা হোটেলবাসীদের ওপর থাকতেন খুবই প্রসন্ন। বলতেন, এঁরাই তো আমার লক্ষ্মীর মতন, হোটেল-ব্যবসার মূল আধার তো খদ্দের। এঁদের খুশি না রাখলে কী করে চলবে? সবাই

তো আর সমান মেজাজের নয়, কেউ খিচিমিচি করে খাওয়া নিয়ে, এক-ধরনের তরকারি রোজ পাতে দেখলে। আবার কেউ নীরবে সোনামুখ করে, খেয়ে উঠে যায় যা দেওয়া হয় তা দিয়েই। কাজেই দু-রকমের খদ্দের দেখে আসছেন তিনি, আজ থেকে নয় তিরিশটি বছর ধরে যখন কর্তা এই হোটেলটি খুলেছিলেন তখন থেকেই।

এসব নিয়ে মাথা খারাপ করতে চান না তিনি, মুখ আলগাও করতে পারেন না। আজ দশ বছর ধরে মীলের রেটটাও বাড়াননি, যেমন ছিল তেমনি চলছে। অথচ জিনিসপত্তরের দাম আগের তুলনায় কত বেড়ে গেছে। এটা তো সবাই জানে।

বৃদ্ধা মানুষটি ছিলেন বড়ই নিরীহ। একা এই ছোট্ট মফঃস্বলী শহরে হোটেল চালিয়ে নিজের একটা পেটের দায় মেটাচ্ছেন আর কয়েকজনের অন্নসংস্থানও করে চলেছেন। অনেক খদ্দের আবার মাস গেলে হিসেব না চুকিয়েই পালিয়ে যায়, এরকমও হয়েছে। এ নিয়ে তিনি কোথায় দৌড়ো-দৌড়ি করবেন? বেশির ভাগ মীল-ভোগী রেলওয়ে ওয়ার্কশপের কিংবা অর্ডন্যান্স ডিপোতে কাজ করে। এরা দুবেলা মীল খেয়ে যায় এসে। থাকে অন্যত্র। বদলি যে তাদের লেগেই আছে, কে কখন আসবে যাবে তার খোঁজ রাখবেন তিনি কী করে? মেনে নিতেই হয় সেই অর্থক্ষতি। গোপীনাথ আছেন তাঁর ঘরের কুলুঙ্গিতে রাখা—সকাল-সন্ধ্যা যাঁকে ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করেন, তিনিই দেখবেন এসব।

এইভাবেই চলছিল সেনস্ বোর্ডিং-এর মফঃস্বলী ভোজনালয়। সকালের ট্রেন ও রাতের ট্রেন দেখে চড়ানো হোতো ভাতের হাঁড়ি—ক্যানভাসার-বাবুদের আসার প্রতীক্ষা করে। তা না হলেই তো ভাত বেশি হয়ে যাবে, ফেলে দিতে হবে। রাতের ভাতের সঙ্গে যে সেটা মিশিয়ে দেবেন তারও উপায় নেই। সোয়াদ জ্ঞানটা যে সবারই আছে, থু থু করবে সেই ভাত মুখে দিয়ে বাসিভাত মেশানো হয়েছে বলে।

দুবেলা মীল-ভোগীদের সমভিব্যাহারে আনন্দলহরীতে ভরা ছিল সেই জীবনযাত্রা। হোটেল ঘরের কিছু কিছু স্থায়ী আবাসীও ছিল এই আনন্দ-লহরের ভাগীদার। সবাই যে এখানে এসে জুটেছে নিজ বাস ছেড়ে চাকরি-সূত্রে, তাই একই বন্ধনে ছিল তারা আবদ্ধ। আবার যে-কোনো সময় বদলি হয়ে চলে যাবে অন্যত্র। সেই প্রত্যাশা নিয়েই থাকে তারা একচিত্ত হয়ে। প্রতীক্ষমান শুধু একটি আদেশের জন্য, তারপরেই আর এক নতুন স্থান, নতুন আবেগভরা জীবন।

সুখ-দুঃখের এই সমাদ্বন্দ্বের জীবনে হঠাৎই হোলো সম্পূর্ণ একটা বিষণ্ণভরা আপতকালের সৃষ্টি। আপতিক এই ঘটনার জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না। হোটেলবাসীর একজনের হোলো বসন্ত রোগ। একটু বাড়াবাড়িভাবেই। শরীরের কোনো অঙ্গই বাদ গেল না মসূরিকার বড় বড় গুটির আক্রমণ থেকে।

আজ প্রায় দশবছর ধরে এই হোটেলে একটা সীট নিয়ে আছে লোকটি। সবচেয়ে পুরনো হোটেলবাসী, এই বৃদ্ধার হেফাজতেই রয়েছে এখানে আসা থেকে। পুরুলিয়ার এক সুদূর গ্রামে বাস তার, গ্রাস আচ্ছাদনের ব্যবস্থা হয়েছিল এখানকার রেলওয়ে ওয়ার্কশপে কাজ নিয়ে। দেশের বাড়ীতে শুধু মা ও একটি ছেলে। স্ত্রী নেই। এই বৃদ্ধাকেই মা বলে সম্বোধন করে সে---মাতৃবৎ স্নেহটাও পেয়ে আসছে সেই কারণে।

হোটেলে হঠাৎ এই রোগের অনুপ্রবেশে অন্যান্যরা সবাই চিন্তিত। কী করবে ভেবে উঠতে পারছে না। বসন্তের নাম শুনেই কেঁপে উঠেছে সবাই। অনেকের পক্ষে এই রুগীর সঙ্গে বাস করাটা হয়ে পড়ল আশঙ্কাজনক। একে একে সবাই পালিয়ে গেল অন্যত্র হোটেল ছেড়ে। শেষ পর্যন্ত রান্নার লোকটিও, যার ওপর নির্ভর করে ছিলেন এই বৃদ্ধা, সেও।

হোটেলবাড়ীর সব ঘর খালি হয়ে গেল একে একে। নিত্যভোজী মীল আহারকারীরাও বন্ধ করল আসা-যাওয়া। আমার বন্ধু ব্যোমকেশ মুখার্জী, যার নামের উল্লেখ আগেই করেছিলাম, সে ও আমি শুধু রয়ে গেলাম এখানে। ব্যোমকেশ বেশ কয়েকমাস পরে মেস ছেড়ে, আমার সঙ্গে একই ঘরে শেয়ারে বাস করছিল, একথা আগে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম।

এই রোগাক্রান্ত মানুষটির সঙ্গে আমাদের দুজনের বেশ ভালোভাবেই সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। একে একে সবাই হোটেল ছেড়ে চলে যাচ্ছে জেনে সে কেঁদে ভেঙ্গে পড়ল। তোমরা দুজনেও কী আমাকে এই অবস্থায় ফেলে যাবে? অনেক ভরসা করে আছি তোমাদের দুজনের ওপর ভাই। আমার যে কেউ নেই কাছাকাছি যার সাহায্য পেতে পারি এখন। তোমরা কিন্তু যেও না আমাকে ছেড়ে, তাহলে আমি যে আর বাঁচব না।

আশ্বাস দিলাম আমরা দুজনেই। ভয় নেই আমরা পালাবো না হোটেল ছেড়ে আর সবার মতো। রোগটাকে ভয় করি ঠিকই, কিন্তু রুগীকে ঘৃণা করি না।

নিশ্চিন্ত হোলো সেই মানুষ। ভাবলে নিজের ঘরদোর ছেড়ে বিভুঁয়ে এসে

এমন করে সান্ত্বনা দেয় কজন? বার্লি, ফল ও অন্যান্য পথ্য যোগাড় করে আনি আমরা। ঘরে বসে গল্পগুজবও করি রুগীর সঙ্গে পালাপালি করে।

আর সেই বৃদ্ধা মহিলা, বলতে নেই, সে কী রুগীর সেবা। একেবারে নিজের মায়ের মতো এই রুগীর কাছে বসে সেবা করে চলেছেন দিবারাত্র। কী কী পথ্য এই ধরনের রুগীর প্রয়োজন সবই তৈরী করে নিয়ে আসেন নিজের হাতে। উঠিয়ে বসিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেন, যেন নিজের ছেলেকেই রোগ থেকে সুস্থ করে দেবার জন্য পণ করে বসে আছেন কাছে। এমন পুণ্যবতী না হোলে পরের ছেলেকে যাকে চেনা নেই, জানা নেই, তারজন্য কাতর হয়ে রয়েছেন সকাল-সন্ধ্যা।

এমন দৃশ্য না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না সে কথা। কে বলবে যে আপন মা'র চেয়ে তাঁর অপত্যস্নেহ কোন অংশে কম? ইনি যে নিজের সন্তানের সঙ্গে কোনো পার্থক্য না রেখেই স্বাভাবিক স্নেহ বর্ষিত করে চলেছেন নীরব সেবার ভেতর দিয়ে। একবারও উচ্চারণ করেননি রুগীকে—হাসপাতালে চলে যাও আমার ঘর ছেড়ে। আমি পারব না তোমাকে এই অবস্থায় এখানে ঠাঁই দিতে। সবাই যে হোটেল ছেড়ে চলে গেছে, এখন আমার চলবে কী করে তাহলে?

নিজের অত বড় আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে জেনেও মুখে একবারও বলেননি সেসব কথা। বরং নিজে অপমানিত অনাদৃত হয়েছেন লোকের কাছে, এমন রুগী হোটেলে রাখা হয়েছে বলে।

মনে মনে উচ্চারণ করেন তিনি কুলুঙ্গির দিকে চেয়ে, গোপীমোহনের ইচ্ছা হলে আবার ফিরে আসবে সবাই আমার হোটেলে। এখন যে তাঁরই ইচ্ছা, রোগার্ত মানুষটির সেবার ভার নেওয়ার। বিদেশে-বিভুঁয়ে পড়ে আছে বলে কী, তার কী কেউ থাকতে নেই কাছে? আমি তো রয়েছি, আমি যে মা। আমার একমাত্র ছেলেও যে এই রোগে প্রাণ দিয়েছিল। বাঁচাতে তো পারিনি তাকে। সেই দুঃখ যে আমার মনে এখনও রয়েছে বাবা।

এইসব কথা বলেন আর বৃদ্ধা মহিলা ডুকরে ডুকরে কাঁদেন আমাদের কাছে। একে পেটে ধরিনি ঠিকই, কিন্তু ছেলের মতনই তো আমার কাছে রয়েছে। এসে অবধি আমাকে যে ও মা বলেই ডেকেছে, কাজেই তার সেবা করব না আমি?

এই রুগীর ঘরে প্রতিদিন সন্ধ্যা হোলে ধূপধুনো জ্বেলে দিয়ে গেছেন। খাইয়ে-দাইয়ে রাত্রে মশারি টাঙিয়ে তবে তাঁর রাত্রির দায় শেষ হোতো।

একই ঘরে অন্য একটি তক্তাপোশে নিজে শুয়েছেন রাতের বেলা, যদি দরকার পড়ে হঠাৎ, দূরে থাকলে যে শুনতে পাব না সেই মা ডাক।

নিজভূমি ছেড়ে পরবাসে এসে এমন মা-জননী কজনের ভাগ্যে মেলে? ষোড়শ দেবীর চরণে মাথা খোড়াখুড়ি করেও বোধহয় এমন জনয়িত্রী অর্জন করা যায় না। জন্মান্তরের সুকর্মের ফলেই এটা লাভ হয় বলে অনেকের বিশ্বাস।

যদিও জন্মান্তরে বিশ্বাস নেই আমার, তবে মানুষের স্নেহভালোবাসার ওপর প্রত্যয়শীল আমি। এটা এমন একটা জিনিস যে কঠিন হৃদয়কেও গলিয়ে দিতে সক্ষম, সে-মানুষ যতই সংবেদনশীলরহিত হোক না কেন। মনুষ্যত্বের যে আবেদন, সেটা কোনো রীতিনীতির বা প্রবাসী অপ্রবাসীর পরিপ্রেক্ষিতে যাচাই করা চলে না। না হোতে পারে আপন-পরের ভেদাভেদ নিয়ে তার কোনো পরীক্ষা।

মানবতার স্থান যে অনেক উঁচুতে, এটা সহজে লাভ করা যায় না। সমুদ্রের বিরাটত্বে আমরা বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে থাকি, কিন্তু সেখানে যদি কোনো তরঙ্গ না থাকে তবে তার অস্তিত্বটাই যে বৃথা। তেমনি হৃদয়ের সুকোমল বৃত্তিগুলোর উন্মোচন যদি নাই ঘটে, তাহলে মানুষ হয়ে জন্মানোটাই তো নিরর্থক।

সরকারীভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান ঘটেছিল ১লা জানুয়ারী ১৯৪৬ সালে। বিরাট উৎকন্ঠা ও উত্তেজনার পর একটা মানসিক প্রশান্তি এলো সারা দেশে সবার মধ্যে। কিন্তু সেই সঙ্গে দুশ্চিন্তাও বেড়ে গেল অস্থায়ী চাকুরিজীবীদের যারা হাজারে হাজারে ঢুকেছিল নতুন নতুন বহু অফিসে যেসব যুদ্ধের উপলক্ষে খোলা হয়েছিল। এদের অদৃষ্ট-আকাশে দেখা দিল বিরাট কালোমেঘ। কর্মচ্যুতি ও পুনঃবেকারত্বের বিভীষিকা। যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ভারতের এক নতুন অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল এরা এবং বহু পরিবার জীবিত ছিল তাদের সেই অর্থে, সেখানে নেমে এলো নৈরাশ্য ও হতাশা। নিজের নৈষ্ঠিক আচরণে একটা বড় আঘাত এসে উপস্থিত হোলো। এই জটিল সমস্যা মেটাবার জন্য কেউ এগিয়ে আসেনি তখন। বড় বড় ইউনিয়ানেরও সৃষ্টি হয়নি সে সময় যারা এদের হয়ে লড়বে, চাকুরিতে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য ধর্না দেবে, স্লোগান হাঁকবে। নীরবে এক একজনে ডিসচার্জ সার্টিফিকেট

হাতে নিয়ে এবং ওয়ার-সার্ভিসের বেনিফিট্ বাবদ কিছু নগদ টাকা পকেটে পুরে, বেরিয়ে এলো লজ্জানত মুখে যার যার অফিস থেকে।

যেখানে যেখানে ওয়ার-অফিস খোলা হয়েছিল সেগুলো গুটিয়ে নেওয়া হোলো ধীরে ধীরে। বড় আকারে আরম্ভ হোলো লোক কমানোর প্রক্রিয়া এবং ব্যয় সংকোচের নানান ব্যবস্থা। যেখানে যত অর্ডন্যান্স ডিপো খোলা হয়েছিল, সেগুলোরও একে একে পরিসমাপ্তি করা হোলো। আমাদের সঙ্গে অডিট-স্টাফ যে কজন ছিলেন, তাঁদের অনেকেই সিভিল-অডিট অফিসে চলে গেলেন, কেউ রাঁচিতে, কেউ উড়িষ্যায়। অডিটের অভিজ্ঞতা ছিল বলে এঁদের এখানে পুনরায় অন্য পদে প্রতিষ্ঠিত করায় অসুবিধা হোলো না। আমার বদলির সম্ভাবনা হোলো কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম ডিপোর অডিট-অফিসে।

আবার যেতে হবে সেই কলকাতাতে যেখানে গিয়ে চাকরি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলাম আমি, সেই শহরের যুদ্ধকালীন কুরূপ চেহারাটার দুঃখে? না, আর যাওয়া চলে না সেখানে। তার আগেই চাকরির আর একটা বিকল্প ব্যবস্থা করে নিতে হবে আমাকে।

এটা স্পষ্ট ছিল যে, মিলিটারি একাউন্টসে চাকরি করলে সারা জীবন বদলি নিয়ে থাকতে হবে। এই অস্থিরতার জীবন নিয়ে আমার চলবে না কখনো। স্থিরতা নিয়ে থাকতে হবে কোথাও। স্থিতিশীলতা না পেলে যে জীবনে কিছুই করা যাবে না। এতে অন্ননিমিত্তিকার চিন্তাভাবনা দূর হবে ঠিকই, কিন্তু অন্নগত প্রাণটাই তো বড় কথা নয়। একটা বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ থাকলে হৃদয়ের আবেগগুলো যে যাবে বিলুপ্ত হয়ে। সাহিত্য নির্মাণের যে আকাঙ্ক্ষা আমার অন্তঃস্থলে নিশপিশ করছে অনবরত, তার প্রতি নির্মম হওয়া চলে না। সে যে চাপযুক্ত হয়ে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় মারা যাবে একদিন!

এইসব কারণে মতি স্থির করে ফেললাম, যে ভাবেই হোক পাটনায় আমাকে ফিরে আসতেই হবে। কলকাতায় বদলি করলে এই চাকরিতে ছেদ টানতেই হবে। ভাগ্যক্রমে পাটনা সেক্রেটেরিয়েটে চাকরি পেয়ে গেলাম। একটা ছেড়ে আর একটা। স্থিরতা এলো এবার আমার চাকুরিজীবনে। আর বদলি নয় কোথাও, শঙ্কান্বিত হয়ে থাকতে হবে না আর বদলির সম্ভাবনা নিয়ে। একেবারে পাকাপাকি চাকরি—পাটনার মাটি ছেড়ে আর যেতে হবে না কোথাও অন্নবস্ত্রের সন্ধানে। এখন থেকে হবে পরিপূর্ণ নিশ্চিত, স্থিতিশীল জীবন।

আমি যে সময়ে সেক্রেটেরিয়েটে প্রবেশ করেছিলাম, তখন দেশ সবেমাত্র স্বাধীনতা লাভ করেছে। সেক্রেটেরিয়েটের অর্থ বিভাগে এসে যোগদান করেছিলাম অক্টোবর ১৯৪৭ সালে। ভূগোল আর ইতিহাসই ছিল কলেজে আমার মুখ্য বিষয়। অর্থশাস্ত্রের ধারে ঘেঁষিনি কখনো, সেই মানুষটিকে দেওয়া হোলো কিনা অর্থ বিভাগের একটি পদে। সরকারী বিভাগগুলোর মধ্যে যার স্থান ছিল সবচেয়ে সেরা। পুরো রাজ্যের আর্থিক ব্যয়ব্যবস্থার নিশানধারী ছিল এই বিভাগ বৃটিশ আমলে। যেমনটি আদেশ হোতো এই বিভাগের সেইভাবে অন্য বিভাগগুলোকে খরচ করতে হোতো। একটা খাড়া দণ্ড হাতে থাকত সবসময় এই বিভাগের। অর্থভাণ্ডারীদের সেটাই হোলো প্রধান কর্ম। যেমন আয়, সেই অনুযায়ী হবে ব্যয় বরং কিছু উদ্বৃত্ত রাখাটাই বিচক্ষণতার কাজ। অন্তত বৃটিশ শাসনকালে সেটাই ছিল আর্থিক ব্যয়ব্যবস্থার রূপচিন্তনের একমাত্র বিভাগ। এর ওপরে কারুর শাসানি চলবে না, না চলবে কোনো বিরূপ সমালোচনা। বাজেট-বরাদ্দের বাইরে একটা কড়িও অতিরিক্ত খরচ করা হবে না। এমনটাই ছিল আর্থিক অনুশাসন। আজ তার রূপান্তরিত বিষম ও অস্থির চেহারাটা দেখলে কান্না পায়।

১৫ই অগাস্ট ১৯৪৭ সালে, সেক্রেটেরিয়েটের সবুজ ময়দানে, বৃটিশ রাজপতাকা ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে, সেখানে উত্তোলিত হোলো ভারতের জাতীয় পতাকা। দাসত্বের নোংরা জঞ্জালভরা অফিসের ঘরদোর ঝাড়পোছ করে বিশুদ্ধভাবে, ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নতুন বেশে সজ্জিত হোলো সেসব। বড় বড় অফিসারদের চেম্বার, মন্ত্রীদের কামরা যার যার রুচি অনুযায়ী নিয়মলঙ্ঘন করে টেবিল-চেয়ার, কার্পেট, দরজার পর্দা, এসবেরও একপ্রস্থ পরিবর্তন করা হোলো।

কিছু কিছু মোসাহেবও গজিয়ে উঠল রাতারাতি যারা এতকাল নীরব হয়ে ছিল বৃটিশ রাজপুরুষদের লাল চোখ দেখে। স্বাধীনতা পাওয়ার এক মাস আগেও কিন্তু এরা ভয়ে বড় বড় সচিব, উপসচিব এবং আণ্ডার সেক্রেটারির ঘরের দোরগোড়াতেও পা ফেলতে সাহস করত না। যে-কোনো সাহেবকে সেক্রেটেরিয়েটের করিডরে দেখলে সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়ত যার যার অফিস-হলে। সবসময় সন্ত্রস্ত থাকত শাসন-শৃঙ্খলার শাস্তিমূলক ব্যবস্থার ভয়ে। ওৎ পেতে ছিল এই মোসাহেবের দল এই মুহূর্তটির জন্য। তারা যেন হঠাৎ খুঁটি-খোলা মুক্ত গাভীর মতো অধীর আগ্রহে মেতে উঠল মোসাহেবির কাজে। অফিস-মনিবদের এবং মন্ত্রীদের বাড়ীতে হাজির হয়ে গেল তাঁদের তদ্বির তৎপরতার কাজ। তাঁদের

ভোগসুখ ও ইন্দ্রিয়সুখ দুটো কাজেই তারা দৃঢ়সন্ধ।

হঠাৎ এধরনের একটা শ্রেণীর আবির্ভাবে কিছু দিশীসাহেব ও কংগ্রেসী মন্ত্রীরাও খুশী। খুশী তাঁদের মেমসাহেবরাও। এমনটিই তো চাই, তবেই না শুধু চোখের ইশারায় যার যার স্বার্থসিদ্ধি হবে অচিরাৎ। কোনো কিছু সংগ্রহের জন্য ভাবতে হবে না এক মুহূর্তও। নিজের পকেট থেকে টাকা বের করারও প্রয়োজন নেই, সবই ম্যানেজ করে দেবে এই মোসাহেবের দল। টাকার জন্য তো যার যার অফিসের ফাণ্ড রয়েছে, সেখান থেকেই হবে সব খরচপত্তর। শুধু একটা বাফ্‌শীট সাহেবদের কাছ থেকে সই করিয়ে নিয়ে এলেই হোলো, এটা চাই, ওটা চাই লিখে। এসবই যে দরকার সরকারী কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে হোলে। এতদিন সেটা ব্যাহত ছিল কড়া শাসনের ভয়ে।

স্বাধীন ভারতে মন্ত্রীরা ছিলেন নতুন। তাঁদের জানা নেই অফিসের হালচাল। কোন ফাইলে কী করতে হবে সেই ব্যাপারেও অজ্ঞ। রাজনীতিতে অভিজ্ঞ হোলে হবে কী, প্রশাসনের ব্যাপারে ও অফিস চালনার কাজে ছিলেন সম্পূর্ণ অপরিচিত। কাজেই প্রয়োজন রয়েছে পথপ্রদর্শকের। চাই কয়েকজন পরামর্শদাতার। বেশ সুবিধা হোলো এই সব ধুরন্ধর চাটুকার পেয়ে। এমনিতেই তাঁরা ছিলেন বেশ চালাকচতুর, তাই মন্ত্রীদের ভালোবাসা পেয়ে পেয়ে গেলেন এক একজন ভালো ভালো পদ। কেউ প্রাইভেট সেক্রেটারি, কেউ পার্সোনাল এসিসটেন্ট প্রভৃতিতে। এঁরাই তখন মন্ত্রীর নিজস্ব অফিসে হোলেন হর্তাকর্তা। অঙ্গাবরণের মতো মন্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে ঘোরেন নতুন নতুন মোটরগাড়ীতে বনেটের ওপর ত্রিবর্ণ পতাকা উড়িয়ে। মন্ত্রীরা যতটা না চান তার চেয়ে বেশী বিস্তীর্ণ এঁদের আকাঙ্ক্ষা, অহংকারে তাঁরা অন্ধ, অস্মিতায় অস্বচ্ছ হয়ে থাকে দৃষ্টি; রোজই গাদা গাদা বাফশীট আসে মন্ত্রীর স্বাক্ষরিত হয়ে, কিংবা নিজেরাই লিখে পাঠান মন্ত্রীর বকলমে। কার সাধ্যি সেসবের হুকুম তামিল না করার? তাহলে যে নিজেকেই ভোগান্তির চরমে পৌঁছতে হবে।

সুতরাং বেশ কিছুদিন চলল বৃটিশ রাজতন্ত্রের বদলে চাটুকারতন্ত্র। সব কিছুতেই চলে এদের ফপরদালালি, নতুন নতুন ফতোয়া রোজই আসে বিভাগীয় প্রধানদের কাছে। চিরকাল চালিয়ে এসেছেন শাসন এই সচিবের দল বুরোক্রেসির বেশে ভয়ংকর তেজ ও বিক্রম নিয়ে, শেষ পর্যন্ত কিনা নাজেহাল হোতে হবে এই ফড়ফড়েবাজ চাটুকারদের কাছে যারা মন্ত্রীদের ছত্রধারী হয়ে ফুক্কুড়িতে পরিণত করতে চাইছে প্রশাসনকে। পুরনো আই, সি, এস, যাঁরা তাঁরা বুঝতে পারলেন, এইভাবে যদি মন্ত্রীরা পরিচালিত

হন শুধু তাঁবেদারের হাতের তামাতুলসী নিয়ে, তাহলে ভবিষ্যতে প্রশাসন বলে কিছু থাকবে না। এখনই ভালোভাবে কড়াকড়িতে বাঁধতে হবে সবাইকে নিয়মকানুনে। শাসনের বন্ধন যদি আলগা হয়ে যায় একবার, তাহলে কোনোদিন তাকে কঠিন করা চলবে না। মন্ত্রী আজ আছেন, কাল নাও থাকতে পারেন, কিন্তু সরকার তো চিরস্থায়ী, প্রশাসনও তাই। সুতরাং এইভাবে নীরব দর্শক সেজে বিশৃঙ্খল কাণ্ডকারখানা দেখা চলবে না। অবহেলিত হয়ে তবে থাকতে হবে অধিকারচ্যুত হয়ে মান-মর্যাদা খুইয়ে।

চীফ সেক্রেটারি তখন এল, পি, সিং। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ—বিহার কেশরী নামে খ্যাতমান। পশুরাজের মতোই তাঁর বীরগর্জন। তিনিও বুঝতে পারছিলেন প্রশাসন আলগা হোতে চলেছে, এখনই রাশটানা দরকার। অগাধ বিশ্বাস চীফ সেক্রেটারির ওপর। তাঁর ওপরেই সব দায়িত্ব দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। হুকুম হোলো সব বিভাগেরই গুরুত্ব-পূর্ণ ফাইল যাবে এঁর কাছে। তাঁকে না দেখিয়ে সরকারী কোনো পলিসি-মীমাংসা নেওয়া চলবে না। আবার এলো দৃঢ়-হাতে শাসন পরিচালনার ভার বুরোক্রেটসদের হাতে। হঠাৎ যেন ছুট পেয়ে গিয়েছিল সবাই, এলো-মেলো ডিসিপ্লিন, সরকারী অর্থের ওপর লোলুপদৃষ্টি, যেমন তেমন করে চলছে সরকারী খরচপত্তর, ধনাকাঙ্ক্ষায় সবাই যেন মেতে উঠেছে। স্বাধীনতার অর্থ এসব তাঁবেদাররা মনে করেছিল একটা ঢিলেঢালা প্রশাসন, শ্লথগতিতে চলবে ফাইলপত্তর—কোনো শৃঙ্খলার প্রয়োজন নেই আর। কিছু করে খাও সবাই, যে যেখানে আছ, সেখান থেকে।

সেক্রেটেরিয়েটের চাকরির প্রথম দিন তাই অফিসে জয়েন করে বড় হলঘরটা দেখে আমার মনে হয়েছিল ফাঁকা ফাঁকা। অজস্র টেবিল আছে চেয়ার আছে, কিছু কিছু ফাইলও সাজানো টেবিলের ওপর, তবে মানুষগুলো গেল কোথায়? কয়েকটি মাথাই দেখি সেখানে ঘাড় নীচু করে কাজ করে চলেছে। পাশের লোকটিকে কদিন পরে জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কজন রোজ যায় কোথায়? অফিস টাইমে? গাদা গাদা ফাইল পড়ে থাকে টেবিলে সেগুলোর কী দেখার কেউ নেই?

উত্তর এসেছিল, যার যার স্বজাতি-মন্ত্রীর দরবারে হাজিরা দিতে। এটা প্রতিদিনকার ব্যাপার।

অবাক হয়ে গিয়েছিলাম উত্তর শুনে। নিজে কাজ করেছি আমি অফিসে, ডিসিপ্লিনের কড়া পরিবেশে থেকে এইভাবে টেবিল ছেড়ে ঘন্টার

পর ঘন্টা গায়েব থাকা চিন্তাই করা যায় না। একটা মুভমেন্ট রেজিস্টার থাকত সেকশন হেডের কাছে, সেটাতে লিখে যেতে হোতো কোথায় যাচ্ছি, কী কারণে, তার সময়টুকু পর্যন্ত উল্লেখ করতে হোতো। কারণ মাঝে মাঝেই অফিসের হেড যিনি তিনি ঘুরে যেতেন প্রত্যেক রুমে। চেয়ার খালি দেখলেই তার কৈফিয়ৎ তলব হোতো। এমনটি ছিল কড়া শাসন।

এখানে যে দেখছি কারুর কিছু বলার নেই। হাজিরা দিয়ে বেরিয়ে গেলেই হোলো। কেউ জিজ্ঞাসা করলে তক্ষুণি যে একটা বাফ্‌শীট নিয়ে হাজির হয় ওপরওয়ালার কাছে, মন্ত্রী ডেকেছিলেন, তাই যেতে হয়েছিল সেখানে।

এর ওপর কারুর কিছু বলার নেই, কওয়ারও নেই। এইভাবে শ্রেণীগত কয়েকটা গ্রুপ তৈরী হোলো অফিসে। যাদব যাদবকে টানে, রাজপুত রাজপুতকে, ভূমিহার ভূমিহারকে, কায়স্থ কায়স্থকে। এইভাবে টানাটানির খেলা শুরু হয়েছিল তখন থেকেই। মন্ত্রী, রাজমন্ত্রী, উপমন্ত্রী সবাই খুঁজে নেন তাঁদের জাতভাইয়াদের। মন্ত্রীদের বাড়ীতেও যার যার ছোটখাটো অফিস তৈরী হোলো নিজের নিজের প্রিয় জাতভাইদের নিয়ে। অসম্ভব বোলবলা তাদের তখন, স্তম্ভিত হোতে হোতো এদের নির্লজ্জ কার্য-কলাপ দেখে। আজ এটা চাই, কাল ওটা চাই, রোজই লেগে আছে তার পেছনে কিছু মানুষ।

শক্ত হাতে আবার ধরে ফেললেন শাসনতন্ত্র, প্রায় ছ'ফুট লম্বা বৃটিশ আমলের দুর্ধর্ষ আই, সী, এস,---এল, পি, সিং। গম্ভীর-প্রকৃতি মানুষ, ভারী শক্ত মেজাজের। নিয়মতন্ত্রকে নিয়ে এলেন একেবারে নিজের হাতে। কোথাও কোনো ঢিলেমি চলবে না, কাজে কোনো অখ্যাতি নয়, সুনাম চাই। দুর্নীতিপরায়ণদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে। প্রত্যেক বিভাগের কাজের ফিরিস্তি দিতে হবে তাঁকে পনেরো দিন অন্তর---কোথায় কোন ফাইল আটকে আছে, তার চাই হিসেব।

বিভাগীয় সচিবরাও ত্রস্ত। সকাল ন'টা থেকে অফিসে আসার নিয়ম বড় সাহেবদের, সেটার যেন কোনো উল্লংঘন না হয়। দুপুরে লাঞ্চের বরাদ্দ সময়টুকুর বাইরে যেন মুহূর্তেরও দেরি না হয়। টেলিফোন করলেই যেন পাওয়া যায় তাঁদের যার যার অফিস-রুমে।

সন্ধ্যার পরেও সব অফিসার বসে থাকেন নিজের ঘরে---যতক্ষণ চীফ সেক্রেটারি আছেন অফিসে তাঁদেরও থাকতে হবে ততক্ষণ। কোন্ ফাইল কার সঙ্গে আলোচনা করতে হবে ঠিক তো থাকে না। তাই তাঁরাও বসে থাকেন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নীরব হয়ে, কখন চীফ অফিস ছাড়বেন

সেই প্রতীক্ষায়। কাউকে বাইরে টুরে যেতে হোলে তার আগে চীফ সেক্রেটারির অনুমোদন চাই। যখন খুশি তখন বাইরে বেরিয়ে গেলেই চলবে না। কী কাজ টুরে, সেটাও জানা দরকার। নিষ্প্রয়োজনে কোনো টুর নয়।

এইভাবে শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরে ফেল্লেন প্রশাসনকে, যেটা হঠাৎই ঢিলেঢালা হয়ে পড়েছিল। অনেকের মুখ ভার হোলো ঠিকই, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ নিশ্চিন্ত হলেন তাঁর প্রশাসন পুনরায় সংযমে বাঁধা হয়েছে দেখে।

কোনো কোনো মন্ত্রী যে এতে ক্ষুব্ধ না হয়েছিলেন এমন নয়, এই সব বাড়াবাড়িতে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ নীরব, কোনো অভিযোগই শুনলেন না তাঁদের। প্রশাসন একতন্ত্রযুক্ত না হোলে যে চলবে না, তা না হোলে ধসে পড়বে যে একদিন। তার পরিণাম যে হবে আরো ভয়ংকর।

কয়েক বছর বাদে সেটা ধসে পড়ল ঠিকই। ললন প্রসাদ সিং-এর বিহার থেকে দিল্লীতে বদলিটাই হোলো কাল। কেন্দ্র সরকারের গৃহ-মন্ত্রণালয়ের ভার সামলাতে গিয়ে এখানকার গৃহকলহ গেল বেড়ে। দুর্বল হয়ে পড়ল প্রশাসন। ততদিনে শ্রীকৃষ্ণ সিংহ-ও গত হয়েছেন। আবার শুরু হোলো সেই অস্থিরতা, আশকারা পেয়ে কিছু লোক হয়ে পড়ল দুর্মদ, অসদাচারণ হয়ে পড়ল একটা স্বাভাবিক অবস্থা। দুর্নীতি গ্রাস করল সর্বত্র, দুর্ভোগ বেড়ে গেল সৎ কর্মচারীদের।

অফিসে আসে না কেউ আর সময়মত। এলেও পাত্তা নেই তাদের, কোথায় গেছে কেউ জানে না সেটা। অত বড় যে একটা ক্লক-টাওয়ার, সময়ের ঘোষণা করছে এক ঘন্টা অন্তর প্রকাণ্ড ঘন্টার ওপর হাতুড়ি হেনে, সেটাও পারছে না আর সেক্রেটেরিয়েটের বাবুদের মনে করিয়ে দিতে তাদের সময়ানুবর্তিতার কথাটা—আগে যেমন ঘড়ির কাঁটা ধরে আমলারা অফিসে আসতেন এবং ফিরে যেতেন, একটুও এদিক-ওদিক হবার জো ছিল না। এখন সেসবের কেউ তোয়াক্কা রাখে না বিশেষ। এখন দেশ যে হয়েছে স্বাধীন, ঘড়ির গোলাম হোতে হবে কোন দুঃখে?

কাজেই তাঁরা অফিসে আসেন এখন ধীরে সুস্থে আয়াস করে, রাস্তায় দু-চার জায়গায় দাঁড়িয়ে পান চিবোতে চিবোতে। তারপর ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে অফিসে ঢোকা। কেউ আসেন বেলা এগারোটায়, কেউ বা তারও পরে।

কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলে উঠবে, একটা জরুরী কাজ ছিল যার জন্য 'থোরী সী দের'।

ভালো, খুব ভালো কথা। এটা না হয় ক্ষমাঘেন্না করে মেনে নেওয়া হোলো। এবার তো চটপট কাজে গিয়ে বোসো। সেটি কিন্তু হবার নয়। আর্জেন্ট, ইমিডিয়েট লাল-নীলফ্ল্যাগ-আঁটা ফাইলগুলো পাহাড়-প্রমাণ পড়ে থাকলে কী হবে, বাবুটি প্রথমেই হাজিরা খাতায় সই করে (সেটা অবশ্য লেখা থাকবে দশটা) দৌড়বেন তাঁর নেচারস্-কল সামলাতে। সেটা শেষ করে কাছা সামলাতে সামলাতে অফিসঘরে ঢুকে যদি দেখেন দুই-একজন মক্কেল তাঁরই আশায় অপেক্ষমান টেবিলের কাছে, সেটা দেখে ভারি সন্তুষ্ট হয়ে উঠবেন তিনি। বউনিটা ভালোই হবে আজ।

মক্কেলকে দেখে তিনি খুব ব্যস্ত সমস্ত হয়ে মুখখানা একটু অস্বাভাবিক গম্ভীর করে টেবিলের ফাইলগুলো এমনভাবে নাড়াচাড়া করতে থাকবেন যাতে মনে হবে তিনি একটা জরুরী ফাইল খোঁজাখুঁজি করছেন, যেটা এক্ষুণি না করলেই নয়। সুতরাং এখন তাঁকে ডিসটার্ব করা চলবে না।

মক্কেল যে তারই অপেক্ষায় দশটা থেকে বসে আছেন সেসবের কেয়ার না করে তিনি তাঁকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে চলবেন। এই ধারণা নিয়ে তিনি অন্য ফাইলে একটা লোকদেখানি ব্যস্ততার মনোভাব নিয়ে কাজে লেগে যাবেন। মক্কেলকে অগ্রাহ্য করার অন্তরালের ইচ্ছাটা আর কিছুই নয়, একটু রেট্-টা বাড়ুক

মক্কেলের হাতে অনেক বাড়তি কাজ আছে বাইরে। মফঃস্বল থেকে এসেছেন তিনি শহরে, নানা কাজের ফিরিস্তি নিয়ে। এক জায়গায় বেশি দেরি করার উপায় নেই। জড়ানো গলায়, স্বরটা একটু খাদে নামিয়ে মক্কেল বলে বসলেন, ওঁর কাজটা যাতে আজই হয়ে যায়। শাম্ কী গাড়ীতে তাঁকে ফিরতে হবে।

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু রেট্ বেড়ে যাবে বাবুর। তিনি বলবেন, অত কুইক ডিসপোজাল কী করে সম্ভব আজ? এর চেয়ে কত পুরনো ফাইল পড়ে আছে টেবিলে। এতো ওভার-লোড্ নিয়ে কাজ করা যায় না। কাজেই মক্কেলের কাজটা আজকেই হয়ে যাওয়ার কথাটা ভাবতেই পারছেন না। অন্তত সাত দিন তো লেগেই যাবে আরো, ওই ফাইলের পালা আসতে।

একথা শুনে মক্কেলের আক্কেল তো গুড়ুম, শিবনেত্র হবার উপক্রম। পালাই পালাই ভাব না করে ঝটিতি বলে বসলেন তিনি, কোনো উপায় করুন ভাইয়া। তা না হোলে আমার যে অনেক নুকশান হয়ে যাবে। এখানে সাত দিন বসে থাকলে আমার যে হোটেলের খরচ বেড়ে যাবে। তাছাড়া আমার সঙ্গে এসেছেন কয়েকজন জাত ব্রাদার এখানে ডাক্তার

দেখানোর জন্য। ওদের তো একা ফিরে যেতে বলা যেতে পারে না। তিনি নিজেও অনেক কাজ ফেলে চলে এসেছেন হঠাৎ, ওসব দেখা-শোনার ব্যবস্থাও করে আসা হয়নি। কাজেই লস্ আর লস্।

এইসব নানা কথা ভেবে মক্কেল দুম করে কী একটা বলে বসলেন বাবুটিকে ফিসফিস করে।

অমনি সব আলো ঝিলিমিলি করে উঠল। সিগ্‌নাল ক্লীয়ার। গাড়ী মানে, ফাইলটি, এবার চলমান হবে, নিশ্চয় চলবে, কোথাও আটকাবে না। সব স্টেশনেই গ্রীন-ফ্ল্যাগ দেখে পার হয়ে যাবে মেল-ট্রেনের মতো।

তবে হ্যাঁ। তার আগে একটু চা-মিষ্টি খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নেওয়া দরকার। অনেকক্ষণ চা পড়েনি পেটে। ওটা না হোলে যে সহজে শিবদর্শন হয় না। কাজ হাসিল করতে হোলে—গো থ্রু ওয়ানস্ স্টমাক, এটাই যে আজকালকার রীতিনীতি।

সুতরাং একটু বাইরে চলুন। সেক্রেটেরিয়েটের বাইরে যেখানে একটা বিরাট বাজার গড়ে উঠেছে সেখানে। শ'য়ে শ'য়ে লোকের ভীড় সেখানে। কোথায় লাগে আপনার পাটনার নিউ মার্কেট? বিজনেস ট্রানজাকশন রোজ এখানে বেলা দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। টাকার লেনদেন এক পকেট থেকে অন্য পকেটে তেমনি শ'য়ে শ'য়ে।

এই বাজারে বসে গাঁজায় দম দিতে চান তাও পাবেন। তাড়ি খেতে চান সেটাও পাবেন, একেবারে পিওর আসমানি—অর্থাৎ সবেমাত্র তাল গাছ থেকে নামানো হয়েছে—একটু গাঁজানো—মাটির হাঁড়ির গা বেয়ে ফেনা নেমে আসছে কেবল। আপনার আদেশ হোলে কাঁচের গেলাসে ঢেলে দেবে। হাঁড়িতে মুখ সাটিয়ে টানতে হবে না চোঁ চোঁ করে। পুরোপুরি আভিজাতিক—শুধু স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য।

ওসবের যদি শখ না থাকে তবে অন্য পানীয় রয়েছে—লেবু-চা, পিওর-চা, দুধ বেশি দিয়ে এলাচ-দারচিনি দেওয়া পাঞ্জাবি-চা—কফি অর্ডিনারি, কফি এক্স্‌প্রেসো। আপনার তৃষ্ণা যদি এতো সবেও না মেটে তবে মিষ্টি মুখ করুন। হ্যাঁ, শুধু মিষ্টি খান, পেট ভরে খান। বড়বাজারের রস-গোল্লাও হার মেনে যাবে এখানে। আপনার পেট তো ভরবেই। শরীরে প্রোটিনও লাগবে। একেবারে মিল্কমেড-ছানা। ছানার নানারকম মিষ্টি—রসগোল্লা, রাজভোগ, ল্যাংচা—সাইজ এক একটার সাংঘাতিক, মেগাটন বোমাও হার মানবে সেখানে।

আপনার খাওয়া দিয়ে কথা। দাম সে তো পরে হবে। তাছাড়া আপনার তো লাগছে না গায়ে। সেটা মক্কেলের ব্যাপার, আপনার অত

চিন্তা কীসের? দম নিয়ে লেগে যান নিজের কাজে, যতটা পারেন টেনে নিন মুখ দিয়ে। মুখে যদি অত মিষ্টি ভালো না লাগে, তবে নোনতা কিছু খেয়ে নিন তার সঙ্গে। তারপর আবার সহজেই দু-চারটা মিষ্টি গলাধঃ-করণ করা চলবে।

মিষ্টি ভালো লাগে না, পেচ্ছাপে চিনি ধরা পড়েছে? বেশ তো তবে ঢুকে পড়ুন চপ-কাটলেট-অমলেটের রেঁস্তরায়। সেখানে মিষ্টির কোনো কারবার নেই, যা চাইবেন, তক্ষুণি গরম-গরম ভেজে প্লেটে সাজিয়ে দেবে আপনার সামনে। কয়েক জোড়া উড়িয়ে দিতে আপনার বাবুটির বেশিক্ষণ লাগবে না। তবে বাবুটির সঙ্গে যদি আর কোনো ইয়ার-দোস্ত না থাকে তবে তো আপনার ভাগ্য ভালো জানবেন। অল্পেতেই কাজ সারতে পার-বেন। সাধারণত এরা একা আসে না এই বাজারে, দুই একজন সঙ্গী সাথী থাকেই।

এরপর আপনার বাবুটি গালে হাত দিয়ে কী যেন ভাবছেন। আপনি যদি মুখ ফসকে কিছু জিজ্ঞাসা করেন, কী ভাবছেন? তবিয়ত ঠিক আছে তো?

অমনি আপনার বাবুটি হেসে ফেলে বলবেন, না, না, সেসব ঠিক আছে। সকাল থেকে এতো কাজে ব্যস্ত ছিলাম যে দাড়িটা পর্যন্ত কামিয়ে উঠতে পারিনি। কাজেই ভাবছি, অফিস থেকে যখন একবার বেরিয়েছি, ও কাজটা সেরেই ফেলি।

আপনি হয়ত ভাবছেন, সেক্রেটেরিয়েটের বাজারে এ-কী করে সম্ভব? সেলুনগুলো তো নিউ মার্কেটের কাছাকাছি। এখান থেকে সে তো অনেক দূর।

আপনি এসব ভাবতেই থাকবেন। কিন্তু আপনার বাবুটি ততক্ষণে ঢুকে পড়েছেন বাঁশের ফ্রেমের ওপর খড়ের ঘরের একটা ছাউনিতে। দিব্যি বড় সেলুন সেটা। ঘূর্ণমান চেয়ার রয়েছে সেখানে, তার সামনে বড় বড় আয়না। দু-চারজন হেয়ার-কাটার ও শেভার কাজে ব্যস্ত। কয়েকজন দিব্যি বসে চুল কাটাচ্ছেন। আপনার বাবুটিকে এখন লাইনে দাঁড়াতে হবে। দাড়ি কামানোর জন্য আরো কজন অপেক্ষা করছেন সেখানে।

আপনি ভেবে চলেছেন কতক্ষণে আপনার বাবুটি অফিসের কাজে গিয়ে বসবেন, তারপর আপনার ফাইলটিতে হাত দেবেন।

সেসবের চিন্তা এখন করে লাভ নেই। সবে তো একটা বেজেছে ঘড়িতে। আধঘন্টা পরেই তো লাঞ্চ-ব্রেক। সাহেবরা সবাই ফিরবেন

আড়াইটে তিনটে নাগাদ। তার আগে বাবুটিকে কোনো সাহেবই ডাকবেন না। কাজেই বাবুটির নিশ্চিন্তমনে খেউরি করে নিতে অসুবিধা নেই, আপনি শুধু শুধুই খেঁকমেক করবেন। সুতরাং বাবুটির ইচ্ছায় সায় দিয়ে ফেলুন যদি ভালো চান। কারণ আপনার কাজ যে এখনও ওঁরই হাতে। চা-মিষ্টি দিয়ে যেটুকু তোয়াজ করে গেলেন এতক্ষণ, সেসব তো ছিল তাঁর মহিমাকে একটু গৌরবান্বিত করার জন্য।

একটু কৃত্রিম হাসি আপনার মুখে আনতেই হবে। সেই হাসিটুকু প্রকাশ করে আপনিও বসে পড়ুন পাশের খালি চেয়ারটাতে। ভাববেন না, তাঁর ক্ষৌরকর্মের পয়সাটা আপনাকেই দিতে হবে। বাবুটির নজর অত নীচগামী নয়। একেবারে পকেট-খালি বাবু নন, কিছু রেস্ত নিয়ে তিনিও চলেন।

দাড়ি কামানো শেষ হোলে আবার সেই পথ, রাজপথ। দুধারে দোকানের সারি, খড়বিচালি ও তার ওপরে ত্রিপল টাঙ্গিয়ে দিব্যি দোকানঘর। একটু গ্রাম্য গ্রাম্য দোকান মনে হবে বৈকি, কিন্তু সব জিনিসই পাওয়া যাবে এসব দোকানে। পয়সা নেই হাতে, তাতে কিছু এসে যায় না বাবুদের। স্লিপ্ লিখে দিলেই হোলো। ডেবিট-ক্রেডিটের হিসেব-নিকেশ সব মাস গেলে, বাবুরা মাইনে পেলে। এধরনের লেনদেনের সুবিধা অনেক, ডেইলি সেল তাতে বেড়ে যায়। ক্রেডিটের বাজার তাই রমরমা।

আপনার বাবুটি হঠাৎ যেন কোথায় উধাও হয়ে গেলেন। এতে ভাববার কিছুই নেই। উনিও আপনার পেছনে পেছনেই আছেন কারণ এখনও তো কাজকারবার পুরো হয়নি।

উনি ঢুকেছেন একটা ছাউনির ভেতর যেখানে মা-কালীর একটা বড় ছবি সামনে রেখে এক দাড়িওয়ালা গণৎকার বসে আছেন মাথায় একটা বিরাট জটা নিয়ে––তাঁর কাছে হাতটা দেখাতে। অনেকদিন ধরেই বাবুটির প্রোমোশন আটকে আছে। বোধহয় কোনো রাহু খোঁচা মারছে অনবরত। আবার শনির দশাও পড়েনি তো? কাজেই হাতটা একটু দেখিয়ে নেওয়া দরকার––মাদুলি বা কোনো আংটি ধারণ করলে যদি অশুভ যোগটা কেটে যায়, সেটাও জেনে নেওয়া দরকার।

না, একটু বাদেই ফিরে এলেন বাবুটি। সময় এখন ভালোই যাচ্ছে, আশ্বাস দিয়েছেন গণৎকার। রোজগারে কোনো বাধা হবে না কোনোদিন। এক আধটুকু যা বাধা আছে সেটা উনি ওঁর হয়ে পুজো করেই কাটিয়ে দেবেন।

বাবুটি এবার নিশ্চিন্ত হয়ে আপনার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। এখন কী করা যায় ভাবছেন। আড়াইটা বাজতে এখনও পাক্কা আধঘন্টা বাকী। ততক্ষণে দুই-একটা ভাগলপুরী চাদরের দরদস্তুর করা যাক।

ফেরিওয়ালারা সবাই রাস্তার একপাশে বড় পোটলা নিয়ে চাদরের অর্দ্ধেকটা খুলে ফ্যাশান প্যারেডের মতো দাঁড়িয়ে।

আপনি নিজেও হয়ত একটু কৌতূহল প্রকাশ করলেন। শহরে এসেছেন একটা কিছু না নিয়ে গেলেই বা কেমন দেখায়। বুড়ী মা'র গায়ে যদি দেওয়া যায় একটা চাদর, তবে ঠাণ্ডা থেকে একটু রেহাই পেতে পারেন তিনি।

আপনি একটার পর একটা দেখলেন সেই চাদর। দামদস্তুর করে কেনার মানসিকতাও তৈরী করে ফেলেছেন। আপনার সঙ্গে বাবুটিও সায় দিচ্ছেন নিতে। কী করবেন, ফেরিওয়ালাকে বল্লেন, একটা দিতে।

জোড়াজোড়া চাদর। মাঝখানে কাঁচি চালিয়ে দুভাগ করাও হয়ে গেল। একখানা হাতে নিয়ে আপনি একটু দোটানায় পড়ে গেছেন, আপনার সঙ্গী বাবুটির কথা ভেবে। কারণ উনিই তো আগবাড়িয়ে এসেছিলেন চাদর দেখতে, অথচ কিনছেন না। আপনার প্রশ্নের আগেই কিন্তু উনি উত্তর দিলেন, মাসের শেষ, টাকা হাতে নেই।

বাধ্য হয়ে আপনি তাঁর হয়ে টাকাটা দিয়ে দিলেন। বাবুটি উপকৃত হয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে আপনাকে ভরসা দিলেন, মাস গেলে যথাসময়ে টাকাটা ফেরত দেবেন।

ওঁর শত আশ্বাসন সত্ত্বেও কিন্তু আপনার লস্-একাউণ্টে এই টাকাটা লিখে রাখবেন এক্ষুণি, নতুবা দুবার এই কথাটা মনে করে আপনাকে আঘাত দেবে। প্রথমটা, টাকাটা বের করতে আপনাকে আঘাত দিয়েছে, দ্বিতীয়-বার দেবে টাকাটা যথাসময়ে ফেরত না পেয়ে। কাজে কাজেই প্রথম থেকেই লস্ ধরে নেওয়া ভালো। আপনার এই ডেবিট কোনোকালেই ক্লীয়ার হবে না।

এইবার আপনার বাবুটি কাজটা করে দেওয়ার জন্য অফিসে ফেরার দিকে মন দিলেন। টাওয়ারের ঘড়িতে তখন তিনটে বাজতে আর মিনিট দশেক বাকী। তবে টেবিলে বসার আগে দুটো পান মুখে না পুরলে কেমন করে মেজাজ আসবে কাজে ?

কাজেই পানের দোকানে মিনিট পাঁচেক দাঁড়াতে হবে। একসঙ্গে চারখিলি পান মুখে পুরতে পুরতে হাতটা বাড়িয়ে ধরবেন একটু জর্দার

আশায়। আপনাকেও সে পান অফার করবে ঠিকই, ওইটুকু সৌজন্য-বোধ তাঁর আছে। আপনিও তাঁর সঙ্গে সানন্দে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

পানের পয়সা আপনার বাবুটিই দিয়ে দেবেন। একেবারে সবকিছুর খরচ আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে কী করে চলে? আপনাকেও তো বাইরে একটু গুণগান করতে হবে এঁর।

কাজের টেবিলে ফিরে এসেই বাবুটি কিন্তু একবারেই আপনার ফাইলটি খুঁজে পেলেন সকালের দিকেও যেটার সন্ধান পাওয়া ছিল দুষ্কর। মিনিট পাঁচেকের ভেতরেই ফাইলের ওপর যা কিছু লেখার লিখে ফেললেন। কোনোরকম প্যাঁচ কষলেন না। সুন্দরভাবে গুছিয়ে প্রস্তাবের সমর্থন করলেন। এখন শুধু ওপরওয়ালার কাছে একটা সই-এর ছাপ নিয়ে ফিরে আসা ব.কী। নিজের হাতেই নিয়ে গেলেন ফাইল সাহেবের কাছে সই-এর জন্য।

কাজ হয়ে গেল নীরবে, নির্বিবাদে, কোনোরকম আর তর্ক আলোচনা না করে। এরপর বাবুটির হাতের ভেতর সামান্য একটু খসখসে আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল এই যা, কতকগুলো কড়কড়ে কাগজ গুজে দেওয়ার সময়। এছাড়া আর কোনো কিছু শোনা যায়নি। বাবুটি নিশ্চিন্ত। আর মক্কেলও সরে পড়লেন তাঁর সাম কী গাড়ী ধরতে।

এবার একটু ওপরের দিকের অবস্থাটার অনুধাবন করা যাক। বড় বড় প্রশাসকরা, অর্থাৎ সাহেবরা তাঁদের চেম্বারে বসে কী করছেন দেখা যাক।

প্রথমেই প্রবেশ করলে ভালো ছোটসাহেবদের ঘরে। একটু ধাপে ধাপে ওঠাই ভালো। বড়-মেজ সাহেবদের ঘরে ঢুকতে হোলে বাইরের লোকদের জন্য সময় নির্দিষ্ট করা আছে তিনটে থেকে চারটে। চেম্বারের বাইরে ছোট্ট একটা বোর্ডে সেকথা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য লেখাও আছে।

ছোটসাহেবের ঘরে ঢুকতে গেলে কেউ আপনাকে বাধা দেবে না, পরিচয়-পত্রেরও প্রয়োজন নেই। এছাড়া তাঁর চাপরাশীও এখন বাইরে বসে নেই মনিবের ঘন্টি শোনার জন্য। সে এখন ক্যানটিনে গেছে সাহেবের জন্য বড় পটে ক'রে চা আনতে। অফিসে ঢুকতে ঢুকতেই চায়ের তেষ্টাটা বেড়ে যায় সবার। এক প্রস্থ জমাটে আড্ডা চলে সেই সময় ঘরে অফিসের সিনিয়র সহকর্মীদের নিয়ে যারা কেরাণীর স্তরে নয়, একটু উঁচুতলার। আড্ডার বিষয়বস্তু সকালের খবরের কাগজে যেসব চমকপ্রদ রাজনৈতিক

খবর বেরিয়েছে তারই পুনরাবৃত্তি করে বিশ্লেষিত আলোচনা। কোন মন্ত্রী কী-ভাবে নাজেহাল হয়েছে এম, এল, এ-দের কাছে বা কোথায় পাবলিক অপদস্থ করেছে মন্ত্রীকে এসব গোপনে সংগ্রহ করা নিউজ নিয়ে গরম গরম তর্কবিতর্ক। শেষ পর্যন্ত এই মন্ত্রীমণ্ডলও যে বেশিদিন টিকবে না, এসবেরও একটা মোটামুটি বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ভোটাভুটি চলে এইসব ছোটখাটো আড্ডাতে।

এইরকম যখন গরম অবস্থা ঘরের ভেতর, আপনার সেই সময় ঘরে হঠাৎ প্রবেশ করাটা অশোভনীয় হোতে পারে বৈকি। কিন্তু এটা নিয়ে ভাববার কিছু নেই। আপনাকে দেখে ঘরের সবাই একটু নীরবতা পালন করবে মুহূর্তের জন্য, তবে ঘরের মালিক যিনি, অর্থাৎ ছোটসাহেবটি আপনার খাতিরদারি করতে কসুর করবেন না। তিনি আপনাকে বসতে বলবেন, চা-টাও অফার করবেন। আপনি নিজেই তখন একটু কিন্তু হয়ে থাকবেন এসব দেখে। অফিস-আওয়ারে আবার এসব কেন?

এটা ওঁদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার, কোনো কারণেই পরিবর্তনীয় নয়। ঘরে সাহেব না থাকলেও বাকী সহযোগী সহকর্মীরা এই ধারা-বাহিকতা বজায় রেখে চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে ঘন্টা দেড়েক জমাট গালগল্প করে তবে তাঁরা উঠে যাবেন যাঁর যাঁর কাজের টেবিলে। প্রথমেই কিন্তু এই ঘরে হাজিরা দেওয়া চাই, তারপর চা-পানান্তে অন্য কাজ। বড়-মেজ কোনো সাহেব হঠাৎ যদি কাউকে ডেকে পাঠান, তবে তাঁদের চাপরাশী প্রথমেই এসে এখানে খবর দেবে যাঁর তলব হয়েছে তাঁকে। এটা সর্বজন-বিদিত, ঢাকাঢাকির কোনো ব্যাপারই নয়।

এরকম চায়ের আড্ডা চলবে আর একবার লাঞ্চ-আওয়ারে। তার স্থিতিকাল প্রায় ঘন্টা দুয়েক, দেড়টা থেকে সাড়ে তিনটে অবধি। তখন শুধু চা-য়ে মানাবে না, সেটা একটু জলযোগ সহযোগে সমাপিত, কারণ সারাদিনের এতো খাটাখাটুনির পর পেটের অভুক্তি অবস্থাটা যে স্বাস্থ্যহানি ঘটাতে পারে।

তারপর ক্লক-টাওয়ারের পাঁচটার ঘন্টাধ্বনি সবাইকে সচকিত করে তুলবে অফিস ছাড়ার জন্য। ঘড়ির আর কোনো ঘন্টার আওয়াজ তাঁদের কর্ণপাত না হোলেও ছুটির ঘন্টা তাঁদের শ্রবণেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করতে বাধ্য। এদিকে ঘরের ভেতর, টেবিলে-মেজেতে-আলমারিতে, এমন কী বাড়ীতেও ফাইলের স্তূপ পাহাড়প্রমাণ উঁচু হয়ে চলেছে। সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। সরকারী কাজে, অত তাড়াহুড়ো কীসের? আপন গতিতে চলবে সেটা।

এবার চলুন মেজসাহেবের ঘরে। তিনটে বেজে গেছে অনেকক্ষণ। বাইরে তাঁর চাপরাশী ফ্যানের তলায় ঝিমোনো অবস্থায় দু পা তুলে বেঞ্চের ওপর বসে। আপনার তোয়াক্কা প্রথমে সে করবে না, খচখচ করে যখন একটা স্লিপ লিখে ওর হাতে দেবেন অন্দরে নিয়ে যাবার জন্য, তখন সে গা মোড়ামুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠবে। বলবে, সাহেব তো কামরাতে নেই, লাঞ্চের পর এখনও আসেননি। চারটের আগে তো দেখা পাবেন না, কারণ মিটিং শেষ করে তবে আসার কথা।

কোথায় মিটিং, কতক্ষণ মিটিং, কেউ জানে না সেকথা। মিটিং-এর নাম করে অনেকেই আবার লাঞ্চের পর অফিসেই আসেন না। চাপরাশীকে বলা থাকে, কেউ খোঁজ করতে আসলে বলে দিতে মিটিং-এ।

বড়সাহেব, তিনি তো সর্বদাই টুরে। দিল্লীতে আসা-যাওয়া তো লেগেই আছে। কখনো প্ল্যানিং-এর মিটিং, কখনো ফাইনান্স কমিশনের, কখনো ন্যাশনাল ডেভলেপমেন্ট। এটা ওটার কত যে মিটিং তার হিসেব রাখাও কঠিন। প্লেন যেন তাদের পেছনেই ছুটছে অনবরত। ফুরসৎ কোথায় কারুর সঙ্গে ভেট-মোলকাত করার? আর বড়সাহেব হেড কোয়াটারে না থাকলে তো ডিপার্টমেন্টে চলে তখন স্বাধিকার শাসন। সর্বত্রই ছুটি-ছুটির মেজাজ। দেখার কেউ নেই, বলারও কেউ নেই। ইচ্ছানুবর্তিতার ইষ্টসাধন।

প্রশাসনের ছবিটা কল্পনা করুন এবার। ঝাপসা হয়ে আসবে চোখ। ভাববেন, কোথায় চলেছি আমরা। কে আঁকড়ে রাখবে এই বাঁধন-ছেড়া তরণীকে, তরঙ্গ প্রহারে খেয়া পারাপারের ঘাটও যে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সেক্রেটেরিয়েটের অন্দরের অবস্থা এরকমই দাঁড়িয়েছিল সত্তর দশকের মাঝামাঝি থেকে।

আমার চাকরির আরো এক বছর বাকী তখন। তারপরই পরিপূর্ণ অবসর। গোলামির সম্যক্ অবসান। দগ্ধ হয়েছি যে ক্ষত-মন নিয়ে, তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি।

নিজে পালন করেছি নিয়মানুবর্তিতা, পরকেও শেখাবার চেষ্টা করেছি, সফল হোতে পারিনি সেকাজে। নিজে শাসনের বশে থেকেও অপরকে বোঝাতে পারিনি সেই শাসনের মর্যাদা। চাকুরি-জীবনে নিজে কোনোদিন দেরি করে অফিসে পৌঁছেছি বলে মনে পড়ে না, কিন্তু অন্যদের সময়ানুবর্তিতার উল্লঙ্ঘন পীড়া দিয়েছে মনে।

ইংরেজ সাহেব, দেশী আই, সি, এস এবং সবশেষে বিহার মুলুকের

কিছু আই, এ, এস, সাহেবদের সঙ্গেও কাজ করেছি। কিন্তু যে অনাবিল আনন্দ ছিল আই, সি, এস,-দের সঙ্গে কাজ করে সেটার পরিপূর্ণ ব্যর্থতা ঘটেছে বিশেষ কয়েকজন আই, এস, দের সঙ্গে থেকে। শেষোক্ত সাহেবরা বেশিরভাগই ছিলেন চাটুবাদপ্রিয়। চাটুবটুদেরই পছন্দ করতেন তাঁরা বেশি। তাই চাটুকারদের একটা স্বরাজ্য ছিল দুর্দান্তরকমের, অদমনীয় ছিল এদের প্রভাব। এরা ওপরতলায় গিয়ে চুকলি খেতেও কসুর করত না। চাটুকারিবৃত্তিতে এরা ছিল সজীব অফিসের ব্যাপারে। ওপরতলার মানুষের অনুগ্রহ পাওয়ার উদ্দেশ্যে এমন কোনো হীন কাজ ছিল না, যা তারা করতে পারত না। কাজেই এরা অফিসের কাজটুকু বাদ দিয়ে, শুধু এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াত। স্বার্থসিদ্ধির জন্য নানা ফন্দি বের করে, তোষামোদ করাটাই ছিল নিয়ত ধ্যেয় বস্তুর চিন্তন। এক কথায় পা-চাটার অভ্যাসে নিবেদিত।

এরা আবার নিজের পকেট থেকে খরচ করে গাদাগাদা খিলি পান, ভালো ভালো জর্দা, সিগারেটের যোগান দিয়েছে কোনো কোনো ওপরওয়ালাকে, যাঁরা পানের নেশায় ছিলেন নিবিষ্ট। এইসব করে অনেক চাটুকার, ট্যুরে না গিয়েও টি, এ, বিলের অনুমোদন লাভ করেছে। একটা দুটো নয়, গাদাগাদা টি, এ, বিল। এইসব মানুষকে দেখলে রাগের চেয়ে দুঃখ হোতো বেশি। লেখাপড়া শিখে, ভালো ভালো পোস্টে থেকেও এই নোংরামি থেকে মুক্ত থাকতে পারল না কেন? ভাবতাম, কী কারণে এদের ভেতর মানসিক দৈন্য পাকাপাকিভাবে স্থান করে নিয়েছে?

কী অসম্ভব ছিল এদের ধৈর্য, কতখানি প্রখর দৃষ্টি। অফিসে ছুটি হয়ে যাবার পরেও এরা বসে থাকত অফিসঘরে বড় কর্তার অপেক্ষায়। বাসনাটা আর কিছু নয়, দিনান্তের শেষে ক্লান্ত হয়ে যখন কর্তা বাড়ী ফেরার উদ্যোগ করবেন, সেই সময় তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ানো। তারপর পাশে পাশে থেকে তাঁর গাড়ী অবধি তুলে না দেওয়া পর্যন্ত এদের মন সমতালাভ করত না। দিনের পর দিন সেই একই প্রক্রিয়া। আরদালীর মতো একটা সেলাম ঠুকে, কেউ কেউ আবার পায়ে হাত রেখে বিদায় দিত। তবে হোতো তাদের দিনের অবসান।

কী জঘন্যই না মনে হোতো সেই দৃশ্য। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয় একজন বিশেষকে একটু খুশি করা, তাঁর মুখে একটু হাসির ঝলক দেখা। প্রয়োজনে যাতে তাঁর সামান্য দয়ালাভের যোগ্য হোতে পারে। তোষা-মোদের জমা খাতায় তার অংকটা যেন বাড়তেই থাকে।

একদিনের একটি ঘটনা। সেক্রেটেরিয়েটের কনফারেন্স রুমে একটা মিটিং চলছে। ওপরের সব অফিসারই সেখানে। আমিও সেখানে উপস্থিত। বিভিন্ন বিভাগ থেকেও এসেছেন বড় বড় অফিসার। মন্ত্রিও সেখানে। গুরুগম্ভীর আলোচনা চলছে প্ল্যানিং-এর খরচপত্তর নিয়ে। হঠাৎ দেখি আমার অধঃস্থ-অফিসারটি—একজন আণ্ডার সেক্রে-টারি, চেয়ার ছেড়ে উঠে হলের বাইরে চলে গেল তড়িৎবেগে। হবে কোনো বিশেষ কোনো কাগজপত্র আনতে গেছে ডিপার্টমেন্টে। বাজেটের কোনো ফিগার বা ডাটার প্রয়োজন পড়লে বিভাগীয় প্রধান আমাদের দিকেই চোখ মেলে থাকবেন সেসব দেবার জন্য। কিছুক্ষণ পরেই দেখি, সেই আণ্ডার সেক্রেটারিটি বড় কর্তার পায়ের কাছে রেখে এলো একটা পিকদানি। হাতে করে নিয়ে এসেছে সে, ভাবটা এমন, যেন কিছুই হয়নি।

আমাদের এই বিভাগীয় প্রধানের পানের নেশা প্রচুর। সব সময়েই মুখে পান। তাই তাঁর অফিসঘরে একটা পিকদান মজুত থাকে সব সময়। মিটিং-এ বসে আমার এই আণ্ডার সেক্রেটারিটি দেখতে পেয়েছিল বড় কর্তা মুখে পান নিয়ে মেঝেতে কী যেন খুঁজে চলেছেন। মিটিং হলে তো পিকদান থাকার কথা নয়। কিন্তু তাঁর মুখের হাবভাব দেখে আমার পাশে-বসা এই তাঁবেদার জীবটি বুঝে ফেলেছিল, কী খুঁজছেন তিনি। তাই দৌড়ে চলে গেল বড় কর্তার অফিসঘরে, নিয়ে এলো হাতে করে সেই নোংরা পিকদানটি। গোটা করিডর ভর্তি তখন লোকে লোকারণ্য, চাপরাশীরাও সবাই হলের বাইরে অপেক্ষ্যমান যার যার সাহেবের জন্য। লজ্জা সরমের কোনো বালাই না রেখে বড়কর্তার পায়ের তলায় স্থাপিত হোলো তাঁর পিক-দান। বড়কর্তার মুখে একটা আনন্দের ঝলক মুহূর্তের জন্য উদ্ভাসিত হোলো।

এরাই হোলো এখনকার অফিসের যোগ্যব্যক্তি। চলনে বলনে কার্য-ক্ষমের চরম শীর্ষে এরাই। নির্লজ্জের মতো কত নীচুতে নামতে পারে শুধু ওপরওয়ালার মুখে একটু হাসি দেখার জন্য। এইভাবে তোষিত হন যাঁরা, তাঁরা আবার সবার কাছ থেকেও এটাই আশা করেন। যাঁরা এসব কাজে অদক্ষ, অনভিলাষী, তাঁদের কটাক্ষ করতেও ছাড়েন না। নিজেরাও যে এই ব্যাপারে কুশলযুক্ত, মন্ত্রীদের মন যুগিয়ে চলেছেন অনবরত, তৈল প্রয়োগে অধিগত। এই বৃত্তিকলায় পারদর্শী না হোলে বীতশ্রদ্ধ হোতে হবে যে তাঁদের কাছে, তারপর হঠাৎ-ই একদিন স্থাপিত হবে অন্য কোনো জায়গায় বদলির মাল্য গলায় পরে।

তাঁদের দৃষ্টিতে এইসব চাটুদারই হোলো অফিসের আসল কর্মী,

যোগ্যতায় এক একজন মহামান্য। অথচ সত্যিকারের যখন কাজের প্রবলেম আসে, তখন ডাক পড়ে সেই সব বাছাবাছা কাজের লোকদেরই, তা না হোলে যে নিজের অক্ষমতাটা অনাবৃত হোয়ে পড়বে দশজনের সামনে। চাটুদার দিয়ে তো আর এসব কাজ চলতে পারে না। তোষিত ব্যক্তিদের এটাই হোলো কার্যসাধন প্রণালী। কাজের লোকগুলোর ওপরেই চলে আবার যত আস্ফালন ও ধমকধামক।

এসব দেখেটেখে চাকুরিজীবনের শেষ অধ্যায়ে এসে গিয়েছিল একটা বিতৃষ্ণা। ঘেন্নায় রী রী করত এসব হীন প্রবৃত্তি ও নৈতিক চরিত্রে অবনত মানুষগুলোকে দেখে। ভাবতাম কতদিনে মুক্তি পাব এদের কাছ থেকে--- পালাই পালাই করত সর্বদা মনটা। মানসিক যন্ত্রণায় ভুগেছি তাই ভীষণ-ভাবে। এদের কর্তব্যবিমুখতা দেখে দগ্ধ হয়েছি মনে মনে। শরীর ও মন দুটোই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সেই কারণে। নিজের কাজও বেড়ে গিয়েছিল তাই বড় বেশি।

অনেক সময় তাই খটাখটি লেগে গেছে অফিসের বড়কর্তার সঙ্গে। সব সময় একটু ঠেস দিয়ে কথা বলতেন তিনি শেষ দিকে। প্রতি মুহূর্তে যে কোনো দরকারী কাজের জন্য ডাক পড়ত ওঁর ঘরে যেটা আমার কাজের তালিকার মধ্যে নয়, সেটার জন্যও। নিজের অপদার্থতা অন্যের ওপর চাপিয়ে দিতেও লজ্জা বোধ হোতো না তাঁর। তাই আস্ফালনটাও যাচ্ছিল মাত্রা ছাড়িয়ে। যেহেতু কোনোদিন এঁর তোষামোদের ধারধারিনি তাই রাগটাও ঝরে পড়ত আমার ওপর বিনা কারণে।

একদিন একটা মিটিং-এ বসে আছি ওঁর রুমে। কয়েকজন সিনিয়র অফিসারও রয়েছেন সেখানে আমার সঙ্গে। কী একটা কাজের কথা উঠতেই আমার ওপর খাপ্পা হয়ে বলে বসলেন, তুমি ওই ফাইলটা আমাকে দাওনি কেন এখন পর্যন্ত?

আমি জানি ওই ফাইল আমাকে দেওয়া হয়নি। দেওয়া হয়েছিল অন্য আর একজন ডেপুটি সেক্রেটারিকে, যিনি আমার সঙ্গে সেই বিষয় নিয়ে আলোচনাও করে গেছেন।

বড়কর্তার হম্বিতম্বি তখনও একটা সীমার মধ্যে রয়েছে। বল্লাম, ও ফাইল আমাকে দেওয়া হয়নি। দিলে সময়মতই পেয়ে যেতেন।

কাকে দেওয়া হয়েছে সেটা আর বল্লাম না। ইচ্ছে করেই।

হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে মিটিং-এর মাঝেই বলে উঠলেন, জান, তোমার চাকরির একস্‌টেনশনের জন্য আমি সুপারিশ করেছি, চীফ মিনিস্টারের এপ্রুভালও হয়ে গেছে। এখন মেমোরেণ্ডাম যাচ্ছে ক্যাবিনেটে। যা

আজ পর্যন্ত কারুর জন্য করা হয়নি, আমি তোমার জন্যই করেছি। এই-ভাবে ফাইল চেপে রাখলে কী একস্‌টেনশন দেওয়া চলে?

এবার আমার সংযত আচরণে একটু উত্তাপের সৃষ্টি হোলো। এত-ক্ষণ নীরবে শুনছিলাম সব কথা। চিত্তস্থৈর্য হারিয়ে চিত্তক্ষোভে ফেটে পড়লাম। সহকর্মীরা যে পাশে বসে সেই খেয়ালও আর নেই। ইংরেজীতে কথাগুলো বল্লাম। রেগে গেলে আমার ইংরেজী বুলিই এসে যায় মুখে। জোর পাচ্ছি বলে যেন মনে হয় অন্তরের দিক থেকে। বল্লাম, হু আস্কড্‌ ফর দি একস্‌টেনশন? ডিড্‌ আই? প্রবেবলি ফর ইওর ওন্‌ ইনটারেস্ট ইউ হ্যাভ ডান ইট। লিস্‌ন্‌, আই হেট্‌ একস্‌টেনশন অফ এনি কাইণ্ড। আই ডোন্ট্‌ লাইক টু ওয়ার্ক এ সিঙ্গল ডে মোর উইথ ইউ আফটার দি ডেট অফ মাই রিটায়রমেন্ট। আই এম্‌ নট এ সাইকোফেন্ট লাইক আদার্স। ইউ ল্যাক ডিসেন্‌সি, ইউ ল্যাক কালচার, ইউ ডু নট নো হাউ টু বিহেভ উইথ এন অফিসার।

মিটিং-এ বসা আমার জুনিয়ররা সবাই হতভম্ব আমার এই ফেটে-পড়া আবেগের বিস্ফোরণ দেখে। সেদিন কী করে যে এত শক্তি এসেছিল আমার ভেতর শক্ত শক্ত কথা উচ্চারণ করতে, সেটা আজও ভেবে পাই না।

বড়কর্তার মুখখানা দেখলাম কালো হয়ে গেল মুহূর্তমধ্যে। তিনি হয়ত কল্পনাও করতে পারেননি তাঁর অধঃস্থ কোনো ডেপুটি সেক্রেটারি এইভাবে তাকে কথা শোনাবার ক্ষমতা রাখে। চিত্রার্পিতের ন্যায় তিনি বসে রইলেন কিছুক্ষণ।

মিটিং শেষ হয়ে গেল আর কোনো কথা না বাড়িয়ে। সবাই চলে গেল ঘর ছেড়ে। আমাকে বসতে বল্লেন তিনি। চেয়ার ছেড়ে আমার হাত করমর্দনের ভঙ্গিতে ধরে বল্লেন, তুমি যে এত রেগে যাবে ভাবিনি, আমি অন্যায় করেছিলাম তোমাকে কড়া কথা শুনিয়ে। প্লীজ্‌ একসকিউজ মী। ব্যস এইটুকু। এই খবর রটে গেল মুহূর্তের মধ্যে ডিপার্টমেন্টে, পরে সেক্রেটেরিয়েটের চতুর্দিকে। একজন কেউ আছেন তাহলে সেক্রেটেরিয়েটে, যিনি একস্টেনশন পেয়েও প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা রাখেন। আজ পর্যন্ত তোষামোদ করেও যেটা কেউ পায়নি।

এটা যে কতবড় একটা ঘটনা ঘটেছিল, এটা বুঝেছিলাম সেদিন, সবাই এসে যখন আমাকে নীরবে অভিবাদন করে গেল।

প্রত্যেক মানুষেরই মাথা গোঁজার মতো একটা পাকাপোক্ত ঠাঁই-এর দরকার। হাত-পা ছড়িয়ে শোয়াবসার মতো হোলেই হোলো।

আমার বাবার পাটনায় আগমন হয়েছিল ১৮৯৮ সালে। তখন জমিজমা কিনে বাড়ী করার কল্পনাও আসেনি তাঁর মনে। কারণ সেই সময়ে দশ-পনেরো টাকার ভাড়ায় পাঁচ-ছ'খানা ঘরঅলা বাড়ী সহজেই পাওয়া যেতো। কাজেই জমি কিনে বাড়ী হাঁকাবার প্রয়োজনটাও ছিল না। এ ছাড়াও বাবা মনে করতেন, নিজে পাটনাতে রয়েছেন বলে ছেলেরাও এখানে থাকবে কী? এমন একটা জায়গা, স্বাস্থ্যকরের কথা বাদ দিলেও, অন্যসব ব্যাপারে এতো পিছিয়ে যে কেউ এখানে পাকা-পাকিভাবে থাকতে চাইবে না। এসব ভেবেই তিনি পাটনাতে বাড়ী করতে চাননি। না চেয়েছিলেন কোনো জমিজমা কিনে রাখতে। বলতে নেই, এসব ব্যাপারে বাবার বৈষয়িক জ্ঞানের অভাব ছিল প্রচণ্ডরকমের, যারফলে না ছিল এখানে কোনো বাড়ী, না ছিল কোনো জমিজায়গা। কাজেই বরাবর আমাদের ভাড়া-বাড়ীতে কিংবা সরকারী কোয়াটারে কাটাতে হয়েছে। তবে এনিয়ে বাবার মনে কোনো পরিতাপের সৃষ্টি হয়েছিল বলে মনে হয় না, অন্তত বাইরে থেকে।

আমার চাকুরি জীবনের কয়েক বছর কাটিয়ে ছিলাম সরকারী কোয়াটারে গর্দানিবাগে এবং কিছুকাল আদালতগঞ্জে, যেটা আমার বড়দাদার অধীনে ছিল।

আমি সেক্রেটেরিয়েটে চাকুরি জীবনে প্রবেশ করেছিলাম ১৯৪৭ সালে যেটার উল্লেখ আগেই একবার করা হয়েছে। নিজে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলাম ১৯৫১ সালের মে মাসে। বুদ্ধপূর্ণিমার দিনে।

নির্বন্ধ ছিল বিয়ে হবে লক্ষ্ণৌতে। সেটা ঠেকায় কে। পাটনা থেকে পশ্চিমের যাত্রা আমার তখন দানাপুর ছাড়িয়ে অধিকতর দূরে কখনো এগিয়েছে বলে মনে হয় না। কাজেই নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ্-এর মুলুকে বিয়ে হচ্ছে জেনে সবাই খুশি। আমিও যে হইনি তা নয়, বন্ধু-বান্ধবরা তো বটেই। এতো নাচানাচি করেও আমার কোনো বন্ধু বিয়ের যাত্রী হোতে পারেনি, লক্ষ্ণৌ দেখার লোভ থাকা সত্ত্বেও।

আমার শ্বশুরমশায় ছিলেন মিলিটারি একাউন্টস বিভাগের একজন পুরনো ডেপুটি এসিসটেন্ট কন্ট্রোলার। খুড়োশ্বশুর টেস্ট অডিটের একজন দুর্ধর্ষ এসিসটেন্ট ডাইরেক্টার অফ অডিট। মিলিটারি একাউন্টস ও সিভিল একাউন্টসের টপ-অডিটের অধিক্ষেত্র ছিল এঁর অফিস। দুজনেই বৃটিশ আমলের অফিসার, আমার নিজের চাকুরিজীবন শুরু হয়েছিল মিলিটারি একাউন্টস-এ। ভাগ্যক্রমে বৈবাহিক যোগসূত্রটা স্থাপিত হয়ে গেল আর্মি একাউন্টসের অফিসারের দুহিতার সঙ্গে। এটাকেই বলে

ভাগ্যলিখন। সুতরাং জামাইয়ের দুটি রূপ দেখতে পেয়েছিলেন আমার শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা। একই অফিসের একজন প্রাক্তন কর্মী যার পরিণতি হোলো জামাতারূপে এই বাড়ীতে।

বিয়ে যখন হয়েছিল তখন আমার মাস মাইনে ১৩০ টাকা, প্রতিবছর বারোটাকার বৃদ্ধি নিয়ে শেষ ২৫০ টাকায়। এটা আপার ডিভিসন এসিসটেন্টের বেতনক্রম। জামাই হিসেবে এই মাইনার মূল্যমান কিছুই নয়, তবে ভবিষ্যত ভালো, তরতর করে উঠে যাওয়ার সম্ভাবনায় ভরা। এর ওপর সরকারী চাকরি—স্থায়িত্বের দিক থেকে নিশ্চিন্ত। এই সব নানাদিক ভেবেই আমার মামাশ্বশুররা সবাই সায় দিয়েছিলেন এই বিয়েতে। তাঁরা থাকতেন পাটনাতেই।

পাটনার 'স্বর্ণাসন' হোলো আমার মামাশ্বশুর বাড়ী। মামাদের মধ্যে একজন ছিলেন উকিল, একজন সিভিল সার্জেন, অন্যজন রেজিস্টার্ড একাউনটেন্ট—এইভাবেই সব মামাই ছিলেন সুপ্রতিষ্ঠিত নিজ নিজ ক্ষেত্রে। স্বর্ণাসনের যিনি ছিলেন বটবৃক্ষের মতো, নাম শরদিন্দু গুপ্ত, তিনিও পেশায় ছিলেন উকিল। আমার বাবার নিকটতম বন্ধু। প্রতিদিন এ-দুজনের বৈকালীভ্রমণ ছিল একসঙ্গে, কখনো গঙ্গার পার দিয়ে, কখনো বাঁকিপুর ময়দানের দিকে ছুটত এঁদের পদযুগল। সঙ্গে চলতে চলতে একত্র হোতেন আরো অনেকে, বেশির ভাগই ছিলেন বাঙালী অধ্যাপক। এক-ঘন্টার সময়কাল ছিল এই আনন্দপ্রদ ভ্রমণ। তারপর বাড়ী ফিরে এসে দুই বন্ধুর চলত তাসখেলার আড্ডা—শুধু কনট্রাক্ট ব্রিজ-খেলা।

এই তাসের আসর বসত স্বর্ণাসনেই—বাইরের খোলা পাথরের বেদীর ওপর। মাঝখানে একটা বড় কেরোসিনের ল্যাম্প বসিয়ে চতুর্দিকে ঘিরে থাকতেন অন্যরা। বেশির ভাগই পাড়ার বর্ষিয়ান মানুষ কেউ উকিল, আবার কেউ এ্যাংলো-সংস্কৃত স্কুলের শিক্ষক। একে অপরের প্রতি সমাদৃত, তখনকার পাটনা সমাজের সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। খেলার সময়কাল রাত ন'টা অবধি—এক মিনিটও এদিক ওদিক হবার জো ছিল না।

স্বর্ণাসনের পরিবার ছিল বৃহৎ। যেমন ছিল বৌ-ঠাকুরুণদের বিরাট দল, তেমনি সংখ্যাতীত ছিল ছেলেমেয়ে—বড় ছোট। একান্নবর্তী পরিবারের সুঠাম দৃষ্টান্ত ছিল এই স্বর্ণাসন। আমিষ-নিরামিষ রান্নাঘর সব আলাদা আলাদা। আলাদা ভাঁড়ার ঘর। ঠাকুর-চাকর, দাই-দাসী থাকলে কী হবে, রান্নাবান্নার দায়দায়িত্ব ছিল বৌঠানদের ওপর। ছোট বড়কে জিজ্ঞাসা না করে কিছুই করার সাহস পেতেন না। বাড়ীর যিনি কর্তা অর্থাৎ শরদিন্দু গুপ্ত, যাঁকে এঁরা কেউ বড়কাকা বা বড়দাদু বলতেন

সম্পর্কটা বুঝে, তাঁর ওপর কারুর কথা বলার ছিল না। প্রথম প্রথম তো এমন ছিল পুজোর শাড়ী আসত সবার জন্য একই মিলের একই বুননির। পাড়ের যা তফাত থাকত। এটার থেকেই বেছে নিতেন সবাই যাঁর যাঁর শাড়ী। এমন ডিসিপ্লিন ছিল পরিবারের প্রতিটি মানুষের।

এহেন পরিবারে আত্মীয়সূত্রে বন্ধন প্রাপ্ত হোতে চলেছি ভেবে সবাই খুশি হয়েছিলেন। আজ এক একজনের কথা মনে পড়ছে ভীষণভাবে। স্মৃতিপাশে যাঁরা এখনও সমুজ্জল তাঁরা হলেন সবাই মামাশাশুড়ী দলের মানুষ---বড়মামী, রাঙ্গামামী, সেজমামী, ভাঙ্গোমামী, সোনামামী---এঁরা স্নেহ বিতরণে কেউ কারুর চেয়ে কম ছিলেন না। সবার কাছ থেকেই পেয়েছিলাম ভাগনি-জামাইয়ের প্রতি আদরযত্ন। শেষপর্যন্ত এই বাড়ীতে ছিলেন রাঙ্গামামী। আর সব মামী গত হয়ে গিয়েছিলেন।

এই রাঙ্গামামীও আর নেই---কলকাতায় গিয়ে তাঁর ঈশ্বরবাস হয়েছিল। বড় অধীর হয়ে পড়েছিলেন এই স্বর্ণাসন ছাড়ার জন্য। বিয়ে অবধি ছিলেন এখানে।

শ্বশুরালয়ে বেশিদিন থাকতে নেই, আমাকে এই পরামর্শ দিতেন আমার কয়েকজন হিতৈষী বন্ধু যাঁরা বিবাহিত ছিলেন। কেন একথা বলতেন, জানি না। কোথাও বোধহয় তাঁদের আঘাত খেতে হয়েছিল। কেউ আবার দুটো লাইন ছন্দবন্ধ করে আওড়াতেন---শ্বশুরবাড়ী মধুর হাঁড়ি, শুধু দিন দুই চারি।

কেন জানি, এটা আমার মনে একটা দাগ কেটেছিল। নিঃসন্দেহে আমার শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা সবাই চমৎকার মানুষ। খুব হই-হল্লা করে থাকত সবাই, প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা। শ্যালক-শ্যালীকারাও। প্রাণের সজীবতা ছিল সবার মধ্যে। কোথাও কারুর মধ্যে নীচতা পাইনি, প্রাণ খুলে হাসত সবাই। পরিহাস রঙ্গটাও বোঝবার ক্ষমতা ছিল। পাটনা থেকে যখন আমরা দুজনে লক্ষ্ণৌ যেতাম, শালা-শালীরা লক্ষ্ণৌ স্টেশনে আমাদের না ধরে, তিনটে-চারটে আগের স্টেশনে এসে আমাদের অভ্যর্থনা করার জন্য রেলকামরায় চড়ে বসত। আমি অবাক হয়ে যেতাম ওদের এই আনন্দ মাতামাতিতে।

এত সব সত্ত্বেও দুবেলা খাবার টেবিলে বসে একটা বিসদৃশ ব্যাপার দেখে একটু আশ্চর্য হতাম। এতো প্রীতি যাদের মধ্যে, এতো রসাত্মক যারা, আহারের ব্যাপারে এই তারতম্য কেন জামাইয়ের প্রতি? খাবার

টেবিলে বসে দেখতাম আমার পাতে লাল মোটাচালের ভাত আর সবার পাতে পরিবেশিত হচ্ছে ধবধবে সাদা মিহি আতপচাল, শ্যালক-শ্যালীকাদের পাতেও কিন্তু তাই। এই তারতম্যটা আমার মনে খোঁচা দিত ভীষণ, তবে মুখ বুজে হাসিহাসিভাব করেই খেয়ে নিতাম। তখন মনে পড়ত সেই বন্ধুদের কথা--বেশিদিন থাকতে নেই শ্বশুরবাড়ীতে, ইজ্জৎ থাকে না তাহলে।

কিন্তু আমি তো এই সেদিন এলাম। দুটো দিনও পার হয়নি। তবে আমার জন্য এই লাল মোটাচালের ভাত কেন আলাদা করে, যেটা গিলতে খুবই কষ্ট হয়। তবে কী এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় কেটে পড়ার সিগন্যাল? তাই বা হবে কেমন করে, বড় শ্যালকের বিয়ে উপলক্ষে এসেছি এবার, কদিন বাদে বিয়ে। বরযাত্রী যাবে সেই খড়গপুরে, তারপরে আছে বউ ভাত, প্রায় দিন-দশেকের ধাক্কা। সেইভাবে ছুটি নিয়েও এসেছি। আমাকে তাড়ন করার তো কোনো কারণ দেখছি না, বরং নতুন জামাইয়ের খাতির-মর্যাদা বেশি হবারই কথা। এ যে দেখছি আহারের ব্যাপারে লক্ষ্ণৌয়ের উর্দুতে যাকে বলে 'খাতির নদারত' অর্থাৎ খাতির শূন্য।

লাল মোটাচাল আমরা পাটনাতেও কোনোদিন খাই না। কারুর মুখেই রোচে না সেটা। ওটা ছিল অনেক বাড়ীতে চাকরবাকরদের জন্য। আমাদের বাড়ীতে সেই তারতম্যটা ছিল না কোনোকালেই। সবার চাল এক। একটু মিহি ঢেঁকিছাটা চাল কেনা হোতো। কাজেই শ্বশুরবাড়ীতে লাল মোটাচাল খেতে সত্যি খুব কষ্ট হোতো। বাকী নানা ব্যঞ্জনের ছড়াছড়ি ছিল প্রচণ্ড রকম, নিত্যি নতুন আইটেম। শাশুড়ীর রান্নার হাত ছিল অপরূপ--যা খেয়ে পরিতৃপ্ত হতাম, খেয়েও শেষ করা যেতো না।

একদিন গৃহিণীকে আড়ালে বল্লাম, তোমাদের এখানে সবই তো ভালো, তবে শুধু জামাইয়ের পাতে লাল চাল পড়ে কেন? আর তোমরা তো দিব্যি ধবধবে আলোচাল সাপটে চলেছ আমার সামনে বসেই। এটার রহস্য কী বুঝে উঠতে পারছি না। জামাইয়ের পাতে আলোচাল দেওয়া কী বারণ এবাড়ীতে? কারণ অনেক বাড়ীতেই একটা নিজস্ব নিয়ম তৈরী হয়ে চলে আসে, যার পেছনে কোনো শাস্ত্রীয় আজ্ঞা না থাকলেও সংস্কার-গত একটা ধারণা কাজ করে আসছে। সেটার বশবর্তী হয়েই কী এই ব্যবস্থা? কিংবা আমার কী তাহলে এখানে বেশিদিন থাকা উচিত নয় --ওঁরা কী অসন্তুষ্ট যার দরুন এরকম একটা অদ্ভুত তারতম্য পাচ্ছি।

তারপরের দিন থেকেই দেখি ব্যবস্থাটা পাল্টে গেছে। এটার রহস্য ভেদ হয়েছিল অনেক পরে। লক্ষ্ণৌতে কেন, গোটা উত্তর প্রদেশের মানুষ,

সেদ্ধচালের ব্যবহার জানে না। বেশির ভাগই তো রোটিখানেওয়ালা। যেটুকু চাল ওদের ব্যবহার হয় সবটাই আতপতণ্ডুল।

আমার শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা কী করে জেনেছিলেন যে আমি নাকি সেদ্ধচাল ছাড়া আলোচাল খাই না। বেহারের লোকেরা সবাই সেদ্ধ-চালই পছন্দ করে সেটা সত্যি, এখানকার এটাই রেওয়াজ। শুধুমাত্র আমাদের বাড়ীতে বাবা খেতেন আতপচাল, সেটা উনি ব্যবহার করতেন পেটের একবার গণ্ডগোল হয়েছিল, সেই থেকে। বাকীরা সবাই খেতাম সেদ্ধচাল। সুতরাং অনেক কষ্টে আমার শ্যালকদের যোগাড় করতে হয়েছিল এই সেদ্ধচাল দোকানে দোকানে ঘুরে শুধু আমার জন্য। আতপ-চালের ব্যবহার যে মুলুকে, সেখানে সেদ্ধচাল রাখার প্রশ্নই নেই। কাজেই যে দোকানে যেটুকু পেয়েছে কিনে রাখা হয়েছে, কোয়ালিটির প্রশ্ন ওঠেনি। সুতরাং আমার প্রতি ওরা সহানুভূতিসম্পন্ন হয়েই লক্ষ্মৌতে অলব্ধ বস্তুটিকে যেমন করেই হোক লব্ধ করেছিলেন শুধু জামাইকে আদর করে খাওয়ানোর জন্য। এনিয়ে এখনও বেশ হাসি-ঠাট্টার উদ্রেক হয় শালা-শালীদের মধ্যে।

আমার এই শ্বশুরালয়ে বিয়ের পরেই একটা বড় রকমের দুঃখের ঘটনা ঘটেছিল আমার ছোট শ্যালকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। বাড়ীর সবচেয়ে ছোট ছিল এই-ই। আমার বিয়ের সময়েও তাকে দেখেছি খাটে শুয়ে থাকতে। কোনোদিন জিজ্ঞাসা করিনি কেন শুয়ে, কী রোগ তার। পরে যে-ঘটনাটা শুনেছিলাম সেটা খুবই মর্মপীড়ক, আঁতকে ওঠার মতো। সেটা হোলো এই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কালে লক্ষ্মৌতে বহু ইরাণীর আগমন হয়ে-ছিল। শহরে এরা একটা না একটা উৎপাত করে বেড়াত যে কারণে সবার মনে একটা উৎকন্ঠার সৃষ্টি করেছিল। এরা ছিল যাযাবর জাতি, স্থান থেকে স্থানান্তরে ভ্রমণশীল, অনেকটা বেদেদের মতো। এক একটা দল ঘুরে বেড়াত ইতস্তত। বহু অসৎ কাজেও লিপ্ত থাকত এরা যে কারণে অনেককে থানাতে ধরে আনা হোতো।

লক্ষ্মৌতে ষ্টেশনের কাছাকাছি একটা বড় নহর রয়েছে, উদ্দেশ্য ছিল গোমতী নদীর জল টেনে সেচের কাজে লাগানো হবে এটা। কিন্তু সে আর হয়ে ওঠেনি, তার বদলে শহরের নোংরা জল ঠেলে নিয়ে গোমতীতে ফেলা হচ্ছে। এটা ইংরেজ আমলের তৈরী। অনেকখানি চওড়া ও গভীর এই নহর। তারই দু-পাশে কেউ তাঁবু টাঙ্গিয়ে, কেউ মুক্ত আকাশের

তলে ঘরসংসার পেতে থাকত এই ইরাণীরা। শহরের ভেতর এদের আনাগোনা ছিল দিবারাত্র।

একদিন আমার এই ছোট শ্যালকটি দুপুরের স্কুল শেষ করে তিনটে বেজে যাওয়ার পরও যখন বাড়ী ফিরল না তখন বাড়ীর লোকের চিন্তা হোলো। সাধারণত তিনটে থেকে সাড়ে তিনটের মধ্যেই বাড়ী ফেরে এই ছেলে। নীচু ক্লাশের ছেলে তাই চারটে অবধি আটকে থাকার প্রয়োজন পড়ে না। কাছেই স্কুল, কাজেই হেঁটে যাওয়া-আসা। কোনো যানবাহনের প্রয়োজন ছিল না। পাঁচটা বেজে যায় তখনও সে বাড়ী ফেরেনি, শীতের মরসুম সন্ধ্যা হোতে আর দেরি নেই। স্কুলে ছোটাছুটি করল সবাই, সেখানে মাস্টারমশায়রা বল্লেন যে ঠিক সময়ে ছুটির পর সবাই বাড়ী ফিরে গেছে। কোনো কাজে কাউকেই আটকানো হয়নি। বন্ধুরাও সেই কথাই বল্লে, সবাই দেখেছে ওকে বাড়ী ফিরে যেতে। তবে গেল কোথায়? কোনো হদিস না পেয়ে থানাতে খবর দেওয়া হোলো, তারাও ছোটাছুটি করল এদিকওদিক। কিন্তু কোনো ফল হোলো না। বাড়ীতে তখন একটা কান্নার রোল শুরু হয়ে গেছে।

ছেলেরা তবুও যেখানে যেখানে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে, খোঁজখবর করে বেড়াচ্ছে। কোনো পথ-দুর্ঘটনা হয়নি তো আবার? মনে হোতেই অনেকে দৌড়ল বড় হাসপাতালে খোঁজ নিতে। সেখানেও কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। কোথায় গেল তবে এই ছেলে? দুশ্চিন্তায় সবার বুক ফেটে পড়ছে। বাইরে সবাইকে টেলিগ্রাম করা হোলো যদি কোনো কারণে ওখানে গিয়ে থাকে। কিন্তু ছেলে তো এমন নয়, না বলে কোথাও যাবে। খুবই শান্ত প্রকৃতির ছেলে, চেঁচিয়ে কথা বলতেও জানে না, বরং বড় বেশী মুখচোরা।

এদিকে স্কুল থেকে ফেরার সময় নির্জন রাস্তা থেকে কয়েকজন ইরাণী ছেলেকে পাঁজাকোলা করে উঠিয়ে নিয়ে একটা খোলা এক্কাগাড়ীতে কয়েকজন ইরাণীর মাঝখানে বসিয়ে নিয়ে উধাও। চেঁচিয়ে যে পথ-চারীদের নজর কাড়বে এমন সাহসও ছিল না, ভয়ে ভীত সেই ছেলে যে বাকরহিত হয়ে পড়ল মুহূর্তমধ্যে। মাঝে মাঝে ইরাণীদেরও শাসানি চলেছে, খবরদার যদি একটু চেঁচিয়েছ। খতম করে দেব।

কোথায় যে নিয়ে চলেছে ওরা কে জানে। লক্ষ্মৌর যেপথ দিয়ে ছুটে চলেছে সেই এক্কাগাড়ী সবই চেনা ছেলেটির। কয়েকজন চেনা মানুষকেও দেখতে পেল সে যারা হেঁটে চলেছে। কিন্তু সব সাহস যে সে

হারিয়ে ফেলেছে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে তাদের ইশারা করার।

সন্ধ্যার পরে লক্ষ্ণৌ স্টেশনে কেনোরকমে গা ঢাকা দিয়ে দুজন ইরাণী ছেলেকে নিয়ে এসে একটা ট্রেনের কামরায় ঢুকে পড়ল। দুজনে দুপাশে বসে, মাঝখানে ছেলেটি।

সবার চোখে ধুলো দিয়েই তারা চলেছে কলকাতার দিকে, ওখান থেকে আবার অন্য পথে যাত্রা। কামরার ভেতর কোনো যাত্রী বুঝতে পেল না যে এই ছেলেটিকে চুরি করে নিয়ে চলেছে এরা। রাস্তায় আর একবার শাসানো হয়েছিল যদি কোনোরকম চীৎকার বা সোরগোল করা হয় তবে বুকে ছুরি বসিয়ে দেবে। সেই ভয়ে ছেলের কন্ঠস্বরও রুদ্ধ হয়ে গেছে। মাঝ পথে কিছু আহার এরা ছেলেটিকে দিয়েছে, কিন্তু জলতেষ্টায় কন্ঠনালী যে শুকিয়ে আসছে। মুখ ফুটে বলারও সাহস নেই, একটু জল চাই।

অনেক রাত্রে ট্রেনের ভেতর যাত্রীরা কেউ কেউ বলাবলি করছিল যে এরপর দানাপুর স্টেশন, তারপর পাটনা। পরের স্টেশন মোকামাতে নামতে হবে ওদের। কাজেই যেন ঘুমিয়ে না পড়ে কেউ, তাহলেই স্টেশন পার হয়ে যাবে।

ছেলেটির কানে গেছে এসব কথা। তার মানে এই ট্রেন পাটনা হয়ে কলকাতায় চলেছে। তাহলে তো একবার কোনোরকমে পাটনায় নেমে পড়লেই মামাবাড়ীতে পৌঁছে যাওয়া যাবে।

পাটনায় যে তার মামাবাড়ী এই ছেলেটি জানত। একবার এসেও ছিল মামাবাড়ীতে মায়ের সঙ্গে আরো ছোট থাকাকালীন। তবে রাস্তা-ঘাট চিনে রাখার বয়স নয় তখন। শুধু এইটুকু জানে 'স্বর্ণাসন' তার মামাবাড়ী, আর সেটা নয়াটোলাতে। শুধু এইটুকুই তার দিগদর্শনের ঠিকানা স্মরণে রয়েছে।

রাতের অন্ধকার ভেদ করে ট্রেন চলেছে দ্রুতগতিতে। যাত্রীদের সবার চোখ ঘুমজড়ানো, কেউ কাত হয়ে পড়ছে অন্যের ঘাড়ে, কেউ তন্দ্রাবেশে মাঝে মাঝে ঝুঁকে পড়ছে সামনে। পাশে-বসা দুটো ষণ্ডা ইরাণীও ঢুলে ঢুলে পড়ছে, শুধু নিদ্রা নেই ছেলেটির চোখে। এইবারই সুযোগ কোনোরকমে ফাঁকি দিয়ে ট্রেন থেকে নেমে পড়া পাটনা স্টেশনে। বাথরুমে যাবার নাম করে, এমনই একটা ভাব নিয়ে নিঃশব্দে, কাউকে ঠেলাঠেলি না করে, উঠে দাঁড়াল ছেলেটি যাতে ওই দুজন পাহারাদারদের ঢুলুনিতে কোনো ব্যাঘাত না ঘটে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো সে ট্রেনের দরজার কাছে। ট্রেনটা থামতেই নেমে পড়ল সেই স্টেশনে। স্টেশনটিতে আবার আলো নেই বেশি।

কোনোরকমে নেমে দূরে একটা পুলিশের আড়াল করে দাঁড়াল সে, যাতে লোক দুটো জেগে গিয়ে হঠাৎ যদি আবার ধরতে আসে তখন এই পুলিশের শরনাপন্ন হতে পারে।

ট্রেন আবার নিজস্ব গতি নিয়ে প্লাটফর্ম ছেড়ে চলে গেল। রাত তখন সাড়ে চারটা, ভোর হোতে অনেক বাকী। তবে যে স্টেশনে সে নেমে পড়েছে পাটনা ভেবে, সেটা পাটনা নয়, দানাপুর। তবুও পাটনার কাছাকাছি তো। হাঁটতে হাঁটতেই চলে যাবে পাটনায়। হাতে পয়সা কোথায় যে কোনো সওয়ারীতে চড়ে বসবে।

হাঁটা শুরু করল সে অন্ধকারেই রেল লাইন ধরে পাটনার দিকে। একজন কুলিকে জিজ্ঞাসা করেছিল পাটনাটা কোনদিকে পড়বে। তা না হোলে দিকভ্রম করে যদি উল্টোপথে হাঁটা দিতে হয় তবে তো পাটনায় পৌঁছন হবে না।

ছোট ছোট পা চালিয়ে রেল লাইনের ধার দিয়ে চলেছে সেই ছেলে। ক্লান্ত শ্রান্ত। ভয়ে কাঁপছে সারা শরীর। তবুও এগিয়ে যেতে হবে পাটনাতেই। তার মামাবাড়ীতে। ওখানে না পৌঁছন পর্যন্ত যে মনের ভীতি কাটবে না। ভীতি বিহ্বল এখনও যে সে। আবার যদি ওরা বেঁধে নিয়ে যায় ধরে, তবে কে বাঁচাবে এই আঁধার ভরা পথে!

কোনোরকমে হাঁটতে হাঁটতে যখন সে পাটনা স্টেশনের কাছে পৌঁছল তখন অল্প ভোর হয়ে এসেছে। পূবদিকে একটু সাদা আভা দেখা যাচ্ছে। স্টেশনের অন্দরে ঢুকতে সাহস হোলো না পাছে ওই বলবান লোক দুটো আবার স্টেশনেই ধরে ফেলে তাকে।

রাজপথে এসে একজনকে জিজ্ঞাসা করল নয়াটোলা কোনদিকে। দেখিয়ে দিল সে কোন রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলে সুবিধা হবে। হাঁটার আর বিশ্রাম নেই, ক্লান্ত পা আর যেন এগোতে চাইছে না। মনে হচ্ছে রাস্তার ওপর বন্ধ-দোকানের কোনো একটা রোয়াকে শুয়ে পড়লে ভালো হয়। কিন্তু ষণ্ডামার্কা ইরাণী দুটোর ভয়ে শরীর যে আবার কাঁটা দিয়ে ওঠে। চলার গতি তাই দ্রুত করতেই হয়।

নয়াটোলার স্বর্ণাসন যখন খুঁজে পাওয়া গেল তখন বেশ সকাল হয়ে গেছে। গেট দিয়ে ভেতরে এসেই দেখতে পেল সে তার বড় মামাকে। অনেকবার লক্ষ্ণৌতে গেছেন উনি, কাজেই মুখখানা চেনা।

সিঁড়ির কটা ধাপ উঠেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল মেঝেতে। বড় মামা ছেলেটিকে চিনতে পারেননি তখন। চারিদিকে---বাড়ীর অন্দরে একটা চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেছে, কে এই ছেলেটি, এইভাবে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে

এই বাড়ীতে এসে। উঠিয়ে নিয়ে শোয়ানো হোলো চৌকিতে। জলের ছিটে মুখের ওপর পড়ছে অনবরত। একবার চোখ খুলে আবার চৈতন্যলোপ।

কে হোতে পারে এই ছোট্ট ছেলেটি? সবার মনেই একই প্রশ্ন। চেনা না হোলে এবাড়ীতে আসবে কেন এমন করে? সেই সময় একটা টেলিগ্রাম এলো বড় মামার নামে। পড়েই সব ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল। তখন সবারই মনে হোলো এই ছেলেকে দেখেছে তো তাঁরা, বিশেষ করে বড় মামার, কারণ উনি মাঝে মাঝেই গিয়ে থেকেছেন লক্ষ্ণৌতে তাঁর বোনের বাড়ীতে। এ যে তাঁর আপন ভাগনে।

আবার টেলিগ্রাম গেল লক্ষ্ণৌতে, ছেলেকে এখানে পাওয়া গেছে জানিয়ে। সবাই নিশ্চিন্ত তখন। কিন্তু নিশ্চিতরূপে নিশ্চিন্ত হোতে পারল না সেই ছেলে। ভয়ে ত্রাসে গুমরে থাকে সবসময়, মূর্চ্ছাও যায়। ওই বুঝি আবার এলো ওরা ধরতে।

দেহরোগের চেয়ে মনোরোগেই যে তাকে পরাভূত করে রাখল। ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে গেল শরীর। ভয়ে বিহ্বল থাকে সর্বদাই, কেউ দিতে পারে না তাকে আশ্বাস, না কোনো বিশ্বাস। ভীতিহীন হয়ে থাকার পূর্ণ আশ্বাসন কে দিতে পারে? এটা যে মনের অবচেতনে সর্বদাই কম্প-মান অবস্থায়। শলাকার মতো বিধে রেখেছে যে সেটা, ক্ষণিকের তরেও নেই কোনো পরিত্রাণ।

একদিন সে ধরা দিল নিজেই সেই করুণানিকরের কাছে, যিনি দিয়েছিলেন এই শরীর কিন্তু দিতে পারেননি বেঁচে থাকার পূর্ণ নিরাপত্তা কিংবা আত্মশক্তির সামর্থ।

শহরের ভাড়াটে বাড়ী ছেড়ে আমরা সবাই গিয়েছিলাম আদালত গঞ্জের কোয়াটারে, সেটা ১৯৪৮ সালে। কোয়াটারে মোটে তিনখানা ঘর। বড় দুটো ঘরের একখানা ছিল আমার বড় দাদার ও দ্বিতীয়টা মা-বাবার জন্য। মাঝের যে-ঘর, সেটা ছিল ড্রয়িংরুম।

আমার ঠাঁই হোলো গিয়ে সার্ভেন্টরুমে। দালানের সামনের দিকে খোলা মাঠের মুখ করে। সেটা এক হিসেবে ভালোই ছিল। একটু নিরিবিলি। নিজের ঘরটি গুছিয়ে না বসলে আমি স্বস্তি পেতাম না একদম। অগোছালো ঘর দেখলে আমার মনটা যেন কেমন বিরক্তিতে ভরে যেতো। এখনও যায়। কাজেই যেখানে থেকেছি, বাড়ীঘর সুন্দর করে গুছিয়ে না রাখলে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতাম না।

একটা সুন্দর গৃহের বাসনা ছিল আমার মনের মধ্যে বরাবর, তাই বোধহয় বারবার গৃহযন্ত্রণার কষ্ট পেয়েছি খুব বেশি। আদালতগঞ্জের সেই চাকরবাকরদের ছোট্ট ঘরখানা সুদৃশ্য করে সাজিয়ে রেখেছি আপন ঘর ভেবে। বাগান করার শখ ছিল ভীষণ, সেটা ছোটবেলা থেকেই, চৌহাট্টার বাড়ীতে মাটির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না, তাই বাগান করতে পারিনি সেখানে। তাও মাটির ছোট বড় টব কিনে তাতে নানা গাছ লাগিয়ে ফুল ধরিয়েছি। ছাদের ওপর দেয়ালের মাথায় একটু চওড়া জায়গা ছিল সেটাকে ঘিরে তাতে মাটি ফেলে একটা লম্বা বেডের মতো করে সেখানে গাঁদাফুল ও বেলফুলের চারাও বসিয়েছিলাম।

আদালতগঞ্জের কোয়াটারের সামনে বাগান করার জায়গা ছিল প্রচুর। তাতে লেবুগাছ থেকে আরম্ভ করে নানাজাতের ফুল, পাতাবাহারের গাছ লাগানো ছিল। সামনেই খোলা মাঠ। কোয়াটারের ছেলেদের ওটাই ছিল খেলাধুলোর জায়গা। ফুটবল ম্যাচ, ক্রিকেট ম্যাচ সবই হোতো সেখানে।

কোয়াটারের বারান্দায় বসে সেসব দেখতে ভারি ভালো লাগত। কিন্তু নিজের থাকবার ঘরটা যদি একটু অন্যজাতের হোতো তাহলে বোধহয় আরো ভালো লাগত। কিন্তু সেটা তো হবার কোনো উপায় নেই, কাজেই অল্পেতেই সন্তুষ্ট ছিলাম। এইঘরে একটা চৌকি পেতে, একটা কোণে কোনোরকমে একটা ছোট্ট টেবিল ও চেয়ার আটানো যেতো। সেই ঘরেই আমার পড়াশোনা, লেখা, শোয়া সবই চলত। লাইটের কোনো ব্যবস্থা ওই ঘরে না থাকায়, মেন-দালান থেকে একটা আলগা তারের কানেকশন নিয়ে ছিলাম সেই ঘরে। এটাই ছিল আমার নিজস্ব পরিবেশের মৌতাতমাখানো ঘর।

কিন্তু ভারি কষ্ট হয়েছিল সেদিন যেদিন বিয়ে হবার কদিন পরেই ওই চাকরবাকরদের জন্য নির্দিষ্ট স্বতন্ত্র ঘরে নববধূর ঠাঁইটাও স্থাপিত হোলো। এই ক্ষুদ্র ঘরটুকু যেটা বাড়ীর বহির্দ্বারে অবস্থিত সেখানে যে নববধূর স্থান হবে কখনো ভাবতে পারিনি। একা যখন ছিলাম তখন বলার কিছু ছিল না। কিন্তু দুই অবয়বযুক্ত হবার পর একটু কুন্ঠা এলো মনে। কারুর কোনো আপত্তি উঠল না দেখলাম। সবাই নীরব।

বড়দাদার কোয়াটার এটা, এই বাড়ীর কর্তাব্যক্তি উনিই, কাজেই বাড়ীর কে কোথায় শোবে থাকবে সেটা ওঁরই দেখার কথা। কিন্তু তিনি নিজেই যখন এই ব্যাপারে উদাসীন হয়ে রইলেন, তখন কারুর কিছু বলার সাহস ছিল না।

এটা নিয়ে আমি আর বিশেষ মাথা ঘামাতাম না। কিন্তু ভারি কষ্ট হোতো গ্রীষ্ম-বর্ষার দিনে। ছোট্ট ঘরে পাখার হাওয়া খাবারও উপায় ছিল না কারণ শিলিং ছিল বড্ড নীচু। প্রকৃতির হাওয়া যে প্রবেশ করাব ঘরের মধ্যে, রাত্রে দরজাটা খুলে রেখে, তারও তো জো ছিল না। রাস্তার ওপরে চলমান মানুষের একটা দৃষ্টি পড়তই ওই ঘরে যতই না পর্দার আড়াল করে রাখা হোক সেই সার্ভেন্টরুম। সমাজের শিষ্টভদ্র ও মার্জিত স্বামী-স্ত্রীর বেডরুম যে কী করে হোতে পারে সেটা, বাইরের লোকও ভেবে আশ্চর্য হয়ে যেতো।

কিন্তু কেনো আলোচনা উঠত না বাড়ীর মানুষদের মধ্যে। নববধূও নীরব। কারণ তাঁর তখনও এনিয়ে কোনো ঝড় তোলার মানসিকতা তৈরী হয়নি। শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা মাঝে মাঝে যখন আসতেন, তাঁদের কাছে আমাদের দুজনের এই অবস্থান খুব সুরুচিকর বলে মনে হোতো না।

এইভাবে রয়ে গিয়েছিলাম এই ঘরটিতে তিনটে বছর। কিন্তু আরো বেশিদিন থাকার মতো উপায় ছিল না কারণ স্ত্রীর গর্ভে তখন একটি শিশু জন্মাবার উপক্রম হয়েছে, কাজেই ঘর বদল করা একান্তই দরকার।

এতদিন যে-গলাটাকে শান্ত করে রেখেছিলাম, তার ভেতর থেকে এবার কয়েকটি খরখরে বাক্যের প্রয়োজন আছে বলে মনে হোলো। তা না হলে এই অদ্ভুত অশোভনীয় ব্যবস্থার কোনো রদবদল হওয়া মুস্কিল। সেদিন উষ্মার প্রকাশটা কর্কশ না হোলেও খুব শ্রুতিমধুর ছিল না। ঠাণ্ডা মাথা নিয়েই সবার কাছেই একটা আবেদন করেছিলাম ঘরটা বদলাবার জন্য।

ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করলেন বাবা। উনি নিজে কিছু না বলে আমার দিকে চেয়ে রইলেন কী ব্যবস্থা করলে ভালো হতে পারে জানার জন্য।

স্থির হোলো মাঝের ঘরটাতে মা-বাবা থাকবেন। সেখানে ড্রয়িংরুম বলতে যে চারখানা বেঢপ সাইজের বেতের চেয়ার ছিল সেগুলো বাইরের তিনদিক ঘেরা বড় বারান্দায় স্থাপিত হোলো। ওনারা চলে গেলেন মাঝের ঘরটিতে আর আমরা চলে এলাম যে-ঘরে ওঁরা ছিলেন সেটিতে। বাইরে থেকে অন্দরে প্রবেশ হোলো আমাদের এই প্রথম।

আগেই উল্লেখ করেছিলাম যে আমার বড় বৌদি মারা গিয়েছিলেন গর্ভে সন্তানধারণ অবস্থায়। চারটি সন্তান তখন শৈশবের দোর পেরোয়নি এদের মানুষ করার ব্যাপার নিয়ে বা পড়াশোনা নিয়ে কোনোকালে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন বোধ করেননি আমার বড়দাদাটি। এই বিষয়ে পুরো-পুরি ছিলেন কর্তব্য নির্মুক্ত, আসক্তিশূন্য। শুধু অফিসের কাজ, আর বাড়ীর

সঙ্গে সম্পর্ক শুধু আহার ও শোয়া নিয়ে। যে-নেশা তাঁকে এসব দায়-দায়িত্ব থেকে পুরোপুরি সম্বন্ধহীন করে রেখেছিল, সেটা হোলো তাঁর তাস খেলা।

তাসের নেশা তাঁকে এমনভাবে আবিষ্ট করে রেখেছিল যে সারারাত তাস পিটিয়েও আশ মিটত না তাঁর। ছুটির দিন হোলে তো এটার মাত্রা যেতো আরো বেড়ে। দুপুরের আহারটি কোনোরকমে সেরে সেই যে খেলতে যেতেন বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ীতে, সেদিন তিনি অন্যজগতের মানুষ। সংসারের কথা, ছেলেমেয়ে স্ত্রীর কথা ভুলেই যেতেন। পরের দিন সকালে ফিরতেন শুধু অফিস যাওয়ার তাড়াতে।

এই নেশা ছাড়া আর কোনো বদনেশা তাঁকে উৎপীড়িত করতে পারেনি। ভালো খেলতেন ঠিকই, অনেক ট্রফিও জিতে এসেছেন তাসরে কমপিটিশনে, সেটা গৌরবের ব্যাপার সন্দেহ নেই।

কিন্তু তাই বলে কী সংসার ভুলে ছেলেমেয়েদের দায়িত্ব থেকে নির্মুক্ত থাকতে হবে? এমন তাসের নেশা আমি অন্তত খুব কম লোকের মধ্যেই দেখেছি যিনি সংসার থেকে সংশ্রবশূন্য হয়ে শুধু খেলেই চলেছেন আত্ম-সমাহিত হয়ে। প্রতিদিন রাত দুটো তিনটেতে বাড়ী ফিরে দরজার কড়া নাড়তেন ধীরে ধীরে যাতে অন্যরা জেগে না ওঠে। কিন্তু এটা বুঝতেন কিনা সন্দেহ যে তাঁরই নিকটতম একজন জেগে আছেন এই কড়া নাড়ার প্রতীক্ষায় সারারাত। তাঁর চোখে যে ঘুম নেই।

বড়বৌদি বেঁচে থাকাকালীন এটা হোতো খুব বেশিরকম। নানারকম বাদবিবাদ করেও এটাকে বন্ধ করতে পারেননি তিনি। ফলে তাঁর মানসিক চাপ বেড়ে থাকত সবসময়। শরীরের ওপরেও রোগের রেখাপাত করছিল সেই কারণে। নিজের রোগের কথা চেপে রাখতেন। আর বলবেনই বা কাকে? আপন মানুষটির যে ঘরের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই। শুধু খাওয়া-থাকার ব্যবস্থাটা করে দিলেই হোলো? ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করছে কিনা, তারা সময়মত ইস্কুলে যাচ্ছে-আসছে কিনা, এসব জানারও কোনো আগ্রহ ছিল না। ফলে ছেলেমেয়েরা সব তৈরী হচ্ছিল নিজস্ব এক একটা রূপ নিয়ে। সেটা যদি ভালোর দিকে হোতো তবে তো কোনো কথাই ছিল না। চলার গতিটা যদি বিপরীতমুখী হয়ে পড়ে তখনই তো হয়ে যায় সব বেচাল। পরে আর তাকে শাসনের নিয়ন্ত্রণে আনা কঠিন। তখন আর তাকে বিপরিণত করা যায় না। এর পর বিপর্যায়ের দুর্ভোগ থেকে যে কদাপি মুক্তি পাওয়া মুস্কিল।

বড়বৌদির অকালমৃত্যুটা তাঁর মানসিক আঘাতের দরুন বলেই মনে

হোতো। দৈহিক রোগটাতো অবচেতন মনের পীড়ারই বহিপ্র্রকাশ।

ভেবেছিলাম বড়বৌদির মৃত্যুটা হয়ত বড়দাদার জীবনপথে একটু মোড় নেবে। কিন্তু ভাবাটাই আমার সার ছিল। বরং সেটা বিপরীত রূপ নিল। মা নীরব থাকতেন এই ভেবে যে স্ত্রীরত্নটি হারিয়ে ছেলের জীবনে সাধ আহ্লাদ করার আর আছে কী? বাড়ীতে না থেকে যদি বাইরে গিয়ে তাসের খেলায় মেতে থাকতে পারে, তাতে মনটা একটু লঘু করে আনন্দঘন করে রাখতে পারে। মন যদি তাতেই ডুবে থাকতে স্ব-প্রয়াসী, তবে লাভ কী তাকে বাধা দিয়ে?

এটাই ছিল মা'র তাঁর বড় ছেলের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহমমতার সম্মতিসূচক অনুমত। ফলে নাতিনাতনিদের সারাদিনের নানা দৌরাত্ম্য উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে। সেসব কথা ছেলেকে বলতেও সাহস করতেন না। কারণ জানতেন, এসব প্রকাশ করা মানে হোলো বাপের কাছে বেধড়ক প্রহার। প্রহারের চোটটা যে পরে তাঁকেই সামলাতে হবে। সেটা যে হবে আরো মারাত্মক, শুধু তাই নয়, ভয়াবহ হয়ে উঠবে তার পরিণতি। এখনও তাদের যেটুকু নাগালের মধ্যে ধরে রাখা সম্ভব, সেই রাশটাও যে একেবারে শিথিল হয়ে যাবে।

আদালতগঞ্জের কোয়ার্টারে এসে আমার প্রথম কাজ হয়েছিল এই বাড়ীর অশান্ত অবস্থাকে একটু সংযত করে আনা। ছেলেমেয়েদের পড়াবার দায়িত্ব নিয়ে নিলাম আমি, সকালে ও সন্ধ্যায়। পাঠশালায় যেরকম পড়াবার ব্যবস্থা হয় সেইভাবে সবাইকে মেঝেতে শতরঞ্জি বিছিয়ে পড়ানো শুরু করেছিলাম। বিকেলে অফিস থেকে ফিরে, কোথাও না গিয়ে ওদের নিয়ে বসাটাই ছিল আমার কর্তব্যকর্ম। অনেকখানি সফলও হয়েছিলাম এই কাজে।

কিন্তু এসবই ছিল আমার দুরাকাঙ্ক্ষা। যে চপলপ্রকৃতি ধূর্ততার ব্যাধির প্রবেশ ঘটেছিল এদের মধ্যে প্রথম থেকেই, সেটা ছিল আরোগ্য-দুঃসাধ্য। দুর্নিবার ছিল এদের কপটতা, ভয়ংকর দুর্বিনীত হয়ে পড়ল এরা ধীরে ধীরে। বাপের আস্কারায় আদুরে ছেলেমেয়ে দুষ্টুবুদ্ধিশীল হয়ে অনেক চুকলি খেতে শুরু করল খুড়োখুড়ীর বিরুদ্ধে। পরোক্ষে ও অসাক্ষাতে অনেক নিন্দা শুরু করে দিল আমাদের। কানপাতলা বাপের কাছে একচক্ষুহীন হোয়ে কানভারী করে দেওয়ার মতো যথেষ্ট ঝাঁজ ছিল তাতে।

বিয়ের পর নিজের স্ত্রীকেও টেনে এনেছিলাম এদের মানুষ করার সৎ কাজে আমাকে সহযোগিতা করার জন্য। তাঁকেও বুঝিয়ে সুজিয়ে মা-

হারা সন্তানদের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তুলেছিলাম। তিনিও বর্ষণ করেছিলেন যথাসাধ্য তাঁর স্নেহমমতা। সন্তানবৎ জ্ঞান করে মাথায় নিয়েছিলেন এদের দায়দায়িত্ব আমার মতোই। যুগ্মভাবে শুরু হয়েছিল ওদের পড়াশোনার ভাবনা, ওদের পোশাক-পরিচ্ছদের দিকে পেলব চেতনা।

কিন্তু সফল হতে পারলাম কোথায়? বাল্যবয়সে পরায়ত্ত থেকে যে নিশ্চিন্দি, সেটা যে তাদের পছন্দ হোলো না। অনেক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে দুজনেই মা-হারা সন্তানদের নিজের মনে করে মানুষ করে তুলব বলে ব্রত নিয়েছিলাম। একদিকে যেমন শাসনের কড়াপাহারা ছিল নিশ্ছিদ্র, অন্যদিকে বাপের কারুণিক হৃদয়ের সেই শাসনের কাঠিন্য হয়ে পড়ত শিথিল। ফলে তারা হয়ে পড়ল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির।

ক্রমে ক্রমে আমাদের দুজনের পক্ষে এই বাড়ীর আবহাওয়া কেমন যেন অস্বস্তিকর মনে হোতে লাগল। সর্বদাই উদ্বেগের মধ্যে থাকতে হোতো। এই বুঝি কোথাও ছেলেগুলো অঘটন ঘটিয়ে আসছে যা নিয়ে পাড়ার অন্যান্যরা এসেছে নালিশ জানাতে। মনের এই অস্থিরতা যে দিন দিন বেড়েই চলল। সমাধানযোগ্য কোনো পথই খুঁজে পাচ্ছি না। বড় ভাই যিনি, তাঁকে যে এই সমস্যার গুরুত্ব নিয়ে একটু আলোচনায় বসব তাঁরই ছেলেদের আচার-আচরণের প্রশ্ন নিয়ে, তার কোনো সমর্থনযোগ্য আভাস তাঁর কাছ থেকে পাচ্ছিলাম না। সন্তানদের প্রতি বাৎসল্য উজাড় করে দেওয়ার প্রয়োজন আছে বৈকি। কিন্তু সেখানেও শাসনের দণ্ডটা যদি মাঝে মাঝে দোলায়িত না হয়, তবে যে তাদের আস্পর্দ্ধা ও বাড় ক্রমশ বেড়ে যেতে বাধ্য। তখন শত শক্তি দিয়েও সেই শিথিল বল্গা আঁকড়ে রাখা কঠিন। তখন যে হতপ্রায় অবস্থায় হা-হুতাশের জ্বালায় পুড়ে মরতে হবে নিজেকেই। এরাই আবার বড় হয়ে যখন আত্মজ্ঞ হয়ে নিজের দোষগুণ ও স্বভাব জানতে শিখবে তখন ক্রোধ বর্ষিত হবে বাপের ওপর, কেন সময়-কালে তাদের শাসনে রাখা হয়নি।

একদিনের একটা ঘটনা কীভাবে একটা যৌথ পরিবারকে বিচ্ছিন্ন করে তুলেছিল সেই ঘটনার প্রকাশ এখানে করছি।

আমার প্রথম পুত্রটি তখন বয়স বেড়ে তিনের পথ ধরেছে। অকস্মাৎ ওর মুখে একটা কুৎসিত দেশজ গালাজ শুনে আমি চমকে উঠলাম। এসব বাক্য তো শেখার মতো বয়স হয়নি তার, তাছাড়া বাইরে ওকে কোথাও একা যেতেও দেওয়া হয় না যেখান থেকে এই গালাজ শিখে আসবে।

পুত্রকে এনিয়ে কোনো তিরস্কার না করে মোলায়েম করে শুধু জিজ্ঞাসা করলাম, একথাটা তুমি কার কাছে শিখলে বল তো?

শিশুসুলভ প্রকৃতির ঘোরপ্যাঁচ শেখার বয়স হয়নি তখনও। সহজ-ভাবেই বলল, ছোড়দা শিখিয়েছে, আর বলেছে রোজ রোজ বলতে।

আমি নীরব হয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। ক্রোধে তখন আমার শরীর কাঁপছে। বিষণ্ণ হয়ে রইলাম দুদিন। শুধু চিন্তা করে চলেছি, এই বয়স থেকে যদি আমার সন্তানটিকে তার দাদাদের আদর্শ ধরে এগিয়ে চলতে হয় তবে যে সর্বনাশের আর কিছু বাকী থাকবে না। এখন থেকেই গুরু-গিরি শুরু হয়েছে ওদের লাইন ধরাবার।

কথাটা আমার পিতৃদেবের কাছে পাড়লাম। উনি শুনে খুবই দুঃখ পেলেন। তাঁর পক্ষে বলার তো কিছু নেই, তিনিও যে নিজের চোখেই দেখছেন এদের বেহায়াপনার বহরটা। অত্যাচারিত হয়ে বাস করছেন এখানে। কোথায় যেন তলিয়ে গেছে তাঁর সেই উঁচুমাথার মর্যাদা নিয়ে স্বাধীনভাবে বাস করার দিনগুলি। মনোবেদনায় নীরব হয়ে থাকেন। নৈরাশ্যে ভেঙ্গে পড়ার মতো, চোখ দুটো যেন জলে ভরে চিকচিক করতে থাকে। বাড়ীর পরিমণ্ডল যে বিষিয়ে উঠছে ক্রমশ।

বড়দাদার কানেও তুললাম গালিগালাজ শেখাবার মন্ত্রণা কীভাবে দেওয়া হচ্ছে আমার পুত্রসন্তানটিকে। কোথায় যেন সেদিন হারিয়ে গেল বড়দাদার সেই অহংকারী মনের আত্মচেতন? আত্মগরিমায় খেঁকিয়ে উঠে বল্লেন, থাকো না গিয়ে আলাদা বাসা করে। আমি তো কাউকে এখানে আসতে বলিনি?

এতদিনের স্থিরচিত্ত মনে একটা বিরাট তরঙ্গ এসে প্রচণ্ড ধাক্কা মেরে আমার আত্মমর্যাদা বোধটা নিজের চেতনাকে সতর্ক করে দিল। চিত্ত-ক্ষোভে জর্জরিত আমি সেদিনই বাবার অনুমতি পেলাম অন্য গৃহে যাবার। গৃহকে বেশি ভালোবাসতাম বলেই বোধহয় এক গৃহ থেকে অন্য গৃহে স্থাপিত হলাম ক'মাস পরেই গর্দানিবাগের সরকারী আবাসে।

আমার বড়দাদা তো নিশ্চিন্ত হলেনই। অফুরন্ত খুশিতে আত্মহারা হোলো আমার ভাইপোর দল বিপক্ষের পরাভবে।

আমরা এখান থেকে চলে যাবার পর বাবা প্রায়ই আসতেন আমার কোয়াটারে পায়ে হেঁটে বৈকালী ভ্রমণের উদ্দেশ্য নিয়ে; আমরা কেমন আছি এটা দেখে যাওয়াটাই নিহিত লক্ষ্য। অনেকক্ষণ বসে থেকে, ক্লান্ত ভাবটা কাটিয়ে, আবার পাড়ি দিতেন আদালতগঞ্জের দিকে। মন যে ফিরে যেতে চায় না তাঁর। বার বার করে পেছন ফিরে তাকান আমাদের দিকে।

চাপদণ্ডে জ্বলে পুড়ে মরতে হচ্ছে যে অনবরত সেখানে।

বাবা তবুও ইতস্তত করেন আমার কোয়াটারে থাকা নিয়ে। বড় সন্তানকে কী ওইভাবে ফেলে আসা যায়? তাছাড়া মা যে রয়েছেন ওখানে।

যে-পিতার মন কেঁদে মরে নিজের সন্তানের একাকীত্বের দুর্দশা দেখে, সেই ছেলের মনে কিন্তু কোনো বিবর্তন নেই। সবার ওপরেই একটা বিদ্বেষক মনোভাব। অনিষ্ট করার সংকল্প নিয়ে আস্ফালন। আমার বিরুদ্ধে চতুর্দিকে হীন প্রচার করার কু-অভিযানে সবিশেষ ব্যগ্রতা। আঘাতের পর আঘাত দিতেই যেন দৃঢ়চিত্ত। কোয়াটার ছেড়ে চলে গেছি বলে চিঠির পর চিঠি আত্মীয়বর্গকে, স্বজন পরিজন কেউ বাদ পড়েনি আমাকে ছোট করার জন্য। অনেক কিছু বানিয়ে চলত অভিযোগ নিজেকে মুক্ত রেখে। তাদের কাছে আমার নিন্দে করে তাদের সঙ্গে আমার সদ্ভাব নষ্ট করার পেছনে ছিলেন অবিরত সোচ্চার। লাগানো-ভাঙ্গানোতে ছিল না কোনো ক্লান্তি। আমাকে অপদস্থ করানোতে ছিলেন বদ্ধপরিকর।

হীনচেতা, সংকীর্ণমনা সেই আমি মানুষটি কিন্তু এখনও জ্ঞাতিগোষ্ঠী নিয়ে জীবনস্বত্ব ভোগ করে চলেছি। আমার অগ্রজ কিন্তু লৌকিক-বাস ত্যাগ করে চলে গেছেন কয়েক বছর আগে একটি ভয়ংকর দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগে। যাবার আগে আমাকে ডেকেছিলেন বার বার একটিবার দেখার জন্য। দাঁড়িয়েছিলাম গিয়ে আমরা দুজনেই রোগশয্যার পাশে। চোখের জল তখন তাঁর দুগাল দিয়ে ঝরেই চলেছে। আকুতিভরা নয়নে যেন তখন কীসের প্রার্থনা!

যে কোনো প্রচারকার্যের একটা ঝাঁজ থাকে। তার উষ্ণতাও ভয়ানক সেটা একদলকে প্রভাবিত করে উত্তেজনার সৃষ্টি করে। আমার অগ্রজের কোয়াটার ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রচার এমনভাবেই ব্যাপ্ত হয়েছিল চতুর্দিকে যার ফলে আমার সঙ্গে কয়েকজন আত্মীয় চিঠি লেখাও বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু কিছু মানুষ যাঁরা সত্যান্বেষী তাঁরা কিন্তু প্রভাবিত হলেন না একটুও। তাঁদের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা মধুরই ছিল বরাবর। গর্দানিবাগের কোয়াটারে চলে আসার পর একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, পাটনাতে যেসব আত্মীয়রা আসেন, তাঁরা কিন্তু সবাই আদালতগঞ্জের বাড়ীতেই ওঠেন। এটাই স্বাভাবিক, কারণ ওখানেই যে মা-বাবা রয়েছেন। কিন্তু আমার এখানে এসে দেখা করাটাও প্রয়োজন আছে বলে মনে হোতো না তাঁদের। তখন বুঝতাম যে আমার বিরুদ্ধে প্রচার কাজটা ভালোভাবেই করা হয়েছে।

একটি সুন্দর ঘটনার কথা বলি। তখন আমার আস্তানা আদালত-গঞ্জেই। আমার এক মাসীমা ছিলেন পাটনাতে। বিধবা মাসীমা তাঁর একমাত্র মেয়ে নিয়ে থাকতেন তাঁর বড় ছেলের কাছে, ভেটারিন্যারি কলেজের দিকে। এই মেয়ের বিয়ে হয়নি তখনও, তাই মাসীমার চিন্তা-ভাবনার শেষ নেই। বিধবা মানুষ দুই একটা মোটা সোনার গহনা যা আছে সেটাই সম্বল মেয়ের বিয়ের জন্য। বাকী অর্থের আশা রাখেন তাঁর দুই ছেলের ওপর।

আমার এই মাসতুত বোন দেখতে কিন্তু ভারি সুন্দর। রং ফর্সা, টিকলো নাক, টানা চোখ। রূপের সবই বর্তমান, কিন্তু একটা চোখ তার অসম্ভব রকম টেরা। যে দেখে তারই পছন্দ হয়, কিন্তু টেরা চোখটাই যে বিয়ে না হবার সর্বনেশে কারণ হয়ে দাঁড়ায় পাত্রপক্ষের কাছে। মাসীমার সেটাই দুঃখ, মরার আগে মেয়েটার একটা ব্যবস্থা না করে গেলে যে শান্তিতে যাওয়া যাবে না। তাঁর মনের দুঃখটা একবার পাড়লেন আমার কাছে।

হৃদয়ঙ্গম করলাম ব্যাপারটা পুরোপুরি, কীভাবে এই টেরছা চোখ মনোহর করে পাত্রপক্ষকে শীতল করা যায়। বিয়ের প্রস্তাব করার প্রথম পদক্ষেপ হোলো ফোটো দেখিয়ে পাত্রপক্ষের মেয়ে দেখার আগ্রহকে একটু উসকিয়ে দেওয়া। সম্বন্ধের প্রারম্ভিক ভূমিকাতো এটাই। সেই পরীক্ষায় উতরে গেলে তবে সামনাসামনি মেয়ে দেখার প্রশ্ন ওঠে।

মেয়ের ভাগ্য ভালো বলতে হবে। কয়েকদিনের মধ্যে একটি সম্বন্ধ এসে হাজির। আমাদের চেনাজানা পরিবার সদ্বংশীয়। ছেলেটিও সরকারী চাকুরে। আমার কাকার সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত, টেলিগ্রাফ অফিসে একই সঙ্গে কাজ করে।

ফোটো দেখাতে হবে প্রথমে, তারপরে বাকী পর্ব। আমার এক বন্ধু ফোটোগ্রাফারের শরণাপন্ন হোলাম। আমার ফোটোগ্রাফির হাতে খড়ি ওর কাছেই। ওর দোকানে নতুন কোনো ফরেন ক্যামেরা এলেই তার ছবির পরখ আমাকেই করতে দিত সে। খুবই ঘনিষ্টতা ছিল আমার সঙ্গে যখন আমরা চৌহাট্টা পাড়াতে থাকতাম। ওকে বল্লাম সব কথা খুলে, একটা আশ্বাসবাণীও বেরিয়ে এলো ওর মুখ থেকে।

ফোটো তোলার দিন মেয়েকে এমনভাবে সে মুখ নীচু করে বসালো, সুন্দর করে ভঙ্গিমা করে হাতে বই নিয়ে, যাতে ফোটোতে ধরা পড়ে যে বই নিয়ে যখন পড়ায় মগ্ন, সেই সময় ধরা পড়েছে ক্যামেরার ছবিতে। মুখ উঁচু করে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে সাধারণত যে ভঙ্গীতে বিয়ের জন্য ফোটো তোলা হয়, সেই গতানুগতিক প্রথা একেবারে এড়িয়ে গেল সে।

ভারি সুন্দর হয়েছিল সেই ছবি; এমনিতে তো দেখতে ভালোই, পাঠরত ভঙ্গিমায় অপূর্ব লেগেছিল ছবিতে।

ফোটো দেখে তো পাত্রপক্ষের দারুণ পছন্দ। পরবর্তী পরীক্ষা খুবই জটিল। যেদিন মেয়েকে সামনাসামনি দেখতে আসবে ওরা, সেদিন ভালো করে বোঝালাম মেয়েকে, তুমি কখনো মুখ উঁচু করে চোখাচোখি কারুর সঙ্গে কথা বলবে না। পাত্রপক্ষের দল যা প্রশ্ন করবে, তুমি মুখ অবনত রেখেই তার উত্তর দেবে। মনে হবে লক্ষ্মীমন্তী মেয়ে মুখ উঁচু করে কথা বলতেও লজ্জা পাচ্ছে! চাঁদের মতো সুন্দর মুখখানা নীচু করে হাসি-হাসি ভঙ্গীতে উত্তর দেবে। দেখবে পছন্দ ওদের হবেই।

আর ঠিক হোলোও তাই। পাত্র নিজেও এসেছিল দেখতে। সুতরাং কেউ চোখে দেখেনি মেয়েকে, একথা বলতে পারবে না। অনেক প্রশ্নই তারা করেছে, সবগুলোর উত্তরও এসেছে চট করে। মুখমিষ্টতা ও মুখশ্রী দেখেই কিন্তু এই মেয়ে পার হয়ে গেল। অক্ষিপুট নিমীলিত কেন, এই প্রশ্ন সেদিন কেউ আর করেনি। পরে অবশ্য এ নিয়ে একটু কথা উঠেছিল। বলেছিলাম, পাত্রপক্ষের সবাই তো সশরীরে পাত্রীকে দেখেছিলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। মেয়ের টেরা চোখ, এত জোড়া চোখেও যদি ধরা না পড়ে থাকে, সেটাতো তাদেরই দৃষ্টিহীনতার লক্ষণ!

পাত্রী কাজের ও সুন্দর দেখতে ছিল বলেই এটা পাত্রের মনে আর কোনো ক্ষোভের সৃষ্টি করেনি।

এই ঘটনার কথা উল্লেখ করলাম এই কারণে যে এতো করেও মানুষের মন জয় করা বড় কঠিন। অকপটে এতখানি উদার হৃদয় নিয়ে একটা বড় দায়িত্বের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে বিয়ের সব কিছুর ব্যবস্থা নিষ্পন্ন করেও পরে বেশ একটা বড় আঘাত খেতে হয়েছিল আমাকে। মেয়ের কৃতজ্ঞতা বোধটাই, বোধ করি উবে গিয়েছিল মন থেকে। অবশ্য তার পেছনে একটা বড় হেতু কাজ করেছে।

আগেই বলেছি প্রচারকার্যের একটা প্রতাপশালী রূপ আছে। কাউকে সেটা বিখ্যাত করে তোলে, কখনো কখনো আবার বহু নীচেও নামিয়ে দেয়, সেখান থেকে তখন আর উত্থান পাওয়া বড় কঠিন।

আমার অগ্রজের আমার বিরুদ্ধে কটুবাক্য এমন একটা রূপে পরিগৃহীত হয়েছিল সবার কাছে যে, যে দেখে সেই তখন আমাকে এড়িয়ে চলে, বর্জন করতে পারলেই যেন ভালো।

দুঃখ পেতাম যখন দেখতাম এই মাসতুত বোনটি ভাইফোঁটার সময় শুধু আমার অগ্রজকেই আমন্ত্রণ করে যেতো। আমি পড়তাম বাদ।

আমাকে সে ফোঁটা দেওয়ার যোগ্য পাত্র বলেই মনে করত না। কী করে যে রাতারাতি বদলে গেল এই মেয়ে সেই কথাই ভাবতাম। এরজন্য কোনো সংকোচ হোতো না আমার অগ্রজের, যিনি ফোঁটা নিতে যেতেন একখানা শাড়ী হাতে নিয়ে। বোধহয় আনন্দে ডগমগ হোতেন আমাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয়েছে ভেবে।

যতই প্রশস্ত করে চলতে চাইনা কেন মানুষের সঙ্গে মেলামেশার আসন, বাইরে থেকে যখন বাধা পাই, তখনি দুঃখ আসে মনে। উৎপীড়িত হই। প্রত্যেকের মধ্যেই একটা মানবিক বিশুদ্ধ সুরের গুঞ্জরণ রয়েছে, সেই সুরটা যদি অন্যের সঙ্গে মিশ্রিত না হয়ে শুধু প্রতিঘাত খেতে থাকে, তখন দূর ও নিকট সুরের যে সামঞ্জস্য থাকা দরকার সেটা হয়ে পড়ে কর্কশ।

গর্দানিবাগে আমাদের এলাকার কাছাকাছি ছিলেন আমার এক অফিস বন্ধু। বিপত্নীক ছেলেমেয়ে নিয়ে তাঁর সমস্যাটা ছিল আবার ভিন্ন প্রকৃতির। দু-ছেলে এক মেয়ে তাঁর। নিজে রান্নাবান্না সেরে, খেয়ে দেয়ে তবে অফিসে যেতেন। বড় মেয়ে বাকী কাজটা সারত। বাড়ীতেই থাকত সে, কাজেই ছোট ছোট দুটি ভাইয়ের পরিচর্যা সেই করত ওরা স্কুল থেকে ফিরে এলে। তবে বাড়ীতে একটা মেয়ের একা থাকার দরুন যে-সব ঝড়ঝাপটার সম্মুখীন হোতে হোতো, তার চেয়ে বড় সমস্যা ছিল এই বন্ধুটির। পাড়ার ছেলেছোকরাদের ইতরামি ও কোয়াটারের চারিদিকে অল্পবয়সী কয়েক-জনের ঘোরাঘুরি ও সন্ধ্যে হোলেই রাস্তার কালভার্টের ওপর বসে নানা-রকমের ফাজলামো হচ্ছে দেখতে পেতেন তিনি। এবং এসবই যে তাঁর যৌবন-লক্ষণা মেয়েকে কেন্দ্র করে প্রসারযুক্ত, এটা বুঝতে অসুবিধা হোতো না তাঁর। তবে মেয়ের ওপর অগাধ আস্থা থাকার দরুন এনিয়ে তাকে কোনো তিরস্কার বা বাইরের ছেলেদের ওপর কোনো আস্ফালন করতেন না। এটা বুঝতেন যে কিছু বলতে গেলেই তাদের উপদ্রবের আয়োজন দ্বিগুণ হয়ে পড়বে। মেয়েকে একটু সাবধানে থাকতে বলেই তাঁর দায়িত্বটা সেরে ফেলতেন। কিন্তু এটা তিনি কোনোদিন বোঝবার চেষ্টা করেননি যে, মেয়ে অতি স্নেহভাজন হওয়ার দরুন আদরে নষ্ট হয়ে গেছে। সে-ও যে অপরাধ প্রবণ ও ন্যূনতার শিকার হোতে পারে, সেটা কখনই ভাবতেন না। কাজেই বাপের এই অন্ধ ভালোবাসার দুর্বলতা মেয়েটি ভালোভাবেই কাজে লাগালো। বাপ অফিসে চলে গেলেই সে বেরিয়ে আসে বাইরের ছেলেছোকরাদের সঙ্গে আড্ডা মারতে। উচ্ছৃঙ্খলতার সূত্রপাত সেখান

থেকেই। বাপের অগোচরে এটা যেন মাত্রাবোধ ছাড়িয়ে বিপথে যাওয়ার উপক্রম হোলো।

পাড়ার অন্যান্য কোয়াটারের বউদের নজরে পড়ত মেয়ের এই অতি-মাত্রায় লাজলজ্জাহীন কার্যকারণ, অজানা ভয়ে কেঁপে উঠত তাদের মন। সবার মুখেই উচ্চারিত হোতো মেয়ে এবার সাংঘাতিক একটা কিছু করে বসবে, তখন সুদে আসলের খেসারত দিতে হবে চৌধুরীবাবুকে। মুখ কালো হয়ে যাবে তখন।

হঠাৎ একদিন উড়োচিঠি পেলেন বন্ধুটি অফিসের ঠিকানায়। কোনো এক হিতৈষী লিখেছেন সেটা, সরাসরি বলতে সংকোচ হচ্ছিল, কী জানি যদি বিশ্বাস না হয় একথা, তখন যে দোষৈকদর্শী নিজেই হয়ে পড়বেন নিন্দনীয়।

উপেক্ষিত হোলো না কিন্তু এই উড়োচিঠি বাপের কাছে, উৎকন্ঠায় ছুটে এলেন তিনি বাড়ীতে। না, সবই ঠিক আছে। তবে একটা ছোট্ট সুটকেস দেখলেন আলাদা জায়গায় রাখা। তার মানে কারুর সঙ্গে পলায়নের প্রস্তুতিটা খাঁটি। একটু দেরি হোলেই মেয়েকে আর ধরে রাখা ছিল অসম্ভব।

বাপের কর্তব্যবিমুখ মনটা এবার একটু সঠিক কার্যাকার্যে ব্যাপৃত হোলো। ছুটি নিয়ে বসে রইলেন বাড়ীতে বেশ কিছুদিন, কাউকে জানতে দিলেন না কেন এই ছুটি নেওয়া। তারপর হঠাৎ একদিন মেয়েকে নিয়ে গেলেন কলকাতায়। বিয়ে দিয়ে এলেন ওখানে একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত ছেলের সঙ্গে। নিজের ফ্ল্যাট, সামান্য সরকারী চাকরী। পাত্র আত্ম-প্রত্যয়ী, যা আয় তাতে সংসার ভালোভাবেই চলে যাবে। এরচেয়ে বেশি আর কী চাই একজন মধ্যবিত্ত মানুষের?

কিন্তু মেয়ের স্বপ্ন ছিল যে রাজহংসবৎ রমণীয় গতিযুক্ত—রাজপুত্র আসবে অশ্বারোহী হয়ে, বিয়ে হবে সেরকম একজন রাজপুরুষের সঙ্গে—অর্থে-বিত্তে-রূপে হবে লোভনীয়। সেই মধুর স্বপ্নের কাছে একটি অতি সাধারণ মানুষের সঙ্গে দিন যাপন যে ভয়ংকর মর্মপীড়ক।

তাই স্বামীকে ভালোবেসেও ভালোবাসতে পারে না সে আপনভেবে। একটা প্রাচীর যেন সবসময় খাড়া। দুটি বাচ্চা হোলো এই বিবাহ মিলনে, তবু মনটা যে সংযত হোতে চায় না। উড়ু উড়ু করে সেই অচিন রাজপুত্রের জন্য। মনের এই দোটানা অবস্থায় একদিন সে বেরিয়ে পড়ে ঘর ছেড়ে অন্য এক প্রণয়ীর সঙ্গে, সেখানে যদি আসে কোনো আকর্ষণ এই লোভে।

স্বামী-সন্তানরা রইল পড়ে, তারজন্য অনুতাপ এলো না একরতিও।

দুর্নামের ভয়েও শংকিত হোলো না কিঞ্চিৎমাত্র। বেলেমাটি ছেড়ে যদি এঁটেল মাটিতে রোপণ করা যায় অন্য একটি স্বপ্নের বৃক্ষ---এই তৃষায় সে পাগল। হয়ত আসতে পারে সেখানে পাকা স্থিতি, পাওয়া যাবে কামনা-বাসনার সব অমৃত ফল! দোদুল্যমান যে সেখানেও, সংযত হোতে চায় না কিছুতেই। কীসের আবেগে ছটফট করে মন, সেখানেও পরিপূর্ণতা পায় না। ভগ্ন হয়ে আবার অন্য নীড় খোঁজে---অন্য পুরুষ যে চাই। বেশ কিছুদিন দ্বিতীয় পুরুষের সঙ্গে সহবাস করার পর তাকে পরিত্যাগ করে সে মেয়ে বেরিয়ে পড়ল অন্য একরাজ্যে তৃতীয় পুরুষের সঙ্গে। যদি পাওয়া যায় সব কিছুর প্রতিশ্রুতি তাকেই দেবে সে তার পরিপূর্ণ ভালোবাসা। মন যে তার সেই কারণে আছড়ে মরছে ইতস্তত, এক পুরুষ ছেড়ে অন্য পুরুষের প্রতি যে মনের গতি ধাবমান, তাই তো এতো চনমনানি। চপল গতি।

প্রথম স্বামী ও তার ছেলেমেয়ে সব হারিয়ে গেছে কোথায়, মনে কোনো উষ্ণতাও নেই তাদের জন্য। অনুশোচনায় যে দগ্ধ হবে এমন শরীর নিয়ে সে জন্মায়নি। তাহলে তো থাকতেই পারত প্রথমের সঙ্গে যেমন সবাই থাকে। জীবনটাকে যে বিভিন্নভাবে নিংড়ে নিংড়ে ভোগ করা চাই, তবেই না এই দৈহিক জীবন পূর্ণকাম হবে। এটাই যে তার কল্পিত রাজ্যের স্বপ্নঘোর, যেটা আছাড়পাছাড় খাচ্ছে অস্থিরীকৃতচিত্তে। এই চিত্তের যে শান্তি নেই কোথাও, একটা ছেড়ে অন্য পুরুষের দিকে ধাবিত। এই বিহ্বলতার যে নেই কোনো অন্ত।

আশ্চর্য কিন্তু তৃতীয় পুরুষ মনের মতো পেয়ে গেল এই মেয়ে। সঙ্গে দ্বিতীয় পুরুষের উৎপাদিত একটি মেয়ে নিয়ে সহবাস শুরু করল সেখানে। এবার বুঝি মন হবে শান্ত। আর নয় যথেষ্ট হয়েছে এক নীড় ছেড়ে অন্য নীড়ে ছুটে যাওয়া। বয়স যে বেড়ে চলেছে, আর তো নেই শরীরে সেই জলুস আকর্ষণ করার; মোহিত করার মতো নেই কোনো কামগন্ধ। তৃতীয় পুরুষের সঙ্গে ঘর করে বিক্ষিপ্ত মনের আকুতি যেন একটা স্থির পথ খুঁজে পেল। শান্ত হোলো চিত্ত। আর বহু-স্বামিক হবার প্রয়োজন নেই। সেই বহ্নিজ্বালার অবসানের প্রয়োজন রয়েছে এখন।

সংসার পাতল ভালো করে সেই মেয়ে তৃতীয় পুরুষের সঙ্গে। এই পুরুষের ঔরসজাত সন্তান হোলো আরো দুটি। বিষয়ভোগে মনোনিবেশ করল এখানে এসে একমনা হয়ে। বেশ কয়েক বছর অতিবাহিত হোলো এখানে। আর ছোটাছুটি নয়। এবার যে স্থিতিস্থাপকতার প্রয়োজন। স্থির নিশ্চয় হয়ে রয়ে গেল সে এখানে।

একদিন হঠাৎ কী করে যেন আবিষ্কার করে ফেলল এই মেয়ে, তার প্রথম স্বামীর আইনগত পুত্রসন্তানকে, যাকে ফেলে এসেছিল সেই শিশু অবস্থায়। এখন যে সে বড় হয়ে গেছে অনেক। স্বাভাবিক সৌন্দর্যেভরা এখন তার শরীর, যৌবনের দ্যুতিমাখানো অঙ্গে। আপন মা বলে নিজের পরিচয় দিয়ে ধরে নিয়ে এলো এই সংসারে। সেই ছেলে কিন্তু বিনা প্রতিবাদে চলে এলো মায়ের আঁচল ধরে। যে-পিতা তাকে কত কষ্টে মানুষ করে তুলেছিল সেটাও গেল ভুলে। কুলত্যাগিনী সেই মা হয়ে গেল বড় আপন।

সম্পূর্ণ নতুন সংসারে এসে সেই ছেলে পেল এক নতুন পরিবেশ। নিত্য নতুন সাধআহ্লাদের খেলা। এর মাঝে এলো মেয়ের সেই দ্বিতীয় স্বামীর মেয়েটি। ছেলের চিত্ত যে বিগলিত হয়ে পড়ে সেই কন্যার প্রতি সৌন্দর্য-ভরা যৌবনের আকর্ষণে। একটা প্রণয়ের পালা চলে অহরহ দুজনের। গাঢ় হয়ে পড়ে সেই ভালোবাসা। একে অপরকে পাওয়ার জন্য লালায়িত।

মা কিন্তু এই সুযোগ হারাতে দিলে না। পাকাপাকি বন্ধনে আবদ্ধ করে দিল দু-হাত এক করে দিয়ে। তাহলে ছেলের আর মূল সংসারে ফিরে যাওয়ার আর কোনো উপায় থাকবে না। ত্যাজ্যপুত্র হয়ে পড়বে সে বাপের কাছে চিরকালের জন্য—যেমন সে নিজে পরিত্যজ্যা হয়ে রয়েছে সকলের কাছে।

কখনো ভেবেছেন কী মা তার নিজের ছেলেকে বিয়ে দিতে পারে তার নিজেরই মেয়ের সঙ্গে? হোক না সেই মেয়ে আইনগতভাবে বিয়ে করা পুরুষের উৎপাদিত মেয়ে নয়। কিন্তু নিজের গর্ভে তো দুটি সন্তানেরই জন্মদাত্রী সে। মা তো এক। হাজার ধিক্কার দিয়েও এই কলঙ্ক যে মিটবার নয়। সমাজের এরাই তো হোলো আসল অধোগতা। পতিতা, সে তো ব্যবসাসূত্রে পাতকিনী। তারা তো সর্বজনবিদিত সমাজ থেকে বিচ্যুত। এসব কথা পাড়ার বন্ধুটি বলেন আর ঝরঝর করে কাঁদতে থাকেন। আরো বলেন, যদি জানতাম একটা কালনাগিনী বাস করছে এই মেয়ের শরীরে, তাহলে আঁতুড়ঘরেই তাকে সাবাড় করে দিতাম। তারজন্য কোনো খেদ হোতো না। এই যন্ত্রণাদায়ক মনোকষ্ট থেকে তো রেহাই পেতাম। এটা যে দুঃসহ, একেবারেই ক্ষমাশূন্য।

আকশের গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি, স্থিতি ও সঞ্চার দ্বারা জগৎলোকের প্রতিটি মানুষের শুভাশুভ নিরূপিত হয় কিনা, এ বিষয়ে জ্যোতিষীরা যাই

বলুন না কেন, এটার ওপর বিশ্বাস রাখা আর না-রাখাটা নির্ভর করে কার কতখানি এ নিয়ে দুর্বলতা রয়েছে, তার ওপর। সাধারণত দেখা যায় দুর্বিপাকে পড়লে কিংবা দুর্লঙ্ঘ্য কোনো বিপদ আপদ ঘটলে, স্বভাবতই তখন ইচ্ছে হয় কপালের লেখা অথবা হস্তরেখা কাউকে দিয়ে একবার পরীক্ষা করে নিলে কেমন হয়। এসব ব্যাপারে তখন অতিবড় অবিশ্বাসীও কোনো হস্তরেখাবিদের সংস্পর্শে এলে, নিজের হাতটা তার কাছে প্রসারিত করে ফেলে। আবার সত্যিকারের যদি পাথর-চাপা কপাল হয়, নিজের মনঃস্তুষ্টির জন্যও অতি অবশ্যই তিনি দৌড়বেন ভাগ্য পরীক্ষার্থে---হয় জ্যোতিষী নয় হস্তরেখাবিদের কাছে---একটা মাদুলি কিংবা কোনো পাথরের আশায়, যদি কাজে লাগে।

আমার নিজস্ব কোনো যে দুর্বলতা নেই এই ব্যাপারে, সেটা আমি জোর করে বলতে পারি না। যদিও নিজের ছেলেমেয়ের বিয়ে দিয়েছি এসবের কোনো বাছবিচার না করে। নিজের বিয়ের সময়েও কোনো পক্ষই দাবি করেননি জন্মপত্রিকার। তবে মনে আছে, আমার বড়দাদার বিয়ের সময় ঠিকুজি মেলানোর একটা বিরাট পর্ব ঘটেছিল দুপক্ষেরই। দুদিকের আলাদা জ্যোতিষ আলাদা আলাদাভাবে যাচাই করেছিলেন কোষ্ঠী এবং বিচারে রাজযোটকের লক্ষণ দেখে সেই বিবাহে রায় দিয়েছিলেন। বলেছিলেন এখানে বিবাহ দিলে দুজনেই সুখী থাকবে এবং মেয়ে জন্ম-এয়োতী হবে। ছেলে কী থাকবে, সেই সম্বন্ধে কিন্তু ঠিকুজি সংযোগসাধনকারীরা কোনো বিচার ব্যক্ত করেননি। কাজেই কন্যা জন্মব্যাপী এয়োতী থাকলেই যথেষ্ট মনে করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু রাজযোটকের পরিণতি যে শেষ পর্যন্ত এমন একটি বিয়োগান্তকে দাঁড়াবে, সেটার নিরূপণ করতে পারেন নি তাঁরা। আমার বড়বউদি এয়োতী অবস্থাতেই মারা গেলেন ঠিকই প্রায় পয়ত্রিশ বছর বয়সে আমার দাদাটিকে সম্পূর্ণ রিক্ত ও নিঃসহায় করে দিয়ে।

সেই থেকে আমাদের বাড়ীতে জন্মকোষ্ঠী বিচারের আগ্রহটা গিয়েছিল কমে। কেউ আর চাইত না জন্মপত্রিকা দেখতে। দাবি হোতো শুধু মেয়ে যেন গৃহকর্মে নিপুণা হয়, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণেও আপত্তি নেই এবং বিস্তর লেখাপড়ার অধিকারিণী না হলেও চলবে। কারণ বিদ্যায় ভূষিত হয়েও অতিশিক্ষিতা বউ ঘরে থাকলেও ছেলেমেয়েদের পড়াবার জন্য তো প্রাইভেট টিউটর রাখতেই হবে। কারণ বউ-এর কলেজের ডিগ্রিতো একটা গহনা বিশেষ, ব্যাংকের লকারে রাখার মতো অব্যবহৃতই থেকে যাবে শেষ পর্যন্ত।

আর বউ-এর অন্য গুণাগুণতো কোষ্ঠী দিয়ে বিচার হোতে পারে না।

সেটার কার্যকারণ সম্বন্ধ নির্ভর করছে তার ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর। কাজে লাগাবার ক্ষেত্রটি দেখে সে কোথায় এবং কতখানি কাজে লাগাবে, এটা যে একেবারেই তার মর্জি-নির্ভর। গার্হস্থ্য ব্যাপারটা এমন একটা জিনিস যেটা পরিবার প্রতিপালন ছাড়াও সবাইকে নিয়ে মিলিত হয়ে থাকার মধ্যে রয়েছে তার পূর্ণতা, যেটা ব্যক্তির সাজসজ্জা ও অশনভূষণের চেয়েও বড়। এটার মধ্যেই আনতে হবে সুরূপতা আর সুস্থিরতা। গুণলক্ষণা মেয়ের এসবই হোলো অঙ্গভূষণ, সেটা হাজার কোষ্ঠীবিচার করেও তার লক্ষণ খুঁজে পাওয়া মুস্কিল।

কাজেই ছেলের বিয়ে দিয়ে ভালো মেয়ে পাওয়াটা সম্পূর্ণ ভাগ্যের ব্যাপার। জানাশোনা ঘর, স্বভাবচরিত্র ভালো, এসবের খোঁজ নিয়েই তো মেয়ে আনে সবাই নিজের ঘরে। কিন্তু বউটির মেজাজ বা রুচিটা কেমন হবে, সেটা তো যার যার আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে স্বপ্রকাশিত। ওটা আবার অনেক সময় পরিবেশ অনুযায়ী তৈরী ও পরিস্ফুট হয়—যেমন তৈরি হয় মানুষের শরীর নতুন জলবায়ুতে অভ্যস্ত হওয়া নিয়ে। অদৃষ্টলিখন যে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। এটা চক্রবৎ আবর্তমান। প্রাচুর্যভরা সংসারে ভাগ্যের বৈপরীত্য ঘটতে কতক্ষণ লাগে? একই সংসারে জলে-ভাতে মানুষ ভিন্নতর হয়ে দাঁড়ায় কোন হেতুতে? কেউ ধাপে ধাপে উঠে যাচ্ছে গৌরবের সোপান বেয়ে, আবার কেউ শতচেষ্টাতেও নীচের সারিতে পিষ্ট হয়ে আটকে থাকে। ভাগ্যদেবতা প্রসন্ন না হোলে যে কিছুই পাওয়ার উপায় নেই।

তা না হোলে আমরা দুজনে কী দোষ করেছিলাম যার দরুন ছিন্ন হয়ে বেরিয়ে আসতে হোলো মূল সংসার থেকে? বিচ্ছিন্নভাবে বাস করতে হোলো কোন অপরাধস্বরূপ? বিচ্ছিন্নতার কলঙ্ক চাপানো হোলো কোন অদৃষ্টদোষে? এসব কথা আমাকে সব সময় বিচলিত করে রাখত, দিশেহারা হয়ে পড়তাম। অনেক সময় ভারি অস্থির হয়ে পড়তাম, কষ্ট পেতাম। তখন মনে হোতো নিজের আচরণ বুঝি পাগলের মতো হয়ে পড়ছে।

এমন সময় আবিষ্কৃত হোলো গর্দানিবাগের শেষপ্রান্তে আমার এক বহু পুরনো বন্ধু। প্রথম চাকুরিজীবনে মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলাম তার সঙ্গে। তারপর সে কোথায় এবং আমিই বা কোথায় হারিয়ে গেলাম।

কোনো কলেজের অধ্যাপকের আসনে এই বন্ধু তখন উপবিষ্ট। আর আমি সেক্রেটেরিয়েটের বিরাট অট্টালিকার কোনো প্রকোষ্ঠে করণিকের

পদে বাঁধা অবস্থায়। এই গাঁট ছাড়িয়ে আরো ওপরের স্তরে কোনোদিন যেতে পারব কিনা সেই ভাগ্যও অনিশ্চিত।

হঠাৎ বাজারে দেখা হোলো এই বন্ধুটির সঙ্গে বহু বছর পরে। দুজনেই দুজনের দিকে তাকিয়ে হেসে নিলাম কতক্ষণ, অনেকটা পাগলের মতোই। বন্ধুবর ইংরেজীতে বলে উঠলেন--সো দি আর্থ ইজ রাউণ্ড। উই হ্যাভ টু মীট অন ওয়ান পয়েন্ট অলওয়েজ।

ইংরাজীর অধ্যাপক ইনি। সুন্দর ইংরেজী বলতেন, বাচন ভঙ্গিও সাহেবদের মতো। আর ইংরেজী কথা বলার মধ্যেও ছিল একটা সুকুমার ছন্দের প্রকাশ। যে কোনো ঘটনাকে একটা রূপকের আশ্রয় নিয়ে, অল্প কয়েকটি শব্দের মাধ্যমে সেটা বিস্তারিত করতেন। শুনতেও তাই অপূর্ব মনে হোতো।

আমাকে ধরে নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়ীতে। বাজার করা পড়ে রইল। কয়েকটি ছোট ছেলেমেয়ে ঘিরে দাঁড়াল আমাকে, তার ভেতর একটি ছোট্ট ছেলে এলো নেংচাতে নেংচাতে আমার পাশে। প্রত্যেকের মুখেই একটা কৌতূহল, কে এই মানুষটি--কোনোদিনও তো দেখিনি বাড়ীর চৌহদ্দিতে। সেখানে স্ত্রীটিকে দেখতে পেলাম না কিন্তু।

বন্ধুটি চিনিয়ে দিলেন ওদের---এ আমার পুরনো বন্ধু। ইউ মে কল হিম আংকল।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বল্লেন, হঠাৎ গর্দানিবাগে কেন? বাড়ীতো ছিল আগে পাটনা কলেজের পাশে, তারপরে আদালতগঞ্জে শুনে-ছিলাম। হোয়াট্ ব্রিংগস ইউ হীয়ার ইন দিস ডেসলেট এরিয়া?

বলেই ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে। কপালের রেখাগুলো যেন স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল ওঁর চোখে।

তারপরেই প্রশ্ন হোলো, হোয়াট'স দি রং উইথ ইউ? ইউ এপীয়ার টু বী ভেরি মাচ্ ডিস্টার্বড।

পরক্ষণেই বল্লেন, সাহিত্যের কারবার কেমন চলছে?

উনি জানতেন আমি একটু আধটু লিখি, তাই এই প্রশ্ন।

তারপরেই জিজ্ঞাসা করলেন, নবেন্দু ঘোষ এখন কোথায়? উনি যে তাঁর 'মানুষ' বইখানা আমাকে উৎসর্গ করেছিলেন জানেন বোধ হয়?

জানি। ভালো করেই জানি সেকথা। বইখানা আমিও কিনেছিলাম। লেখক নবেন্দু ঘোষ বেশ কিছুদিন কাজ করেছিলেন পাটনা অফিসের মিলিটারি একাউন্টসে। আমরা তিনজনেই তখন ওই অফিসে--নবেন্দু ঘোষ, আমার এই বন্ধুটি ও আমি।

নবেন্দু ঘোষ তখন উঠতি নামকরা লেখক। তাঁর 'ডাক দিয়ে যাই' উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে 'প্রভাতী' পত্রিকায় বেরিয়ে বই-এর রূপ নিয়েছে। আরো কয়েকটি ছোটগল্পের সংগ্রহও বেরিয়েছিল। 'শনিবারের চিঠি'তেও লিখতেন মাঝে মাঝে। 'মানুষ' বইটি মিলিটারি একাউন্টসে থাকতে থাকতেই কয়েকটি গল্পের সংকলন হিসাবে বেরিয়েছিল।

বল্লাম, নবেন্দু ঘোষ এখন বোম্বেতে। বিমল রায় টেনে নিয়ে গেছেন।

এবার বন্ধুটি বল্লেন, 'মানুষ' বইটির প্রচ্ছদপটে যে-মানুষটির ছবি আঁকা হয়েছিল একটা বড় পাথর মাথায় চাপিয়ে, সেটা খুব সম্ভব আমার ভবিষ্যতটা কল্পনা করেই করা হয়েছিল। সেই ছবির বাস্তব রূপায়ণে কিন্তু আমি এখন নিজে। এসব কারণেই বোধ হয় নবেন্দু ঘোষ আমাকে বইটা উৎসর্গ করেছিলেন। হী নিউ হোয়াট্ আই উড্ বী আল্‌টিমেট্‌লি। সেই বিরাট পাথর ঘাড়ে বয়ে চলেছি আমি এই সংসারযাত্রায়। দেখছেন না, এই সব ছোট ছোট ছেলেমেয়ে—দে আর উইদাউট দেয়ার মাদার। আই হ্যাভ্ টু কুক্ ফর দেম্।

এরপরেই খানিক নিস্তব্ধতা। তারপর আমার ডানহাতটা টেনে হাতের রেখাগুলো ভালো করে দেখেটেখে বল্লেন, কী রাশি আপনার? জন্মমাস কী? লগ্ন?

এতো সব প্রশ্নের উত্তর এক নিঃশ্বাসে দেওয়া মুস্কিল। বল্লাম, যাকগে ওসব। আমি জানিটানি না কিছুই। শুধু এইটুকু বুঝছি সময় ভালো যাচ্ছে না। কোনো দাওয়াই আছে কী আপনার জানা, তবে সেটা দিন।

আবার আমার দিকে তাকালেন উনি। নিজের চোখ দুটো নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমার কপালের ওপর দৃষ্টিটা নিবদ্ধ রেখে পরে ভ্রূ কুঁচকে বল্লেন, স্যাটার্ন ইজ নট হেলপিং ইউ। বৃহস্পতি খুব জোরদার বলে বেঁচে আছেন। একটা নীলার আংটি ধারণ করুন। হাতে তো দেখছি একটা হলদে পোখরাজ। এটা আপনার পক্ষে ভালো পাথর।

সত্যিই তাই, বিয়েতে একটা পোখরাজের আংটি পেয়েছিলাম। সেটা হলদে রং-এরই ছিল। আমার ভাগ্য অনুকূলের খেয়াল রেখে হয়নি সেটা। পাথরটা দেখতে ভালো বলেই বোধ হয় দেওয়া হয়েছিল।

নীলার কথা শুনেই আঁতকে উঠে বল্লাম, ডু ইউ ওয়ান্ট টু সী মাই ডিজাস্ট্রাস্ এণ্ড্ সূন্? আমি ওটা ধারণের মধ্যে নেই, অন্য কোনো পাথর থাকে তো বলুন। আমি আপনার দাদার বেলায় দেখেছি, কী ভয়ংকর এ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল যেদিন নীলার আংটি পরেছিলেন। বিকেলে চা

খেয়ে পিন্টু হোটেল থেকে রাস্তায় নেমেই একেবারে গাড়ীর তলায়। দ্যাট সীন আই স্টিল রিমেমবার—হাউ শকিং ইট ওয়াজ!

এর উত্তরে তিনি বল্লেন, মৃত্যুকে এতো ভয় পান আপনারা? উই আর অল্ রানিং আফটার ইট—তাহলে ভয়টা কীসের?

পরে নিন এই নীলার আংটি, বলেই খুলে দিলেন নিজের আঙ্গুল থেকে। নিজের হাতে তখন গণ্ডাখানেক নানা পাথরের আংটি তাঁর।

সত্যি বলতে কী, আমার ওই আংটি স্পর্শ করতে ভয় করছিল। এই নীলা সাংঘাতিক পাথর, যেমন ওঠাতে ওস্তাদ, তেমনি বিনাশ করতেও পারে গ্রহের অনুরূপ না হোলে। না না থাক ওসব পাথর-টাথর, জেনে-শুনে একটা বিপদ ডেকে আনার কী দরকার? একেই তো দগ্ধ-কপাল নিয়ে নানা ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যে রয়েছি, তার ওপর আর একটা আপদ ঘরে টেনে আনতে চাই না।

এসব ভেবেই আংটিটা ফেরত দিলাম। একটু মুখ বিকৃত করে উনি বল্লেন, ইউ আর এ কাওয়ার্ড।

রবিবার দেখে আর একদিন গেলাম ওঁর বাড়ীতে। আমার মুখ দেখেই বল্লেন, কেন মিছামিছি কষ্ট পাচ্ছেন? নীলা ছাড়া কোনো গতি নেই। পরুন ওটা—ইউ উইল সী ওয়াণ্ডারফুল রেজাল্ট। বিপদের কথাটাই ভাবছেন কেন শুধু, সৌভাগ্যের উদয়ও তো হোতে পারে?

তবুও দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটাতে পারছি না। এরপর বন্ধুবর বল্লেন, এক কাজ করুন, নিয়ে যান এই নীলাটা বাড়ীতে। বাড়ীতে যদি কোনো নিক্তি থাকে তাতে নীলাটার ওজন আতপচালের ওজনের বরাবর করে নিন। তারপর ওই চালটা ও নীলাটা একসঙ্গে রেখে রাত্রে শোবার সময় মাথার বালিশের তলায় রেখে শোবেন। পরদিন ভোরবেলায় উঠে আবার দুটোকে আলাদা করে ওজন করে দেখুন। যদি চালের ওজন নীলার চেয়ে কমে যায় তবে এটা পরবেন না। আর যদি দেখেন চালের ওজন বেড়ে গেছে তবে নিশ্চিন্তে নীলা ধারণ করতে পারেন।

এটা অবশ্য একটা কথার কথা হোলো আমার কাছে। এইভাবেই নাকি নীলা কারুর পক্ষে উপযুক্ত কিনা যাচাই করা হয়।

সেদিন রাত্রে কাউকে কিছু না বলে নিক্তিতে ওজন করে, আতপচাল ও নীলা একসঙ্গে করে বালিশের তলায় রেখে শুয়ে পড়লাম। সেদিন রাত্রে ঘুমের ঘোরে কত রকমের যে বিভৎস ও ভয়ংকর স্বপন দেখলাম বলার নয়।

ভোরে উঠে আবার ওজন করলাম দুটোকে আলাদা রেখে—দেখলাম ওজন একই রয়েছে কোনো বেশকম নেই। এ আবার কী ধরণের ওজন হোলো? এক্ষেত্রে কী করা যাবে? ছুটলাম বন্ধুর কাছে।

আমাকে দেখেই বল্লেন, হোয়াট ইজ দি এফেক্ট অফ দি টু?

বল্লাম, দুটোর ওজনই সমান পেলাম।

বল্লেন, তাহলে নির্ভাবনায় ধারণ করতে পারেন।

বল্লাম, সারারাত ভালোভাবে ঘুমুতে পারিনি, উপরন্তু ভয়ংকর ভয়ংকর স্বপ্ন দেখেছি সব। এটার বিচার বিশ্লেষণ কী দাঁড়াবে আপনাদের জ্যোতিষশাস্ত্রে?

আবার সেই হো হো করে হাসি। হাসি যে থামতেই চায় না।

বিশ্বাস যে করতে পারছি না কিছুতেই। ফিরিয়ে দিলাম নীলা। এনিয়ে দুবার ফেরত দেওয়া হোলো নীলার আংটি। মন যে সায় দিচ্ছে না একেবারে। দ্বিধাদ্বন্দ্বের আবর্তে চালিত হওয়ার মতো যে আর মনের অবস্থা নেই। শনির কোপ যদি আসে আরও প্রবল হয়ে, তাহলে বিপদ তাড়াতে গিয়ে উল্টোফল না পেতে হয়! এই পাথরের যে শক্তি অসীম সেটা নিজের চোখেই দেখেছি। কাজেই এসব জেনেশুনেও নীলা ধারণ করতে সাহসে কুলচ্ছে না।

আরো মাসখানেক পরে আবার হাজির হলাম এই বন্ধুটির কাছে। আমার চেহারাতে চিন্তাভাবনায় একটা শুষ্কতা স্পষ্ট রূপেই প্রকট হয়ে গেছে, মুখেচোখে কালিমা। কেউ দেখলেই মনে করত আমি একটা ভয়ংকর অসুখে ভুগছি। অফিসেও সেসময় চলছিল একটা সাংঘাতিক টেনশন্।

নিঃসন্দেহে এটা ছিল ভয়ংকর রকমের মানসিক পীড়া, অন্তর্দাহে অহরহ কষ্ট পাচ্ছি। এই যন্ত্রণা যার মধ্যে একবার প্রবেশ করেছে, সহজে তা থেকে নিরাময় পাওয়া কঠিন। তিলে তিলে দগ্ধায় যে এই পীড়া। বড় ক্লেশদায়ক।

বন্ধুর আবার সেই সহজ কথা, এবার একটু ধমকের সুর নিয়ে। বল্লেন, মনের এই ছটফটানি এমনিতে যাবে না। নীলাঙ্গুরীয় ধারণ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। মরবেন তো একবারই, তবে এই নিত্যি যন্ত্রণা পাওয়া থেকে তো সেটা অনেক ভালো।

নীলার আংটি উনি আমাকে দিয়ে দিলেন। যে-কোনো শনিবারে ধারণ করতে বল্লেন গঙ্গাজলে ধুয়ে নিয়ে সকালের স্নানটি সেরে, বাঁ হাতের অনামিকায়। বাঁ হাতে এই কারণে বল্লেন যদি সত্যি কোনো চোট পড়ে

এই আংটির জন্য, তবে আঘাতটা ওই হাতের ওপর দিয়েই যাবে। ডান হাত যে মানুষের অনেক বেশি প্রয়োজন, এই হাতেই তো সব কাজ সারা হয়।

দামের কথা তুলতেই একেবারে রেগে আগুন। বল্লাম, পাথরের মূল্য না দিলে যে কাজ ফলদ হয় না। উত্তর এলো, খুব হয় নিয়ে যান।

আর কোনো কথা বাড়ালাম না। নীলার দাম যে অনেক। এমন-ভাবে দান যে করতে পারে, তার হৃদয়টা কত বড়, সেটা যে অতলস্পর্শী। বন্ধুর ব্যথায় ব্যথিত হয়ে তার বিপদমুক্তির একমাত্র অনিবষ্ট উপায় যে বের করে একটা অতি মূল্যবান বস্তু হাতে ধরে দিতে পারে সে যে কতখানি উদারচেতা। এসব কথা যখন ভাবি তখন মন উদ্বেলিত হোতে থাকে।

অবিশ্বাস্যভাবেই কিন্তু এই নীলা আমার ভাগ্যাকাশ বদলে দিয়েছে। বড় বড় মর্মপীড়া থেকে মুক্ত করেছে নিঃসন্দেহে। সেই কথা অকপটে আমি স্বীকার করি। একটা মস্তবড় মনের শক্তি যোগান দিয়েছে এই নীলা। কোনো একটা বিপদের সংকেত পেলেই হাতের এই নীলার কথা মনে পড়ে যেতো। যে-শক্তি ধারণ করে রয়েছি আমার অঙ্গুলীয়তে, সেটাই তো আমাকে রক্ষা করে চলেছে সব বিপদ-আপদ থেকে। তবে ভয়টা আর কোথায়? এই যে একটা মানসিক শক্তি পেয়েছিলাম সেটা একটা বড় সম্পদ হয়েছিল আমার কাছে।

সেই থেকে ভয় একেবারে পালিয়ে গেছে মন থেকে। ত্রাসের যেটুকু বিভীষিকা আমাকে খিন্ন করে রেখেছিল, সেটা ছিল এই আংটি ধারণ করার আগ পর্যন্ত। তারপরেই তো আমি হয়ে গেলাম ভীতরহিত শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি। প্রভাবজ, উৎসাহজ, মন্ত্রজ––এই ত্রিবিধ শক্তি যে রয়েছে আমার হাতের নিলাঙ্গুরীয়তে। এটা যে আমার দিগনির্ণায়ক, বিপদ-নাশকারী। কোনো কিছুতেই আর সে বিপদে পতিত হোতে দেয় না, নিবৃত্ত করে রাখে সব সমস্যা থেকে। তাই আমি এখন আর বিপদে অবশীভূত নই, মৃত্যুভীতও নেই। সম্পূর্ণরূপেই প্রশান্তচেতা।

বিস্ময়কর ঘটনার মতোই মনে হবে এসব। সেই নীলা ধারণ করার পর থেকেই কিন্তু আমার উন্নতির সোপান উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল চাকুরি জীবনে। শেষ উঁচুস্তর অবধি উঠেছিলাম অবসর নেওয়ার আগ পর্যন্ত যেটা প্রথম জীবনে কোনোদিন আশা করিনি। তারপর পেলাম একটা পাকাগৃহ, স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য, যার জন্য সর্বদাই ছিলাম আকুলিত। এমনকি গৃহচ্যুতও হোতে হয়েছিল আমাকে কয়েকবার। এই গৃহ যে কোনোদিনে হোতে পারে আমার, আশা করিনি। ভাবতাম নির্ধন

করণিকের জীবনে একটা সরকারী কোয়ার্টারই তো যথেষ্ট। একটা বড় কম্পাউণ্ডের ভেতর তিনখানা বড় বড় ঘরের কোয়ার্টারের সুখ কী কম? এতো অল্পবয়সে বাড়ীর স্বপ্ন খুব কম লোকেরই সফল হয়েছে। বরং বাড়ী করে সবারই বিষনয়নে পড়েছিলাম।

ছেলের বিয়ে দিয়েছি। পড়াশোনা করিয়েছি যতদূর পারে পড়তে। ডক্টরেটও করেছে সে চাকরি করতে করতে। মেয়েরও ভালো বিয়ে দিয়েছি। জামাতা স্বপ্রতিষ্ঠিতই শুধু নয়, সুপ্রতিষ্ঠিতও। বিজ্ঞানের এক সফল ছাত্র সে। বিদেশে রয়েছে তারা। পৃথিবীর বড় বড় জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কোনোদিন ভেবেছিলাম কী এসব সম্ভব হবে? এসবই কিন্তু সেই নীলারত্নটির বজ্রদাপটের জোরে। ভাগ্য পরিবর্তন এটাকেই বলে। মাথা হেঁট করতে হয়নি কোথাও আর। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য জগতেও যেখানে যেটুকু প্রাপ্য পেয়ে চলেছি।

সেই ভাগ্য নিয়ন্ত্রক নীলকান্তমণি এখনও কিন্তু আমার অঙ্গুলিতে সযত্নে রক্ষিত। আগলে রয়েছে সে আমাকে দেহরক্ষীর মতো। এতো দিয়েছে যে, তাকে কী কখনো ত্যাগ করা যায়? ভিক্ষুকের মতোই তো সেদিন নিয়ে এসেছিলাম তাকে বন্ধুর কাছ থেকে প্রাণ বাঁচানোর জন্য। প্রাণপদ সেই বস্তুটির কী অবহেলা করা যায় কখনো? আমার সহযোগী হয়েই থাকবে সে আমার মৃত্যু অবধি। তারপরেই তার পূর্ণ বিদায় হবে আমার কাছ থেকে অন্য হাতে ছোঁয়া দিতে।

অদ্ভূত ক্ষমতা ছিল আমার এই বন্ধুটির, ভবিষ্যতে কী ঘটতে পারে তার ইঙ্গিত দেওয়ার ব্যাপারে। কপালের রেখার দিকেই বেশি নজর দিতেন, তারপরে চলত হস্তরেখা বিচার। কোথা থেকে এই শক্তি অর্জন করেছিলেন জানি না, একবার এক বড় ভাগ্নে এলো কলকাতা থেকে আমার এখানে নিছক একটু হাওয়া বদলের ইচ্ছা নিয়ে। একাই এসেছিল, স্ত্রী ও কন্যাকে রেখে। সেই সময় একদিন আমার এই বন্ধুবর কোয়ার্টারে এসে উপস্থিত। নানা গালগল্পের ভেতর হঠাৎ আমার খেয়াল হোলো আমার এই ভাগ্নের হাতটা একটু দেখিয়ে দি। তখন সে কাজ করছে বিড়লা কোম্পানীর একটা জুটমিলে। কয়েক বছর পার হয়ে গেছে তবুও সে একই কাজে ঘষটে ঘষটে চলেছে কোনোরকমে। উন্নতির কোনো সুযোগ নেই সেখানে, তাই অস্থিরচিত্ত সবসময়, কোথায় গেলে ভালো হয়।

ভাগ্নে ঘরে ঢুকতেই ওর মুখের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইলেন

কিছুক্ষণ যেন একটা কিছু দেখে ফেলেছেন। নিজে থেকেই বলে উঠলেন, এর স্ত্রীতো প্রায়ই অসুখে ভোগে—জটিল স্ত্রীরোগ—একটা অপারেশন হবে শিগ্‌গির, তারপরেই নিরাময়।

ভাগ্নেন কিন্তু অবাক কথাগুলো শুনে। কিছুতো বলা হয়নি এঁকে ওর স্ত্রীর ব্যাপারে। তবে কী করে বল্লেন এসব খাঁটি কথা?

ভাগ্নের উৎসাহটা আরো বেড়ে গেল, যদি পারেন ওর চাকুরি-জীবনের ভবিষ্যতটা কী দাঁড়াবে বলতে, তবে যে বড় ভালো হয়।

আমিই বল্লাম বন্ধুকে। দেখুন তো ওর চাকুরি-জীবনে উন্নতি হচ্ছে না কেন, আজ প্রায় দশ বছর হয়ে গেল যেখানে ছিল, সেখানেই পড়ে রয়েছে। উনি হাতটি দেখে বল্লেন, যেখানে রয়েছে সেখানে কিছু হবার নেই আর। যেতে হবে পশ্চিমে, এই চাকরি ছেড়ে অন্য চাকরিতে, তবেই উন্নতি।

ভাগ্নেন বিস্ময়ে তাকিয়ে। কলকাতা ছেড়ে অন্য কোথায় চাকরি পাবে কী করে সে? নিজের ক্ষমতাও যে শেষ হয়ে গেছে। বিয়ে হয়ে গেছে, একটা মেয়েও রয়েছে। স্থায়ী চাকরি ছেড়ে অন্যত্র যাওয়া চলতেই পারে না কখনো। সরকারী একটা ছোট ফ্ল্যাটও কলকাতায় দেওয়া হয়েছে তাকে। কী করে এটা সম্ভব?

আশ্চর্য এক বছর বাদেই কিন্তু সপরিবারে ভাগ্নেন রওনা হোলো মধ্য-প্রদেশে, সাতনা সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে। এখানে থেকেই হোলো উন্নতির সব কিছুর ফললাভ।

আর একটি ঘটনা। সেটি আরো চমকপ্রদ। আমার ছোট বোন তখন জলপাইগুড়িতে। ভগিনীপতিটি ওয়েস্ট বেঙ্গলের পাবলিক ওয়াৰ্কস ডিপার্টমেন্টে ইঞ্জিনিয়ার। পেটে একটা অসম্ভব কলিক ব্যথায় কাতর হন মাঝে মাঝে। কাটাছাগলের মতো তখন ছটফট করতে হয়—চিকিৎসারও শেষ নেই, কিন্তু কোনো কিছুই মানছে না সেই ব্যথা।

ভগিনী একটা চিঠি দিলে আমাকে, কী করা যায় এই অবস্থায়। দৌড়লাম ভবিষ্যতবেত্তা বন্ধুটির কাছে। উনি ঠিকুজির ছকটা চাইলেন। জন্মমাস, কি রাশি, সব জানতে চাইলেন। আমার কাছে সেসব কিছু না থাকায় আমার বোনকে সেসব পাঠাতে চিঠি দিলাম। সঙ্গে সঙ্গেই সেসব তো এলো। উনি সব খুঁতিয়ে খুঁতিয়ে দেখলেন। কোনো ফোটো আছে কী এই ভগিনীপতির আপনার কাছে? বল্লেন।

একখানা আবক্ষ ফোটো ছিল আমার কাছে। নিয়ে গেলাম সেটা। ফোটোখানার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন, তারপর বল্লেন, ওঁর হাতে

নিশ্চয় কোনো সাদাপাথরের আংটি আছে। সেটা খুলে ফেলতে বলুন, তাহলেই রোগ ঠিক হয়ে যাবে।

অবাক হোতে হোলো যখন জানতে পেলাম যে সত্যি ভগিনীপতির হাতে একটি সাদাপাথরের আংটি ছিল। শখ করেই সেটা পরেছিলেন, কোনো জ্যোতিষীর দেওয়া ধারণবস্তু হিসেবে নয়। সেটা খুলে ফেলার পরেই কিন্তু রোগের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল।

এই বন্ধুটি প্রায়ই আসতেন আমার কোয়ার্টারে নিছক বন্ধুত্বের টানে।

বিকেলের দিকে একদিন দেখি উনি বসে আছেন বাইরের ঘরে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে। আমি তখন সবেমাত্র অফিস থেকে ফিরেছি। দৌড়-লাম পান আনতে কারণ এর পরেই তো খোঁজ পড়বে পানের, এ বাড়ীতে তো কোনো পানের পাট ছিল না।

সেদিন কেন জানি আমার স্ত্রীর হাতটা দেখতে বললাম। আগে কোনো-দিন দেখানো হয়নি। হাতের ওপর চোখটা বুলিয়ে, কপালের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, আপনার বাবার মৃত্যুযোগ রয়েছে খুব শিগ্‌গির।

গৃহিণীর তক্ষুণি মনে হোলো তাঁর শ্বশুরমশায়ের কথা অর্থাৎ আমার পিতাঠাকুরের আসন্ন মৃত্যুর কথা, কারণ আমার বাবার বয়স হয়েছিল যথেষ্ট, জীবনলীলা সাঙ্গ হবার মতো পরিণত। স্ত্রীর নিজের বাবার কথা মনেও আসেনি একবারও, যেহেতু তিনি তখন অনেক ছোট আমার বাবার তুলনায়। মৃত্যুর বয়স নয় সেটা।

দুদিন পরেই কিন্তু ফোন এলো লক্ষ্ণৌ থেকে আমার শ্বশুরমশায়ের মৃত্যুসংবাদ বহন করে।

এসব ঘটনার ভবিষ্যতসূচনকারীর প্রতি শ্রদ্ধা না জানিয়ে উপায় আছে কী? এসব শুনেও চমকিত হোতে হয় বৈকি। অসাধারণ শক্তি না থাকলে এসব ভবিতব্য বলা মুস্কিল। এটা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়, এটা সামুদ্রিক জ্ঞানের সারত্ব প্রাপ্তের প্রশ্ন।

এবার আমার নিজের জামাতা বাবাজীর কথা বলেই এই প্রসঙ্গ শেষ করবো।

বুণ্ডু-রাঁচির ছেলে সে। পাটনা সায়েন্স কলেজ থেকে এম, এস, সি,। চাকুরি এখানেই করছিল পি, এইচ, ডি, ডিগ্রি নিয়ে। ভালো লাগছিল না এখানে থাকাটা। বিদেশে পাড়ি দেওয়ার জন্য মন উচাটন থাকে সবসময়, অথচ সেই সুযোগ কখন আসবে জানা নেই। চেষ্টারও ত্রুটি নেই।

বল্লাম, আমার বন্ধুবরের কাছে হাতটা একবার দেখিয়ে এসো। উনি কী বলেন জেনে নাও। তারপর নিজের পদক্ষেপ কতটুকু বাড়ানো দরকার ঠিক করে নাও।

দৌড়ল সে ওঁর কাছে। ফিরে এলো খুব খুশি মনে। বলেছেন হাতের আঙ্গুলে একটা নারঙ্গবর্ণের মণির দরকার অর্থাৎ গোমেদের আভরণ চাই। তাহলেই বন্ধনদশা কাটবে। সেটা পরলেই পথ পরিষ্কার বিদেশে যাওয়ার। ওখানেই তাকে থাকতে হবে, স্বদেশে কিছু হবার নয়।

বাস্তবিকই সব দুয়ার খুলে গেল তার গোমেদ ধারণের পর। এখন নামও করে না ফিরে আসার। যে-বস্তু যেখানে যাকে টেনে নিয়ে যায়, সেটা যে হোতে বাধ্য। এসব যে ভাগ্যলিখনের এক একটা বাস্তবধর্মী আখ্যায়িকা। বিস্ময়ে অভিভূত হবার মতো।

এই মানুষ যিনি অপরকে দিতেন ভবিষ্য-সূচনার সামগ্রিক চিত্ররূপ এবং যাদের ভাগ্য বিরুদ্ধভাবযুক্ত, তাদের জন্য করে দিতেন মণিকাঞ্চনের ব্যবস্থা, তাঁর নিজের জীবন কিন্তু চলেছিল একটা অদ্ভুত সৃষ্টিছাড়া ধারার মধ্য দিয়ে। স্ত্রী নেই, সেকথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু কেন নেই, সেটা অজ্ঞাতই ছিল।

একদিন বন্ধুবর হৃদয়ের আবেশেই অকপটে বলে চল্লেন, আমি বিয়ে করেছিলাম এমন একটি মেয়েকে যার সামাজিক জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছিল একটি অদ্ভুত পরিস্থিতিতে পড়ে। বিয়ের সকল দুয়ারই তাই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাপও চিন্তিত সেই কারণে। এসব কথা শুনে দয়াপরবশ হয়েই মেয়েটির নিন্দিত ও ছন্নছাড়াজীবনে একটা সুমধুর ছন্দ যাতে এনে দেওয়া যায়, তারজন্য আমি তাকে বিয়ে করলাম, গৃহলক্ষ্মীর আসনে বসিয়ে যাতে গৃহীর বিহিতধর্ম পালিত হয়। এটা যে-কোনো সাধারণ মেয়ের মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা।

আমার আপন আত্মীয়বন্ধুর ঘোর আপত্তি সত্ত্বেও আমি তাকে বিয়ে করি। দিব্যি সংসার চলছিল আমার। কলেজে যাই আসি, ছেলে পড়াই, এ যে কত আনন্দভরা ছিল বলার নয়। পাঁচটি সন্তানও হয়েছিল। শেষেরটি ছিল অবশ্য শারীরিক পঙ্গুতায় একটু রুগ্ন। তারজন্য আমার মনে কোনো নিরানন্দের সৃষ্টি হয়নি, ভালো চিকিৎসা করালে রুগ্ন শরীর সুস্থ হয়ে উঠবে।

কিন্তু একদিন দেখি যাকে অত আদরযত্নে ঘরে এনে প্রতিষ্ঠিত করে-ছিলাম এবং যে এতগুলো সন্তানের জনয়িত্রী, সে গৃহত্যাগ করে পলাতকা।

ভাবুন দেখি, তখন আমার মনের অবস্থাটা কী রকম হোতে পারে?

যেদিন এই ঘটনাটা ঘটেছিল নীরব হয়ে রইলাম সারাদিন। পড়শীরা এসে বাচ্চাদের খাইয়ে দিয়ে গেছে নিজেদের ঘরের রান্না নিয়ে এসে। আমি দুদিন শুধু চা আর পান খেয়েই কাটিয়েছি। কোনো অন্ন মুখে দিইনি।

স্ত্রীতো আমার মুখে চুন লেপে বেরিয়ে গেল; কিন্তু এই ছেলেমেয়ের কথা একবারও ভাবল না সে। এরা বড় হয়ে কী বলবে, কী ভাববে। এটাই তো ভাববে, বাপ একটা অপদার্থ, তাই মা গেছে পালিয়ে। কিন্তু কেন, সেটা যে তারা কোনোকালেই জানতে পাবে না।

শুধু কামনা-বাসনা নিয়েই যারা থাকতে চায়, তাদের ঘরে আটকে রাখা মুস্কিল। তারা যে শুধু একটা সুযোগের অপেক্ষা রাখে। পলায়নী মনোবৃত্তি যাদের, তাদের হাজার পিছমোড়া করে রাখলেও তারা পিছলে একদিন না একদিন বেরিয়ে পড়বেই। সংসারের প্রতি আসক্তি এদের কখনই থাকে না, আসক্তি শুধু পরপুরুষের সঙ্গে থাকার। সেটা পেলেই তারা কামমত্তে পাগল হয়ে পড়ে। এটাও ক্ষণিক, মন আবার অন্যত্র ধাবিত হোতে থাকে।

এটা আমার হস্তরেখায় স্পষ্টরূপেই চিহ্নিত। দশটা পাথর পরেও আটকানো যাবে না। দেখছেন না, আমার দশটা আঙ্গুলে কতরকমের পাথর রয়েছে। কই পারল কী কোনো একটা পাথর সেটা আটকাতে? পাথরটাথর সব হোলো বুজরুকি ব্যাপার। আপনাদের মতো কতকগুলো মুখ্যু, যা বলি, তাই শুনে অবাক হয়ে যান।

আমি এখন সম্পূর্ণ মুক্ত। এখন আমার একমাত্র কর্তব্য হোলো এই বাচ্চাগুলোকে মানুষ করা। রোজ ভোর পাঁচটায় উঠি, এদের জন্য রান্নাবান্না করে খাইয়ে দাইয়ে, তবে কলেজে দৌড়ই। দাই আছে একটা, বাকী কাজ সেই সারে।

এই বলে তিনি হলুদমাখা হাতটা আমার দিকে প্রসারিত করে দেখিয়ে দিলেন তার প্রমাণ হিসেবে।

আই অ্যাম ডেস্টিন্‌ড টু ডু দিস্ হাউস্‌হোল্ড জব্‌---নো পাওয়ার অন দিস আর্থ ক্যান চেঞ্জ মাই ফেট্‌। আই অ্যাম কোয়ায়েট হ্যাপি নাউ---এই বলে হো হো করে হেসে উঠলেন।

মনে হোলো তিনি এই গুরুগম্ভীর সমস্যাটা কত হাল্কাভাবে নিয়েছেন। হৃদয়ে কোনো আঁচড় কাটতে পারেনি এই কলঙ্ক। তাই নির্দ্বিধায় বলে গেলেন ঘরের এই গোপন কথা।

সত্যি এমন নির্ভীক মানুষ খুব কম দেখা যায়। কলেজে প্রফেসার-

বন্ধুদের মধ্যে, ছাত্রদের মধ্যে, এমন সর্বজনপ্রিয় লোক বেশি দেখা যায় না। বহু দরিদ্র ছাত্রকে বাড়ীতে ইংরেজী পড়িয়েছেন বিনা পয়সায়। বই নেই অনেকের, তাদের জন্য বই সংগ্রহ করে দিয়েছেন, কারুর জন্য পরীক্ষার নোট লিখে দিতে হবে, সেটাও করে দিয়েছেন। কোনোরকম অনিচ্ছা দেখা দেয়নি তারজন্য।

বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের অসুখে-বিসুখে তাদের পথ্য তৈরী করে দিয়েছেন। নিজের কাজকে কখনও অবহেলা করেননি। যে তাঁর কাছে গেছে সবাইকে সাহায্য করেছেন। নিরাশ করেননি কাউকে। ভেতরে যে কতখানি ব্যথা বহন করে চলেছেন, সেটা কাউকে জানতে দেননি পর্যন্ত। ক্লেশসহন ক্ষমতা ছিল প্রচণ্ডরকম। সর্বদাই মুখে হাসি, আর ইংরেজী বুলি।

নিজের ছেলেমেয়েদের কোষ্ঠীবিচার সবই করে রেখেছিলেন। কে কী রকম দাঁড়াবে তারও একটা আভাস দিতেন আমাকে। একটি ছেলের বেলায় বলেছিলেন, এটা জলে ডুবে মরবে—অমুক দিন অমুক সালে। বারণও করে রেখেছিলাম জলের ধারে যেতে। কিন্তু কে কার কথা শোনে? অদৃষ্টলিপিতে যা লেখা আছে সেটা কী, না ঘটে যায় কখনো?

আরো বল্লেন, যেদিন এই ঘটনা ঘটবে তাকে বারণ করেছিলাম আজ বাড়ীর বাইরে যেও না কোথাও। কোন ফাঁকে কখন, কজন বন্ধু এসে নিয়ে গেছে গঙ্গাস্নানে। খানিকবাদে সেই বন্ধুরাই ফিরে এসেছে আমাকে শোনাতে, ছেলের জলে ডোবার কাহিনী। দেখুন ওর ঠিকুজিতে এটার গণনা করা ছিল কিনা?

এর জন্য চোখে কোনো জল নেই তাঁর। ইট হ্যাজ গট্ টু হ্যাপ্‌ন্। সম্পূর্ণ সহজ সরল ব্যাপার।

ইনি মারা যাওয়ার কয়েক মাস আগে খুঁজেছিলেন আমাকে। প্রায়ই ছেলেদের বলতেন আমাকে একবার খবর দিতে। রিটায়ার করার পর তিনি আবার ফিরে গিয়েছিলেন সেই গর্দানিবাগের পুরনো জায়গার কাছাকাছি একটা ভাড়া বাড়ীতে। আমি তখন থাকি রাজেন্দ্রনগরে। জানতে পেয়ে দৌড়েছিলেম তাঁর খোঁজে।

অনেক কষ্টে বের করেছিলাম তাঁর নতুন ভাড়া-বাড়ী। দুয়োর বন্ধ। বহু ডাকাডাকি করেও কোনো সাড়া পেলাম না।

পাশের বাড়ী থেকে কোনো একজন মহিলা বেরিয়ে এলেন একটা ঘোমটা টেনে। বল্লেন, ছেলেরা তো কেউ নেই, সবাই তো অফিসে গেছে। উনি ঘরে শুয়ে আছেন, ডান হাতটা তো পড়ে গেছে। চোখেও দেখেন না

আর, কানেও শোনেন না। সবারই তো কাজকর্ম রয়েছে, তাই তারা এঁকে খাইয়ে-দাইয়ে ঘরে তালাবন্ধ করে চলে যায়, তা না হোলে যদি দরজা খুলে বেরিয়ে যান, এই ভয়ে। আমি মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসি। তারপরে সেই মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে ?

উত্তর দেবার যে কিছু নেই আমার। বন্ধ দরজার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি নীরবে। মনে মনে বলি, হে বন্ধু কোথায় হারিয়ে গেল তোমার সেই বিপুল শক্তি যা দিয়ে বেঁধে রেখেছিলে নিজেকে ? শত দুঃখেও কোনোদিন জল গড়ায়নি চোখ বেয়ে, অসাধ্যসাধনে সর্বদাই ছিলে ব্রতী। সেই হো হো হাসি, সেই মুক্তকণ্ঠে মানুষকে নির্ভীক হওয়ার আশ্বাসবাণী সবই যে স্তব্ধ হয়ে গেল। আজ শত ডাকেও যে আমার সেই স্বর তোমার কর্ণবিবরে প্রবেশ করতে অক্ষম। চোখ দুটিও যে করে ফেলেছ দৃষ্টিহীন। কাকে দেখাবে আর সেই ভ্রূকুটি প্রদর্শন ? তুড়ি মেরে বিপদকে তাচ্ছিল্য করার আর যে নেই কোনো শক্তি তোমার মধ্যে। স্তব্ধীভূত হয়ে পড়েছে তোমার সব ইন্দ্রিয়, এ যাতনা যে আমার পক্ষে সহ্য করার মতো নয়। তুমি যে এখন সর্ববিষয়েই অকিঞ্চন।

১৯৫৮-৫৯ সাল নাগাদ গর্দানিবাগের সরকারী কোয়াটারে প্রবেশ করেছিলাম আমি। অন্দরে প্রবেশ করতে করতেই মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়েছিল, এখানে পাঁচ বছরের বেশি থাকব না। যে করেই হোক একটা নিজস্ব বাড়ী করে ফেলব এর মধ্যে। বারবার গৃহ বদলের দরুন এলো-মেলো হয়ে যায় সব কিছু, স্থায়িত্ব নিয়ে কিছু করার উপায় থাকে না, মানসিক চাপটাও যায় বেড়ে। সবচেয়ে বড় কথা, গার্হস্থ্য জীবনে স্থিরতা থাকে না বারবার গৃহহারা হয়ে।

জনি না, আমার মনের এই অভিলাষ মাথার ওপরে যে ঈশ্বর বসে আছেন সবকিছুর নিয়ন্তা হিসেবে, তিনি জানতে পেরেছিলেন কিনা। তবে ১৯৬১ সালে রাজেন্দ্রনগরে এক ফালি জমি কিনতে পেরেছিলাম। আমার পিস-শ্বশুর রাজেন্দ্রলাল সেনের অপার সাহায্য না পেলে এই জমি পাওয়া অসম্ভব ছিল। মানুষকে, কখন কে যে কীভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে, সেটাও একটা ভাববার বিষয়। হঠাৎ হঠাৎ সেই ব্যক্তি অন্যের গুরুভার গ্রহণ করে বসে, এটাও বোধহয় ওপরওয়ালার নির্দেশ অনুযায়ী সংঘটিত হয়।

আর, এল, সেন তখন বিহার রাজ্যের চীফ-মিনিস্টার---বিনোদানন্দ ঝা-এর সেক্রেটারি। এই পদটি বরাবরই আই, এ, এস-দের জন্য সুরক্ষিত। এই প্রথম একজন নন-আই, এ, এস, যিনি তাঁর কার্য-ক্ষমতা, ব্যবহারিক গুণ ও চরিত্রবলে এই পদটি পেয়েছিলেন। বৃটিশ আমলের একজন সাধারণ টাইপিস্ট থেকে ধীরে ধীরে উঠে এসেছিলেন এই পদটিতে, যে-গৌরব অনেকের ভাগ্যেই জোটে না। চীফ-মিনিস্টারের সেক্রেটারি মানেই হোলো অনেক শক্তিসম্পন্ন মানুষ। কিন্তু এই পদে থেকে তিনি কখনই কারুর ওপর প্রভুত্ব ফলাননি, না প্রসারিত করে ছিলেন কোনো প্রতাপ। সম্পূর্ণ উদারচেতা, সরল মিষ্টভাষী মানুষ, পরোপকার করার অসীম প্রবৃত্তি। তবে পুরোপুরি নিয়মনিষ্ঠ ও বিধিসম্মতভাবে কাজ করার পক্ষপাতী। কথার দাম ছিল প্রচণ্ড, নিজেও যেমন এটা মেনে চলতেন, অন্যরাও যাতে কথার নিষ্পাদ্য হেলাফেলা না করে সেদিকে দৃষ্টি রেখেই সেই কাজটা করতে বলতেন। আমার এই জমি পাওয়াটা ছিল ভাগ্যের ব্যাপার, তবে এঁর আনুকূল্য না পেলে সম্ভব হোতো না।

এ ধরনের মানুষের অন্তরের স্বরূপ যে কত বড় তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

আমার একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী বন্ধু ছিলেন। একটা ভালো পোস্টেই ছিলেন ইনি। পদের মহিমা যত না ছিল তার চেয়ে বেশি ছিল নানাভাবে প্রলোভিত হবার মতো সুযোগ সেই পদে থেকে। একটা কলমের আঁচড়ে কাউকে যেমন অর্থক্ষতি করে দেওয়ার মতো ক্ষমতা ছিল, তেমনি কাউকে অর্থ সমাগমের বিপুল সুযোগ করে দেওয়ার যথেষ্ট ফাঁকফোঁকর ছিল এই পদে বসে। যে কারণে কিছু নিজস্ব লোককে বেছে-বুছে পাইয়ে দিতে ছিল খোলা হাত, অথচ যারা নিজের লোক নয়, তবে একসঙ্গে কাজ করছে বসে, তাদের ওপর প্রসারিত হোত মজবুত হাতটা। এটা একটু দৃষ্টিকটু লাগত সবার কাছেই---যারা সুবিধাভোগী এবং যারা নয়, দুপক্ষের কাছেই এটা কেমন যেন ঠেকতো। অথচ নিজে ভোগ করত বেআইনি অনেক কিছুর সুখসুবিধা।

অধুনা সরকারী বা বেসরকারী দপ্তরে টুরে না গিয়েও একটা ফল্‌স টি, এ, বিল তৈরী করে, সেটাকে অনুমোদন করে নেওয়ার মধ্যে কোনো সংকোচ বা অন্যায়বোধ বলে কিছু নেই। অসদাভিপ্রায় নিয়েই চলে এসবের কাজকারবার। এইভাবে বিরাট অর্থলাভের আকাঙ্ক্ষারও শেষ নেই, এমনকি যিনি এধরনের টি, এ, বিল অনুমোদন করেন তাকেও পাইয়ে দিতে হয় একটা অংশের টাকা। এধরনের মিথ্যা টি, এ, বিলের দাবীদার

যে আগেও ছিল না এমন নয়, তবে তারা সংখ্যায় ছিল সীমিত। সেজন্য তারা ভয়ে ভয়ে থাকত সবসময় সশঙ্কিত, এখন যেটা একেবারেই নেই। সবকিছু চলে খোলাখুলিভাবে। এর ভেতরে যে নিয়মের কোনো অন্যথা-বোধ থাকতে পারে বা এটা যে একটা বিরাট অপরাধজনিত কারবার যে কারণে অপরাধীকে প্রচণ্ড শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন, এসবের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এটা যেন অন্যায়ভাবে অর্থোপার্জনের সহজ সরল উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই কিছু লোক দিব্যি এ থেকে বেশ কিছু করে খাচ্ছে। তাদের ধরার যে কেউ নেই। পেছনে যদি কোনো ফেউ লেগে থাকে তবেই অপরাধী ধরা পড়তে পারে, তাছাড়া নয়।

আমার সহযোগী-বন্ধুটি এমনি একটি বিপাকে পড়ে গিয়েছিলেন নিজস্ব একটা টি, এ, বিল নিয়ে। কথায় বলে না, নিজে খেলে অন্যকেও খাওয়াতে হবে। সেখানে চোখরাঙানি চলতে পারে না। নিয়মের ঢাকনা তাদের ওপর চাপানো যায় না। নিয়মসঙ্গতভাবে অপরাধীকে সাজা দিতে পারে সে-ই যখন সে নিজেকে এ থেকে কলঙ্কমুক্ত করে রাখতে পারে। নিয়মের নিগড়ে তখনই তাকে আটকানো যায় যদি নিয়ম সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থেকে নিজে নিয়মসিদ্ধ হয়ে চলতে পারা যায়।

নিজের বেলায় নিয়মের কোনো বালাই নেই অথচ অপরের বেলায় কড়া শাসন, এটা বেশিদিন চলতে পারা সম্ভব নয়। সহযোগী-বন্ধুটি একটা টুর বিলে নিজে একবার পড়ে গেলেন ভীষণ কোপজনিত দুর্গতিতে। যে-রেলক্লাশে টুর করেননি, সেই আপার ক্লাশের টি, এ, চার্জ করে ফেলেছিলেন উনি।

এঁকে একটু পাকে ফেলার জন্যই আঘাতকারীরা একটা বড় সুযোগ খুঁজছিল। তারা প্রমাণ করে দিল যে যেদিন উনি টুরে গেছেন সেইদিন সেই আপার ক্লাশের কোনো রেলওয়ে টিকিট কাউন্টার থেকে নির্গতই করা হয়নি। এতখানি প্রমাণসম্বলিত যে অভিযোগ, সেটাকে অগ্রাহ্য করার মতো কারুর সাধ্য নেই। ওপরওয়ালার কাছে এই লিখিত অভিযোগে তক্ষুণি তাঁকে সাস্‌পেণ্ড করা হোলো। সেই সঙ্গে আরো কতকগুলো অভিযোগ আনা হোলো এঁর বিরুদ্ধে।

সরকারী ব্যাপারে অনেক কিছু সহজে পাইয়ে দেওয়ার সরল উপায় আছে, কিন্তু একবার বেআইনী কোনো কাজের জন্য ধরা পড়ে গেলে সহজে তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া বড় কঠিন। নানারকমভাবে তার তদন্ত, বহু প্রণালীর অন্বেষণ শুরু হয়ে যায় তখন। সহজে তা থেকে খালাশ পাওয়া সম্ভব নয়। সাক্ষী সাবুদও বিলুপ্ত করা মুস্কিল। একটা ইন্‌কোয়ারি কমিটিও স্থাপিত হয় সেইজন্য। এই সব আনুষঙ্গ কাজকর্ম

সেরে কমিটির রিপোর্ট দিতেও লাগে বছর দুয়েক, অনেক সময় তারও বেশি। ততদিন অপরাধীর সাময়িক কর্মচ্যুতির সময়কাল চলতেই থাকে।

আমার সহযোগী-বন্ধুটির এতো দীর্ঘ সময় সাস্‌পেণ্ড-অবস্থায় থাকার দরুণ মনঃকষ্ট যে কীভাবে তাকে পীড়া দিয়েছে সেকথা বলার নয়। ভারসাম্যও প্রায় হারিয়ে ফেলার মতো। দুবছরেরও বেশি হয়ে পড়েছে এই অনিশ্চিত অবস্থা। অন্য কোথাও যে চাকরি যোগাড় করে নেবে, সে সুযোগও নেই। প্রায়ই তখন আমার কোয়ার্টারে আসে সে, সঙ্গে অন্য আর একজন বন্ধুকে নিয়ে।

সহযোগী-বন্ধুটির মুখে চোখে থাকে সর্বদাই একটা শুষ্কতার ভাব, প্রাণখুলে হাসার মধ্যেও নেই কোনো সজীবতা। কী করে হবে সেটা? চাকরি থেকে সাস্‌পেণ্ড হয়ে থাকার অবস্থাটা যে বড় মর্মপীড়ক, লোকের কাছে তো হেয় হয়ে থাকতেই হয়, পরিবার-পরিজনও ভালো চোখে দেখে না এই অবস্থাটা। সর্বসমক্ষেই একটা ম্লান চেহারা নিয়ে যেতে হয়, কিংবা এড়িয়ে চলতে হয় একটা অপরাধী ভাব নিয়ে। এর চেয়ে অবমাননীয় আর কী হোতে পারে একজন শিক্ষিত ব্যক্তির কাছে?

চেষ্টার ত্রুটি নেই তার, যাতে মুক্ত হোতে পারে এই দগ্ধ-অবস্থা থেকে। বড় বড় কয়েকজনকেই ধরেছিল সে বিনয়পূর্ণ আবেদন নিয়ে যদি তাঁরা এই ব্যাপারে কিছু সাহায্য করতে পারেন। কিন্তু যিনিই শুনেছেন সাস্‌পেনশন্‌-এর কারণহেতু, তখনই তপ্ত হয়ে উঠেছেন তাঁরা। কেউ আমল দেননি। এধরনের অপরাধ তো মার্জনীয় নয়, উচিত শাস্তিই বিধেয়। তাছাড়া কারুরই প্রবৃত্তি নেই যে এর হয়ে ওপরতলায় সাফাই গায় গিয়ে।

তাই ভীষণ মুষড়ে পড়ে আমার এই সহযোগী-বন্ধুটি, কী জানি কী হবে বিচারে। যদি চাকরি থেকেই সরিয়ে দেওয়া হয় শেষ পর্যন্ত, কোন মুখে বেঁচে থাকবে সেই লজ্জা নিয়ে?

একদিন এই সহযোগী-বন্ধুটি সানুনয়ে অনুরোধ জানালো আমাকে। একমাত্র উপায় ওকে চাকরিতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা অপরাধমুক্ত করে, যদি আমি আমার পিস-শ্বশুরকে গিয়ে ধরি। একমাত্র পরিত্রাতা উনি, যদি তাঁর চীফ-মিনিস্টারকে বলে সাজাটা একটু হাল্কা করে দেন। এছাড়া যে আর কোনো গতি নেই। আমার অন্য বন্ধুটিও সায় দিল এই কথায়। ফাইল যে চীফের কাছেই যাবে শেষ আদেশের জন্য।

এদের দুজনের কথায় আমি মোটেই উদ্দীপ্ত হোতে পারলাম না। আমি জানি পিশেমশায় কতখানি নিয়মানুবর্তিতার বশবর্তী। এত বড় পদমর্যাদায় রয়েছেন শুধু সততা ও ন্যায়ের জোরে। হাল্কা মানুষ ছিলেন না

কোনোকালেই, একটা দীপ্ততেজ নিয়ে কাজ করেন সব সময়। সেই মানুষকে এসব কথা বলা যায় কী কখনো?

একটা বিরাট অন্তর্দ্বন্দ্বে পড়লাম আমি। এসব শুনে আমি নীরব হয়ে রইলাম। অপর বন্ধুটি তার প্রিয় বাক্যে আমাকে আরো বোঝাতে আরম্ভ করেছে। আমি যদি পিস-শ্বশুরকে গিয়ে বলি তাহলে উনি অতি-অবশ্যই আমার কথা রাখবেন জামাতার খাতিরে।

ওসব হোলো একেবারেই খাতিরে-কথা। আমার সমস্যাটা যে একেবারে ভিন্ন, অপরাধীর সাজা মাফের আবেদন নিয়ে একজন মর্যাদাশীল ব্যক্তির কাছে যাওয়ার মধ্যেও যে রয়েছে স্বীয় ব্যক্তিত্বজ্ঞানের প্রশ্ন, সমাদরের প্রশ্ন। হোতে পারি আমি ওঁর সম্পর্কিত জামাতা, যথেষ্ট আমাকে ভালোবাসেন, তাই বলে তার সুযোগ নিয়ে ওঁর সুনীতির কাছে আমার অন্যায় আব্দার রাখতে যাব কোন ভরসায়? যদি প্রত্যাখ্যাত হোয়ে ফিরে আসে আমার এই অনুনয়? তাহলে ওই বাড়ীতে আমার মর্যাদাটা যাবে কোথায়?

এটা যে একটা বড় বিরোধযুক্ত প্রশ্ন, ন্যায়-অন্যায়বোধের কথা, ভালোমন্দ রয়েছে তাতে যুক্ত হয়ে। প্রথম কথাতেই তো তাঁর মনে একটা বিরাট আঘাতের সৃষ্টি করবে। বলার ইচ্ছা থাকলেও যে বিফল হওয়ার সম্ভাবনা। এই মানুষকে যে আমার বন্ধু দুটি চেনে না। শুধু নিজেদের চিন্তা ও স্বার্থতেই মগ্ন।

পরদিন নিজের মনটা স্থির করে নিয়ে সপরিবারে গেলাম পিসেমশায়ের হার্ডিঞ্জ রোডের কোয়াটারে। আমার বলাতে যদি সহযোগী-বন্ধুটি দুর্দশামুক্ত হোতে পারে, তবে বলেই দেখি না আত্মসম্ভ্রম ও লাজলজ্জা ত্যাগ করে।

নানা গল্পের মাঝে, মনে অনেকটা শক্তি সঞ্চয় করে কথাটা পেড়েই ফেল্লাম পিসেমশায়ের কাছে। ভয়ে ভয়ে বলছি সব ঘটনা, কারণ জানি উনি এসবের কোনো আমলই দেবেন না। সততার মধ্যে থেকে যাঁর অত বড় একটা পদপ্রাপ্তি তিনি কখনই এসব কথা সহজভাবে নেবেন না।

আমার কথা শেষ হোতে না হোতেই ওঁর মুখের চেহারা গেল বদলে। সুন্দর ফর্সা চেহারাখানা লাল টকটকে হয়ে গেছে। বল্লেন, এসব শোনাও তো অপরাধ, আর তুমি বলছ চীফ-মিনিস্টারকে বলে কিছু করা যায় কিনা। এসব আমি করতে পারব না, অপরাধীর শাস্তি হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এধরনের অপরাধ করতে সাহস হয় কীসের জোরে?

আমার এই অনুরোধ এইভাবে ক্রোধ ও আস্ফালনে শেষ হবে এতটা আশা

করিনি। নিজেরও লজ্জাবোধ হোলো—কাকে বলতে এসেছিলাম এসব কথা?

পিসেমশায়ের বিরাট ড্রয়িংরুমের সোফায় বসে এর গুরুত্বটা বোঝার চেষ্টা করছিলাম, আর ভাবছিলাম সত্যিই তো এই ব্যাপারে উনি মাথা নীচু করতে যাবেন কেন চীফ-এর কাছে?

ড্রয়িংরুমে সবাই তখন নীরব অবস্থায় বসে। আমার গৃহিণীও সেখানে।

এমন সময় ঘরের নীরবতা ভঙ্গ করে পিসিমা বলে উঠলেন, জামাই তো ওর নিজের জন্য কিছু করতে বলছে না। ওর এক সহযোগী-বন্ধু বিপাকে পড়েছে বলেই এই অনুরোধ নিয়ে এসেছে। এতে জামাই-এর দোষটা কোথায়? শুধু একটু উপকার পাওয়া ছাড়া তো আর কিছু নয়। আর তোমার বলাতে যদি চীফ অল্প শাস্তি দিয়েই তাকে খালাস করেন তবে ক্ষতিটা কোথায়? মিছামিছি, তুমি রাগ করছ?

পিসিমার এই কথায় উনি একটু শান্ত হলেন। আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ফাইলটা এখন কোথায়?

আমি ভয়ে ভয়েই বল্লাম, ডিপার্টমেন্টাল সেক্রেটারির কাছে।

আমার কথা শেষ হোতে না হোতেই উনি ত্বরিত গতিতে ফোন ওঠালেন কথা বলার জন্য। কার সঙ্গে বুঝলাম না।

ফোনের ওপার থেকে কথা আসছে। শুনতে পাচ্ছি আমরা সবাই। বলছেন, নীচ থেকে সবাই এর বিরুদ্ধে চার্জ প্রমাণ করে দিয়েছে। শুধু টি, এ, বিলের চার্জই নয়, অনেক চার্জ রয়েছে তার সঙ্গে। ডিসমিসালের রেকমেণ্ড করেছে কমিটি। এর ওপর আমি আর কী করতে পারি বলুন?

এবার এদিক থেকে উত্তর গেল পিসেমশায়ের, তুমি যদি কিছু করতে না পারো, অন্তত ড্যামেজ্ কোরো না আর। তুমি শুধু ফাইল ফরওয়ার্ড করে দাও চীফের কাছে—ফর ফেভার অফ অর্ডারস করে। বাকীটা আমি যা হয়, করে নেবো।

রিসিভার নামিয়ে রাখা হোলো।

এই উদারস্বভাব মানুষটির হৃদয় ভরা ছিল অসীম ক্ষমাগুণের সদ-বৃত্তি। দেখিয়ে দিলেন তিনি তার ক্ষমতার বহর, সহযোগী-বন্ধুটির গুরুতর অপরাধ সত্ত্বেও হাল্কা শাস্তির ব্যবস্থা করে। চাকুরিতে বহাল থাকার আদেশ হোলো চীফ-এর কাছ থেকে।

মানুষের স্বভাবটাই এমন যে শতধাক্কা খেয়েও যেন বদলাতে চায় না। আসল স্বরূপটা বেরিয়ে পড়ে যখন তখন।

এত বড় ধাক্কা খেয়েও এই হীনচেতা নীতিভ্রষ্ট সহযোগী-বন্ধু মানুষটির চিত্তবৃত্তিতে কিন্তু কোনো পরিবর্তন এলো না। চরিত্রের সেই তিড়বিড়ানি রয়ে গেল পুরোপুরি। যে-মানুষটি লজ্জাসরমের মাথা খেয়েও মাথা নীচু করেছিল সহযোগী-বন্ধুর চাকুরি বাঁচাতে, তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকা তো দূরের কথা, ফিরেও তাকায় না এখন সে আমার দিকে, সম্পর্করহিত করে রেখেছে পুরোপুরি। চেনা দিতেও সে দ্বিধাগ্রস্ত। অহংকারে অন্ধ। নিজের অপকীর্তিকে এখন বোধহয় আবৃত করতে চায় অর্থের আবরণে।

বিচিত্র নকশাবিশিষ্ট এই মানুষটিকে তাই গেঁথে রাখলাম আমার নকশি কাঁথায়। ফোঁড় দিয়ে চলেছি একটার পর একটা শুধু তাকে ভালো-ভাবে চিহ্নিত করার জন্য।

এই মানুষটির কাহিনী এখানেই শেষ নয় কিন্তু। আরো অনেক আছে, তবে দীর্ঘতর করার ইচ্ছে নেই।

এই ছেলেকে নিয়ে মা তার বেঁচেছিলেন অনেক দিন। একা থাকে ছেলে, তাই একজন সঙ্গে থাকা দরকার। ঘরে ঢুকে মা বলে ডাকারও তো প্রয়োজন রয়েছে বাড়ীতে, তাতেও ছেলের মনে একাকী অবস্থানকারী জীবনে একটু শান্তি আসতে পারে। এমনিতে তো গৃহে আর নেই কেউ, সবাই তো যার যার সংসার নিয়ে ব্যস্ত দূরে দূরে। মার মনে কিন্তু এটাই ভাবনা।

কিন্তু মায়ের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না ছেলে। সঙ্গে না থাকলেই ভালো। খরচের পরিমাণ যে বেড়ে যায় তাতে অনেক। সব সময় একটা বিরক্তি ভাব সেই কারণে। ভাঁড়ার খোলা থাকলেই মা বেশি খরচ করে ফেলবেন, সর্বদাই এই শঙ্কা। তাই ভাঁড়ারের সব জিনিসপত্তর থাকে আলমারিতে তালাবন্ধ। এমনকি চা-চিনিটাও। কাজেই মাকে দুধে একটু চিনি খেতে হোলে পাশের বাড়ীর মহিলার কাছ থেকে একটু দয়াযাচ্ঞা করতে হয় চিনির জন্য একটা ছোট্ট বাটি হাতে নিয়ে।

পাশের বাড়ীর মহিলাটি ভালো করে চিনে ফেলেছেন এই ছেলেকে। মার প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা তো দূরের কথা, ক্রোধের আস্ফালন চলে তাঁর ওপর সব সময়। তাই তো পরের কাছে একটু চিনির জন্য হাত-পাততে হয়, অথচ আলমারিতে বন্ধ রয়েছে যথেষ্ট চিনি। ভিক্ষা পাত্র নিয়ে কারুর কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, কিন্তু ছেলের ক্ষুদ্রতার জন্য তাঁকেও যে নামতে হচ্ছে বহু নীচে।

একদিনের কথা। বাড়ীতে রোজকার দুধের ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গেছে বহুদিন। মিছামিছি দুধ রেখে কী হবে আর? বৃদ্ধ বয়সে অত

প্রোটিনেরই বা কীসের প্রয়োজন? শাকসব্জি যখন যথেষ্ট রয়েছে বাজারে, তখন দুধের শখ না রাখলেও চলে।

সেদিন একাদশীর উপবাস মায়ের। সারাদিন উপোস থেকে সন্ধ্যার পর একটু ফলরুটি মুখে দেন তিনি। ছেলেকে সকালে উঠে বললেন, একটু দুধের ব্যবস্থা করে দিবি আজ, সামনেই তো গোয়ালারা থাকে। শুকনো রুটিগুলো যে চিবোনো যায় না, একটু দুধে ভিজিয়ে তবু খাওয়া চলে। উত্তর এলো, ওসব আমার দ্বারা হবে না। শুকনো রুটি খেতে পারো না, তারজন্য দুধের দরকার কীসের? জলে ভিজিয়ে খেলেও তো চলে।

মার চোখে জল আসে। সত্যিই তো কী ভুলটাই না করেছিলেন নিজের কষ্টের কথা প্রকাশ করে।

অন্য আর একদিন। রাত দুটো হবে তখন। অন্ধকারে কোনো-রকমে দেয়াল ধরে ধরে গেছেন বাথরুমে, ফিরেও এসেছেন সেইভাবে। হঠাৎ খাটের ওপর উঠতে গিয়ে আচমকা পড়ে গেছেন মাটিতে। ব্যথায় উঠতে পারছেন না। ছেলেকে ডেকে চলেছেন, একটু দেখে যেতে।

ছেলে কিন্তু পাশের ঘরেই শুয়ে। মার পড়ে যাওয়ার প্রচণ্ড শব্দ শুনেও সে উঠে দৌড়ে এলো না, বারবার ডাকাডাকিতেও নয়। উত্তর এলো শুধু, এখন শুয়ে থাকো, কাল সকালে দেখব।

এখানেই শেষ নয়। আর একদিন ভোরে মা বাথরুম থেকে কোনো-রকমে ফিরে আবার শুয়ে পড়েছেন নিজের খাটে। শরীরের ভেতর কেমন যেন বিশৃঙ্খলা শুরু হয়েছে, ছটফট করছেন অনবরত। টনটন করছে মাথাটাও। বুকের বাঁ দিকেও কেমন যেন অস্বস্তি। সহ্য করতে পারছেন না সেই কষ্ট।

জোরে ডাক পাড়লেন পাশের বাড়ীর সেই মহিলাটিকে। ছুটে এলেন তিনি। মার এই অবস্থা দেখে তাঁর বুক করছে দুরু দুরু। দৌড়ে নীচে গিয়ে আরো কয়েকজনকে ডেকে আনলেন তিনি, এখন যে শেষ অবস্থা। কী করা যাবে সবাই যে ভেবে আকুল। পাশের ঘরে ছেলে রয়েছে শুয়ে একটা কৃত্রিম নিদ্রাভাব নিয়ে। সবই নজর দিয়ে দেখছে সে।

আর যে কয়েক মিনিটের ব্যাপার। শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে গেছে। এবার একজন মহিলা ডাক দিলেন ছেলেকে উঠে আসতে। ইসারা করলেন মার মুখে একটু গঙ্গাজল দিতে। তাতেও যেন ছেলের মুখে বিরক্তি।

আসছি, বলে ছেলে ঢুকে পড়লো বাথরুমে। ফিরে এসেই দেখে সব শেষ।

মা যে কখনো কোনো প্রতিদানের অপেক্ষায় থাকেন না। ছেলের হাতে সামান্য একটু গঙ্গাজল, তার জন্যও প্রতীক্ষায় থাকতে পারলেন কোথায়? কী হবে আর এসবে? ক্ষতবিক্ষত মন নিয়ে সেই করুণাময়ী চলে গেলেন সবাইকে আশীর্বাদ করতে করতে। মা যে চিরকালেরই ক্ষমাশীলা মাতৃরূপধারিণী। মাতৃদায় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দিলেন তিনি ছেলেকে। এর চেয়ে বড় আর কী হোতে পারে?

আর যে কিছুই করার নেই ছেলের। মায়ের আঁচল থেকে নির্বিকারে সবার সামনে খুলে নিল সে চাবির মোটা গোছাটা। আর মা'র গলায় যে সোনার মটর হারটা জড়ানো ছিল সেটাও। এরপর সেগুলো নিজের ঘরের লোহার আলমারিতে বন্ধ করে, শুয়ে পড়ল খাটে, সবাইকে অবাক করে দিয়ে।

গৃহভাগ্য সকলের সমান হয় না। এ জিনিস আমার অদৃষ্ট জোরেই হয়েছিল। বরাতগুণ একেই বলে। এক আশ্রয় থেকে অন্য আশ্রয়-স্থলে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম কয়েকটা বছর নানা জ্বালাযন্ত্রণা নিয়ে, তারপরেই সেই ঘূর্নাবর্ত থেকে মুক্তি পেয়ে পাকাপাকিভাবে স্থির হলাম রাজেন্দ্রনগরের নিজস্ব বাড়ীতে।

পৈতৃক বাসভূমি নয় এটা। তবে শ্রদ্ধাভরে পিতৃদেবকে দিয়ে করিয়েছি এর বাস্তুপূজা, হিন্দুঘরের গৃহ-নির্মাণে যেটি হোলো প্রথম কাজ, যাতে গৃহদেবতা সন্তুষ্ট থাকেন। এই কাজটি সারা হয়েছিল ১৯৬২ সালের বৈশাখ মাসে।

যিনি সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছিলেন এই গৃহ-নির্মাণে, তিনি হলেন আমার বাবা। এতো দীর্ঘজীবন পাটনাতে কাটিয়েও কোনো পাকাগৃহ করতে পারেননি বলে মনে মনে নিশ্চয় খুব কষ্ট পেতেন। তবে বলতেন না কিছু। তাই তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রের কীর্তিতে খুশির জোয়ার ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর সারা শরীরে।

তিন মাইল পথ অতিক্রম করে পায়ে হেঁটে বিকেলের দিকে প্রায়ই আসতেন বাড়ী নির্মাণের ক্রমগতি কতখানি, সেটা দেখতে। এক একটা ঘরের চারটে দেয়াল যেমন যেমন তৈরী হোতো তাঁর মনের আনন্দও যেন বাড়তে থাকত তেমনভাবেই। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব যাঁরা পাটনায়

ছিলেন তাঁরা কিন্তু সবাই এসে দেখে গেছেন আমার বাড়ী নির্মাণের কাজটি। শুধু একজন বাদে, তিনি হলেন আমার আপন অগ্রজ যাঁর কোয়াটার থেকে আমরা বিতাড়িত হয়েছিলাম একদিন। একদিনের তরেও তিনি দেখতে আসেননি এই বাড়ী। শুনতেও চাইতেন না এসব কথা, কেউ কানে তুললে ক্রোধ পরিস্ফুট হয়ে পড়ত মুখে চোখে।

বাইরের সবাই কিন্তু খুশি হয়ে চিঠি দিয়েছেন কাজের কাজ করছি বলে। তাঁদের সেই চিঠি আমার মনে এনে দিয়েছে ততোধিক শক্তি। বাড়ী তৈরী করা একটুখানি কথা নয়। সামান্য অর্থ হাতে নিয়ে এ যে কত বড় ঝুঁকির কাজ, যে না দেখেছে তার পক্ষে ধারণা করা মুস্কিল। নিজে দাঁড়িয়ে তৈরী করেছি এই বাড়ী, কোনো ঠিকাদারকে দিয়ে নয়।

বাড়ী যে সময়ে তৈরী হচ্ছিল তখন কন্ট্রোলের যুগ। সিমেন্ট যোগাড় করা ছিল দুষ্কর। অনেক কাকুতি-মিনতি করে পেয়েছিলাম দশ ব্যাগ সিমেন্ট শুধু সেটা দিয়ে একটা গুদাম তৈরী করার জন্য। তখন ছিলেন বাঙালী একজন রেশনিং অফিসার। নিজে বাঙালী বলে বাঙালীকে সাহায্যদানে ছিল অনেক কৃপণতা—যেটা অবাঙালীর বেলায় ছিল দরাজহস্ত। অনেক ঝামেলা করে পেয়েছিলাম এই সিমেন্ট। ওঁর কাছে আর তাই যাইনি কখনো।

এরপরে চলে গেলাম আমার এক বিহারী বন্ধুর কাছে, তিনি সেই সময় বিহারের সাপ্লাই এণ্ড প্রাইস কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি সেক্রেটারি। বন্ধু রঘুনাথ প্রসাদ এক কথায় পারমিট দিয়ে দিলেন এক রেলওয়াগন ভর্তি সিমেন্টের জন্য। পালামৌ অঞ্চলের জাপনা সিমেন্ট ফ্যাক্টরি থেকে আনতে হবে সেই সিমেন্ট। তার এজেন্ট তখন পাটনায় বসে। এখানে বসেই তিনি কাজটা সেরে দিলেন আমার। ছ-সপ্তাহের মধ্যেই আমার সিমেন্ট এক ওয়াগন ভর্তি হয়ে চলে এলো পাটনা ষ্টেশনে। লোহার পারমিটও আমার সেই বিহারী বন্ধু ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

সেই রঘুনাথবাবুর সঙ্গে আজও যখন দেখা হয়, তখন উচ্চারণ করি তাঁর উদারতার কথা। হেসে দেন উনি, বলেন, অনেককেই তো পারমিট দিয়েছি, কই তাঁরা তো কখনও সেই উপকারের কথা বলেনও না। আপনা-কেই দেখি একমাত্র মানুষ, ভুলে যাননি সেকথা। দেখা হলেই আমাকে বলেন।

অসময়ে যিনি উপকার করেছিলেন তাঁর অনুগ্রহ যে ভোলবার নয়।

১৯৬২ সালে ডিসেম্বর মাসে বাড়ীর কাজ আরম্ভ করেছিলাম। রোজ সকাল সাতটায় গর্দানিবাগের কোয়াটার থেকে বেরিয়ে আসতাম বাড়ী

তৈরী করার জমিখণ্ডে সাইকেলে চেপে। শীতের হাওয়ায় হি হি করে কেঁপেছি, সারা শরীরে গরমবস্ত্র আবৃত থাকা সত্ত্বেও হিমশীতল হাওয়ায় সেসব ছিল সামান্য বাধাস্বরূপ। পুরো চল্লিশ মিনিট সময় নিতো এখানে পৌঁছতে। কোনোরকমে সকালে কিছু মুখে দিয়ে বেরিয়ে আসতাম। সঙ্গে কোনোদিন টিফিন থাকত, কোনোদিন তাও নয়। দুপুরে মিস্ত্রি-মজুরদের খাওয়ার বরাদ্দ সময়টুকুতে আমিও চলে যেতাম কাছাকাছি কোনো হোটেলে ভাত খেতে।

অত ভোরে যখন বাড়ী থেকে বেরোতাম তখন আমার তিন বছরের কন্যারত্নটি থাকত ঘুমিয়ে, রাতেও যখন ফিরতাম তখনও দেখি বিছানায় শুয়ে পড়েছে। কাজেই বাপের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছিল বেশ কয়েক মাস।

একদিন বাড়ী তৈরীর সাইটে এসে দেখি বড় মিস্ত্রি আসেনি, অসুখে পড়েছে শুনলাম। সতরাং সেদিন কাজ বন্ধ। এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করে দুপুরের দিকে বাড়ীতেই ফিরে এলাম। কন্যা তখন স্নানপর্ব সেরে আহারে বসবে। আমিও চানটান করে খেতে বসব। সেই সময় কন্যা অবাক হয়ে তার মাকে বলছে, বাবা বুঝি আজ আমাদের বাড়ীতে খাবেন ?

একথা শুনে আমার হাসি আর ধরে না। সত্যিই তো বাড়ী করতে গিয়ে নিজের স্নেহাস্পদা কন্যাকেও দূরে ঠেলে রেখেছিলাম, যে কারণে আমার নিজের বাড়ীতে আহার করাটাও ওর কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার হয়ে গিয়েছিল।

অল্প মূলধন নিয়ে বাড়ী করা যে কী কঠিন ব্যাপার, যিনি বাড়ী করেছেন তিনিই সেটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। বাইরের চাকচিক্য দেখে মনে হবে যে বাড়ী নির্মাণ কাজ বড় সহজ, কিন্তু যে কষ্ট, যে দুশ্চিন্তা, যে পরিশ্রম এবং যে-অর্থের প্রয়োজন একাজে মিশ্রিত, তার যোগান দেওয়া বড় কঠিন।

গৃহপ্রবেশের দিন স্থির করে চলে আসব ভাবছি আমরা কজন গর্দানিবাগ থেকে। এসময় বাবা বল্লেন, আমিও থাকব তোমাদের নতুন বাড়ীতে। নিজেদের বাড়ী যখন হয়েছে আর কেন আমি আদালতগঞ্জের কোয়াটারে পড়ে থাকি ?

আমি বিস্ময়ে অবাক হয়ে রইলাম, কত কৌতূহল ছিল বাবার এই

বাড়ী তৈরী করা থেকে। তিনি যদি এ বাড়ীতে না থাকেন তবে যে আমার দুঃখের সীমা থাকবে না।

তবুও বল্লাম, আপনার যে এখানে অনেক কষ্ট হবে বাবা, লাইট নেই, ফ্যান নেই, একখানা ড্রয়িং রুম ও ডাইনিং রুম হয়েছে সবে, বাকী ঘর যে অসমাপ্ত। এর উত্তরে বল্লেন, তোমাদের যদি কষ্ট না হয়, আমারও হবে না।

গৃহপ্রবেশের দ্বারপুজা সেরেছিলেন আমার মা-বাবা দুজনে একই আসনে পাশাপাশি বসে। সে কী অপূর্ব দৃশ্য ছিল। যে দেখেছে সেই বলেছে আমি নাকি খুব ভাগ্যশালী। অশীতিপর বয়সের মা-বাবাকে দিয়ে গৃহপ্রবেশের অনুষ্ঠান-পালন একটুখানি কথা নয়। ভাগ্য অনুকূল না থাকলে এটা হয় না। হয়ত তাই হবে।

সেদিন নারায়ণপুজো সেরে সবাইকে একটু মিষ্টি প্রসাদ দেব বলে অনেককেই ডেকেছিলাম। তাঁরা এসেও ছিলেন আমার উদ্যমের এই পাকাগৃহ দেখার জন্য। সবাই দেখে খুশি, বাহবা দিলেন এই অল্পবয়সে বাড়ী করার বিরাট ঝুঁকির সফলতা দেখে।

দুপুরে কয়েকজন আত্মীয়কে নিয়ে একটু মাছ-ভাত খাওয়ার জন্য বলেছিলাম। আর বলেছিলাম আমার বাড়ী তৈরী করার মূল সহযোগী সেই রাজমিস্ত্রি ও মজুর কর্মীদের। তারা সেদিন খেয়ে দেয়ে কী খুশিই না হয়েছিল সেটা স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। ওরাই যে বাড়ী তৈরী করার প্রধান রচনাকারী আমার—ঝড়েতে-বৃষ্টিতে-রোদে, বড় বড় বাঁশের ভারার ওপর দাঁড়িয়ে নির্ভয়ে ওরাই যে আমার সাধের স্বপ্ন সাকারে স্বরূপ দেওয়ার আসল মানুষ। কাজেই তাদের মনে আনন্দ না এলে আমার যে শান্তি আসতে পারে না। খেয়ে দেয়ে ওরা যখন সবাই আমার সামনে হাসি হাসি মুখ করে দাঁড়ালো, তখন বড় মিস্ত্রির মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, এইভাবে বাড়ীর গৃহপ্রবেশের সময় আমাদের পেটভরে মাছ-ভাত কেউ খাওয়ায়নি বাবু। বড় তৃপ্তি করে খেলাম আজ।

ওদের তৃপ্তি আমার হৃদয়েরই যে পূর্ণকাম, একথা ওদের বোঝাই কী করে।

গৃহপ্রবেশের অনুষ্ঠান-পালন করার দশ দিন পরেই আমরা চলে এলাম এই বাড়ীতে। বাবাও দেখি তল্পি-তল্পা নিয়ে হাজির। নিজেই একটা

চেনাশোনা রিক্সওয়ালাকে ধরে মালপত্তর নিয়ে চলে এলেন এখানে। বাবার এই বাড়ীতে আসাটা আমার কাছে যতটা আনন্দদায়ক ছিল, ততোধিক নিরানন্দের সৃষ্টি করেছিল আমার অগ্রজের মনে। উনি ভেবে-ছিলেন বাড়ী করলে কী হবে, অপাঙ্‌ক্তেয় হয়েই থাকতে হবে আমাকে চিরটা কাল। এ মুখো কেউ হবে না, বাইরে থেকে যেসব আত্মীয় আসবেন, তাঁরা পাটনা স্টেশনে নেমেই দৌড়বেন আদালতগঞ্জে। এ বাড়ীর কেউ খোঁজও করবেন না। এই মনোবৃত্তি বহুকাল আমার অগ্রজকে পীড়িত করে রেখেছিল।

আমাদের এ বাড়ীতে তখন আবার জনসমাগম লেগে থাকত ভীষণ রকম। তাদের আদরযত্ন করতে গিয়েও হিমশিম খেতে হয়েছে। বাবা এখানে থাকার দরুন বাইরের আত্মীয়স্বজনও এখানেই এসে উঠতেন বেশি। ঘরের অভাব, জায়গা নেই শোবার, ছাদে, উঠোনে, এমনকি বাড়ীর বাইরের বারান্দাতেও চৌকি পেতে শুয়েছেন সব।

আমার বড়দিদি বলতেন, তোর এই বাড়ীতে মিষ্টত্বটা বেশি, তাই সবাইকে টেনে আনে এখানে। লক্ষ্মীমন্ত বাড়ী যে তোর, তাই সবাই ঠাঁই চায় এখানে। অথচ আমি জানি, আমার বর্তমান দানাপানির আধারটা যে ফুটো হয়ে রয়েছে, যার জন্য আমাকে শঙ্কাযুক্ত হয়ে থাকতে হয় সব সময়। সেখানে যে লক্ষ্মীর অবস্থান হোতেই পারে না। তবে হ্যাঁ, লক্ষ্মীর ন্যায় গুণবতী রয়েছেন আমার গৃহিণী। তাঁর আকর্ষণ অবশ্য আলাদা। শাকভাজাটাও এমন সুমিষ্ট করে রান্না করে খাইয়ে দিতেন শুধু একটা পদ দিয়েই যে, পুনরায় তার এখানে না এসে উপায় নেই। তাছাড়া তাঁর মধ্যে যে রয়েছে একটা মাতৃসুলভ মিষ্টি ব্যবহার যার টান অনেক বেশি প্রীতিকর। সেটা যে থালাভরা ভাত ও পাঁচ রকমের ব্যঞ্জন সামনে সাজিয়ে দেওয়ার চেয়েও অনেক বেশি মধুর।

এখানে চলে আসার পর যে দুখানা শোবার বড় বড় ঘর অসমাপ্ত নির্মাণ অবস্থায় ছিল সেটাতে হাত লাগিয়েছিলাম। এই কাজের কৃতিত্ব কিন্তু আমার গৃহিণীর, মিস্ত্রিমজুরের তদারকি করেছেন তিনি। আমি যেটুকু কাজ দেখতাম সেটা সকালের দিকে, তারপরেই তো চলে যেতাম অফিসে, আবার ফিরতাম সন্ধ্যা নাগাদ।

সেদিন সবেমাত্র সকালের চা খাওয়াটা সেরেছি, হঠাৎ দেখি আমাদের বাড়ীর গেটের সামনে কে যেন একটা সুটকেস হাতে নেমে এলেন রিক্সা থেকে। মুখখানা কাঁদো কাঁদো, চোখ দিয়ে ফেটে পড়তে

চায় জল। কোনোরকমে সামলে ঘরে ঢুকেই সে কী কান্না। থামানো যায় না।

আমরা তো দুজনে থ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি। হঠাৎ এই সময়ে উনি কেন, কী বলতে চান ইনি, তাঁর রোদনের অন্তরালে কোন কাহিনী ?

ইনি হলেন আমাদের সম্পর্কিত এক বৌঠান, কলকাতায় থাকেন। এমনিতে মানুষটি ভালো, তবে খুবই স্পর্শকাতর। রাগিন্দ্রিয় সবসময় সংযত থাকে না, এই কারণে অনেক সময় শালিনতাও হারিয়ে যায়। তাই সবাই একটু এড়িয়েই চলে। কাজেকর্মে উৎসাহের অন্ত নেই, তবে গুছিয়ে করার মধ্যে কোনো সুরুচির পরিচয় পাওয়া যাবে না। কাজে কেউ কোনো ডাক দিলে বাক্যসুধা বর্ষিত হয় তখন, সেটা কর্ণতৃপ্তিকর হয় না মোটেই, বরং মর্মপীড়ার সৃষ্টি করে। আবার কেউ কিছু ফিস-ফিস করে কথা বল্লে মনে করেন, ওঁর সম্বন্ধে কেউ কটু সমালোচনায় ব্যাপৃত, তাই একটু সন্দিহান তাদের ওপরে। এটা যে হীনমতির লক্ষণ সেটা তাঁর বোধের বাইরে। তাই তাদের ওপর হয়ে পড়েন ক্রুদ্ধ। কথা বলাও বন্ধ করেন। অপমান করতেও বাধে না। কাজেই এহেন মানুষটির সঙ্গে একটু খিটির-মিটির লেগেই যায় বাড়ীর অন্যান্যদের সঙ্গে, এমনকি নিজের কর্তাটির সঙ্গেও। তখন বদমেজাজী মনটা আর সামলে রাখা মুশকিল, ঝাঁজটা ফেটে পড়তে চায় সবার ওপরে—তখন বকাঝকা, গজগজানি উঠে যায় চরমে।

সেই সময় কারুর সাধ্যি নেই তাকে শান্ত করে রাখার। কিছু বলতে গেলেই তখন মেজাজটা হয়ে পড়ে আরো ক্ষিপ্ত। শরীরে ক্ষমাবৃত্তি যে নেই, তা নয়, দয়ামায়া আছে যথেষ্ট। কিন্তু মেজাজটা যে কখনো নিজের কাবুতে থাকতে চায় না। এসবের জন্য নিজের কর্তাটির সঙ্গে লেগে যায় প্রায়ই ঠোকাঠুকি।

কর্তামানুষটি হলেন আবার একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির। সদাচার বৃত্তি নিয়েই তাঁর সৃষ্টি, স্ত্রীর বদমেজাজীকে কখনো সহ্য করতে নারাজ, প্রয়োজন হোলে কয়েকটি তিক্ত কথা দিয়েও তাঁকে শান্ত করতে নেই কোনো দ্বিধাভাব। সংকীর্ণতা নেই হৃদয়ে। মানুষকে আপন করে নিয়ে তাকে স্নেহভালোবাসা দিয়ে মমতাপূর্ণ করে তুলতেই প্রয়াসী। পরোপকারী-বৃত্তি যেন তাঁকে পাগল করে রাখে। অমুকে এটা চেয়েছে, অতএব যে করেই হোক সেটা করে তুলতে হবে লব্ধ। সহযোগী বন্ধু কেউ অসুস্থ, কাজেই তাঁর জন্য ডাক্তারের কাছে ছোটাছুটি, রাত জাগাতেও নেই কোনো আপত্তি। সেখানে অর্থক্ষতি, শারীরিক ক্লেশ, সময়ের অভাব এসব তুচ্ছ।

এই কারণে নিজের প্রতি নজর থাকেনি, স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল না রেখে অতিরিক্ত খাটাখুটিতে শরীরটাকে করে তুলেছিলেন ঝরঝরে। এই কারণে জীবনের শেষভাগে এসে অনেক বড় মাসুল দিতে হয়েছে রুগ্নতায় ভুগে। তবুও মনের সেই পরোপকারী আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হোতে পারেনি। চিঠি লিখেও সবার খোঁজখবর রেখেছেন।

এহেন ব্যক্তিত্বের সঙ্গে স্ত্রীর ভিন্ন মনোবৃত্তি একরূপ হোতে পারেনি কখনো। কাজেই এই মনোগত বিভেদ একটা মিথ্যাযুক্ত আচরণ দিয়ে আবৃত করার চেষ্টা হোতো দু-পক্ষেরই। যখন সেটা সহনশীলতার মাত্রা ছাড়িয়ে যেতো তখন ফেটে পড়ত দু-পক্ষই। এটা ছিল তাঁদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার একটা বিষণ্ণভরা চিত্র। অনেক সময় বেরিয়ে আসত অসংযত ভাষা দু-পক্ষেরই কোনো একজনের। কাকে উচ্চারিত করেছে কে, সেটা ছিল বিচারসাপেক্ষ। সাক্ষ্য দেবার মতো তখন তো কেউ কাছে থাকত না। এ নিয়ে মুখ ভার করে থাকত দুজনেই সারাটা দিন। কখনো সপ্তাহব্যাপী চলত এই বিষণ্ণ ভাব। কথাবার্তাও বন্ধ।

এসব আমার অজানা ছিল না। কাজেই সাত সকালে বৌঠানকে রিক্সা থেকে নামতে দেখে একটা অজানা আশংকায় বুকের ভেতর চাপের সৃষ্টি হোলো। কী কাণ্ড আবার করে বসেছেন ইনি যার জন্য সাড়ে তিনশ মাইলের দূরত্ব পাড়ি দিয়ে, ট্রেনে চেপে পাটনায় এসে পৌঁছেছেন আমার দুয়োরে কোন বিবাদের নিষ্পত্তির আশায়?

বৌঠানের পেটে দুদিন কিছু পড়েনি শুনলাম। বিকেলে একটা ছোট্ট সুটকেস হাতে নিয়ে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে গেছেন। কোথায় যাবেন মনের আবেগে সেটাও স্থির করেননি তখনও—শ্বশুরবাড়ীতে আর থাকবেন না, এটাই মনের ভেতর পাকা। হঠাৎ মনে হোলো আমার এখানে পাটনায় আসাটাই সমীচীন। তাই হাওড়ায় এসে ট্রেনে চাপলেন। এখানে এলে যে অনেক দোষই লঘু করে দেখার সুবিধা হবে। বড় অপরাধও হাল্কা হয়ে যাবে।

গৃহ ছেড়ে বেরিয়ে আসার কারণটা কী জানতে চাইলাম। আমি নিজেও যে ভুগেছি কত এ নিয়ে। তবে আমি ছিলাম পুরুষমানুষ, নানা-রকম সংঘাতে সম্মুখীন হওয়ার সামর্থ্যযুক্ত। কিন্তু ইনি যে মেয়েছেলে, সে শক্তি কোথায়? ঘর থেকে গৃহলক্ষ্মীর বেরিয়ে আসার অর্থই হোলো নানারকম প্রতিবন্ধের সৃষ্টি, আর ঘরে ফেরার সব পথ বন্ধ হয়ে যাওয়া। এতো ভয়ংকর অবস্থা।

বল্লাম, এটা তুমি কী করলে বৌঠান? উচিত হয়নি তোমার পক্ষে

এই পদক্ষেপ ; প্রচণ্ড আক্রমণকে পরাহত করা তোমার পক্ষে যে কঠিন। মেনে নাও এই ভুল, ফিরে যাও আবার। অন্যথায় ভুগতে হবে সারা-জীবন। তাছাড়া তোমার রয়েছে কয়েকটি সন্তান, তাদের ছেড়ে আসলে কী করে? বুঝলাম তোমার কর্তাটির না হয় দোষ-ত্রুটি রয়েছে অনেক, অবুঝ তিনি, স্ত্রীর মর্যাদা দেওয়ার ক্ষমতা নেই তাঁর। সেই চেতনা না হয় হারিয়ে ফেলেছেন উনি। কিন্তু তোমার ছেলেমেয়েরা কী দোষ করেছে? তাদের ত্যাগ করে আসলে কোন নৈতিক বলে?

এবার যেন বৌঠানের হুঁশ হোলো। আবার এলো চোখে জল। এই জল কিন্তু আস্ফালনের নয়, মনস্তাপের।

বৌঠান চেয়ে রইলেন এবার আমার দিকে। কী ব্যবস্থা করি।

সেদিনই বিকেলে চিঠি লিখলাম দাদাটিকে, প্রথমটা একটু কড়া করেই, তারপর অবস্থাটার গুরুত্বটা বুঝিয়ে সুঝিয়ে। লিখলাম গৃহলক্ষ্মী সহজে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে না কখনো, মনের আঘাতটা প্রচণ্ড হয়েছে বলেই এই কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন উনি। তাও ভালো যে আমার এখানে এসেছেন। বিপথগামী হোলে কী হোতো তখন? অন্য কোথাও চলে গেলে তোমাদের মুখটা থাকত কোথায়? আত্মমর্যাদাটা কী দিয়ে ঢাকতে তখন? তোমরাই বা কেমন মানুষ, অন্য বাড়ীর একজন মেয়েকে বাড়ীতে বউ করে আনলে, তারপর তার ওপরে চালাবে যদৃচ্ছা-বৃত্তি। এটা কী কোনো কথা হোলো, শিক্ষিত ভদ্র পরিবারে এরকমটি হওয়া উচিত নয়।

প্রত্যেক মানুষেরই একটা নিজস্ব বোধ আছে, সেটা দিয়েই তার আচরণ তৈরী হয়। ভালো আচরণও খারাপ হয়ে যায় যদি সেখানে প্রতিমুহূর্তে তার নিন্দাটাই ঘোষিত হয়, সর্বসমক্ষে করা হয় অপমান। আমাদের অহংকারটাই হোলো সব বিরোধের মূল। গৃহলক্ষ্মীকে যদি ঘরে নাই রাখতে পারলে তবে কীসের জোরে সংসার সংসার করে বেড়াও?

আত্মবোধটা সব সময় খাটে না। স্থানবিশেষে সেটা চলতে পারে। তাছাড়া মানবিক দিকটা ভেবে দেখেছ কী কখনো? বাহ্যিক ব্যবহার, বিদ্যা, শিক্ষা এসব হোলো সামান্য অলংকার। সত্য হোলো মানুষের হৃদয়, স্নেহভালোবাসাই শক্তি। অন্যের দুঃখকে হৃদয়ঙ্গম করে তার মর্যাদা দেবার ক্ষমতাই হোলো মনুষ্যত্ব। এসব না থাকলে বৃথাই জন্ম মানুষ হয়ে। কী নিয়ে গর্ব করবে তাহলে?

এইভাবে নানা কথা লিখেছিলাম চিঠিতে। দাদাটির চেতনা উদ্‌বুদ্ধ

হয়েছিল কিনা এতে জানি না। তবে ঘটনার গুরুত্বা বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন উনি। তাই এ নিয়ে কোনো হাঁক-হুঙ্কার পাড়েননি কখনও আর।

বৌঠানকে আবার পাঠিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিলাম তাঁর আপন ঘরে, গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা আদরিণীর বেশেই।

আমার দুই দিদির মধ্যে মেজজনের অপরিণত বয়সে পরলোকবাস হয়েছিল, একথা আগেই একবার উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং তাঁর সঙ্গে যোগসূত্রটা খুব দৃঢ় হোতে পারেনি, কারণ তখন আমার নিজের শৈশব অবস্থাই পেরোয়নি, তারুণ্য তো দূরের কথা।

বড়দিদি ছিলেন বড় বেশি ঘনিষ্ঠ। বিয়ে হয়েও তাঁর পা যেন বাঁধা ছিল পাটনার সঙ্গেই লৌহশৃঙ্খলের মতো। ঢাকার ধানমণ্ডিতে ছিল শ্বশুরবাড়ী যেখানে বাংলা দেশী নেতা মুজিবর রহমানের বাসস্থান। পাশা-পাশি ছিল নাকি সেই বাড়ী।

শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গে বড়দিদির সম্পর্কটা মধুর হোতে পারেনি অনেকগুলো কারণে। ভগিনীপতি মানুষটি এমনিতে নিরীহ ভালোমানুষ হোলে কী হবে, কাজেকর্মে জীবনে তেমন কোনো সন্তোষজনক সফলতা লাভ করতে পারেননি। এক কাজ ছেড়ে অন্য কাজে যেতে হয়েছে কয়েকবারই। তাই প্রথম জীবনে স্থিরতা আসতে সময় লেগেছে অনেক বেশি যে কারণে অর্থ সাহায্য করে সবাইকে তেমন খুশি করা সম্ভব হয়নি তাঁর। অভাব অনটনের সংসারে খিটিমিটি লেগেই থাকত তাই। ভাসুর-ননদেরা দেশের বাড়ীতে একটু খোঁচা মেরে কথা বলতেন দিদির সঙ্গে, যেটা অনেক সময় গাল অভিশাপের মতোই মনে হোতো। বড়দিদিকে তাই অনেক দুঃখে, ছেলেপেলে নিয়ে প্রায়ই এসে থাকতে হয়েছে পাটনাতে।

বাবা অনেক জায়গাতেই তাঁর এই জামাইকে একাজে ওকাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ভাগ্য পরিহাস করেছে বরাবরই, তাই এক কাজে লেগে থাকা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। শেষ জীবনে কাজের স্থিতিশীলতা পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু তেমন সচ্ছলতা আসেনি টাকা পয়সার ব্যাপারে। মোটামুটি-ভাবে চালিয়ে যেতেন সংসার।

পাটনাতে থাকার দরুন আমাদের সঙ্গে তাই বড়দিদির সম্পর্কটা গড়ে উঠেছিল নিবীড়ভাবে। পাটনার সঙ্গে তাঁর সংযোগ ছিন্ন করা ছিল কঠিন। শিশু অবস্থা থেকেই তাঁকে পেয়েছি আমরা আপন মানুষ হিসাবে।

কৈশোর, যৌবন ও বৃদ্ধাবস্থাতেও তাই তিনি ছিলেন আমাদের কাছাকাছি। ভাগ্নে-ভাগ্নিরাও সেই কারণে লাভ করেছে মামাবাড়ীর আদর-আহ্লাদ ও নানারকমের আরামপ্রিয়তা। তারাও তাই মামা-বাড়ীর প্রতি সংসক্ত হয়েছিল বরাবর। শৈশব অবস্থা তো ওদের সবারই কেটেছে পাটনাতেই।

বড়দিদি আমাদের কাছে এমন একজন মানুষ ছিলেন যে, তাঁকে বাদ দিয়ে বাড়ীর কোনো বড় কাজ হোতে পারে ভাবাই যেতো না। কারুর অসুখ-বিসুখ করেছে ডাকো বড়দিদিকে, কারুর পেটে বাচ্চা এসেছে ডাক পাড়া হোতো তাঁকেই সামলাতে। বিয়েতে শ্রাদ্ধেতে সব অনুষ্ঠানেই বড়-দিদি ছাড়া আমাদের কাজ ছিল অচল। সবদিক সামলানোর মতো এমন ধীরস্থির মস্তিষ্ক নিয়ে গুছিয়ে কাজ করার মতো অন্য কোনো লোক ছিল না। পাড়াপড়শীরাও ডাকতেন বড়দিদিকে সব এসে সামলাবেন বলে।

বাবার খুব প্রিয় ছিলেন এই দিদি, প্রথম সন্তান বলে নয়। আচার-ব্যবহার কথাবার্তায় ছিল একটা মাতৃসুলভচেতনা। ওকে ছাড়া কোনো কাজ কেউ সামলাতে পারবে ভাবতেই পারতেন না বাবা। পরামর্শও দিতেন তেমনি পাকামাথার যুক্তিতর্ক নিয়ে। কিন্তু এতো গুণ থাকলে কী হবে, নিজের ভাগ্যটা যে ছিল পাথর-চাপা। দুর্ভাগ্যের জন্য কপালে করাঘাত করতে হয়েছে চিরটা কাল। সৌভাগ্যের সূত্রপাত হোতে দেখিনি কখনো, কপাল ঠুকে বড় কিছু করতে গিয়েও সেখানে আঘাত খেয়েছেন প্রচণ্ডভাবে।

এতো কষ্ট এতো দুঃখেও কিন্তু মুখে থাকত সহাস্য আনন্দ। মধুরতায় ভরা ছিল কথাবার্তা, এককথায় হৃদয়গ্রাহিতা। অভাবের সংসার বরাবর থাকা সত্ত্বেও, স্থিরমস্তিষ্কে কাজ করতেন সব।

কলকাতায় যখন আলাদা বাসা করেছিলেন, ছোটোছোটো সন্তানাদি নিয়ে, একাই চালিয়েছেন সেই সংসার ঠাণ্ডা মাথায়। ভগিনীপতি তো কাজে টুরে টুরে ঘুরতেন। বাজারহাট করা, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ঝুঁকি সামলানো প্রভৃতির নিঃসীম দায়দায়িত্ব নিয়ে থাকতেন সেখানে একা। সেই সময় যে-সব আত্মীয়স্বজন আসতেন বাইরে থেকে কলকাতায়, তাঁদের বেশির ভাগই এসে উঠতেন বড়দিদির কাছে। এমন আদরযত্ন আপ্যায়ন যে অন্য কোথাও পাওয়ার জো ছিল না। কোত্থেকে আসবে এসব বাড়তি খরচের টাকা, সেদিকে কোনো খেয়ালই থাকত না বড়দিদির। ধারকর্জ করেও রক্ষা করেছেন সেসব কর্তব্য। বুঝতেও দেননি বাইরের লোককে।

বড়দিদির তিন মেয়ে ও দুই ছেলে। তিন মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন

তিনি, কিন্তু তারাই বা শান্তি পেল কোথায়? বড় মেয়ে শ্বশুরবাড়ীতে বছর তিনেকের মতো ঘরকন্না করে ফিরে এলো পিতৃগৃহে। এটা কেন হোলো, সেকথা পরে বলা যাবে।

মেজ মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন তিনি একজন দোজবরের সঙ্গে। আগের পক্ষের একটি ছেলে ছিল বর্তমান, খুবই ছোটো তখন সে। সরকারী চাকরি করে পাত্র। পিতৃকুল থেকে প্রাপ্ত একটা বাড়ীও ছিল তার, তবে শরিকও কয়েকজন। দিদির অর্থবল নেই যা দিয়ে গর্ব প্রকাশ করার মতো পাত্র যোগাড় করা যায়। মেয়েরও বিয়ের বয়স এগিয়ে চলেছে তরুলতা বাড়ন্তের মতো, দেহসৌন্দর্যও ম্লান হোতে চায়। এমন অবস্থায় যে-পাত্র আসে সামনে তার প্রতি ঝুঁকে পড়েন তিনি। শেষ পর্যন্ত যে দ্বিতীয়-বার বিয়ে করতে চায়, এমন বিপত্নীক পাত্রকেই ধরে রাখলেন। একটা ছেলে রয়েছে আগের পক্ষের, তাতে কী ক্ষতি, মা বলেই সে চিনে নেবে এই মেয়েকে। মাতৃস্নেহ দিয়ে যদি ধরে রাখতে পারে এই মেয়ে, তবে কোনো কালেই বিচ্ছিন্ন হবার সম্ভাবনা নেই। সৎ-মা, অ-সৎ হবে না কখনো।

কিন্তু বড়দিদির এসব সুচিন্তা ও উৎসাহ কাজে লাগল না শেষ পর্যন্ত। নিকট আত্মীয়স্বজন ও পাড়াপড়শীরাই বিঘ্ন ঘটাতে লাগল নানাভাবে। বড় হয়ে এই ছেলের মাথা গেল ঘুরে প্রতিবেশীদের নানা কুমন্ত্রে। বাপ বেঁচে থাকতেই সে গৃহ ছেড়ে অন্যত্র বসবাস শুরু করল। তরুণ বয়স, যেখানে থাকবে সেখানেই একটা কিছু করে খেতে পারবে, এই ধারণা নিয়ে সে বাড়ী ছেড়ে চলে গেল। বিশ্বাসঘাতকতা করল বাপের প্রতি, মা না হয় সৎ। কিন্তু সৎ-মা হয়েও কোনোদিনও তাকে পৃথক করে দেখার মনোবৃত্তি ছিল না এই মায়ের। অসাবধানেও কখনও কোনো দিন উচ্চারিত হয়নি প্রথম পক্ষের ছেলে বলে। এর প্রতি ব্যবহারে নিজের ছেলের মতোই মাতৃসুলভ আচরণ। বরং বেশি মাত্রায়। এই ছেলেও প্রথম থেকেই মা বলে চিনেছিল একে। কিন্তু বাইরের নানা উদ্ভাবনীয় কল্পনা ও পরামর্শ ছেলেকে করে তুলল মাতৃবিমুখ।

তবুও এই ছেলেকে বাদ দিয়েই সংসার চলছিল বিমর্ষ-তার মধ্য দিয়ে নিজের তিন মেয়ে এক ছেলেকে নিয়ে। বাপ হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়ল স্নায়ুরোগে, ধীরে ধীরে কবলিত করল গোটা দেহযন্ত্র, শেষ পর্যন্ত পক্ষাঘাতে শুয়ে পড়ল শয্যায়। কন্ঠস্বরও গেল হারিয়ে।

এই রোগীকে এখন সামলাবে কে, কেই বা দেখবে সংসার, অর্থবলও শিথিল হয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে। দিনপাত করাও যে হয়ে পড়ে কঠিন।

দীনহীনদের কাছে আসেও না যে কেউ একটু আলোর শিখা নিয়ে। ক্রমশ দারিদ্র্যের করাল ছায়া গ্রাস করে ফেলল এই সংসার। ঘটিবাটিও বেচতে হোলো দিনযাপনের জন্য।

বড়দিদি দূর থেকে এসব শোনেন আর চোখের জল ফেলেন। আমার কাছ থেকে মাঝে মাঝে টাকা ও কাপড়জামা নিয়েও সাহায্য করেছেন ওদের। কিন্তু অভাবের বিরাট খাই মেটাতে এই সাহায্য ছিলই বা কতটুকু? বড়দিদি ভাবেন, কী কপালই না আমার, দেখেশুনে বিয়ে দিলাম মেয়ের, সেখানেও যে এই মেয়ের কপাল খুলল না। আমার মতোই সর্বহারা।

বড়দিদির ছোটো মেয়ের কাহিনী আবার অন্য রকম। অর্থাভাবে পড়াশোনা হয়নি এই মেয়ের, তাছাড়া পড়ারও আগ্রহ ছিল না মেয়ের। তা না হোলে অনেক ফ্রী-স্কুলের দ্বার ছিল খোলা তখন। যার নিজস্ব কোনো আগ্রহ নেই পাঠের, তাকে কী আর জোর করে পড়ানো যায়? এই মেয়ের বুদ্ধিটাও ছিল জড়পুত্তলির মতো, চৈতন্য বিকশিত হোতে পারেনি তেমন। মাঝে মাঝে করে খ্যাপার মতো আচরণ, অথচ নিজের সুখ-সুবিধার প্রতি সম্পূর্ণ সচেতন। একটু এদিক ওদিক হোলেই গালমন্দে অপমান করার সম্যক জ্ঞান যায় খুলে।

বড়দিদি ভাবেন, এই মেয়েকে একটি সাধারণ ছেলের সঙ্গে পাত্রস্থ করে দিলেই এই খ্যাপামি ভাবটা যাবে কমে, দুই-একটা বাচ্চাকাচ্চা হোলেই সেটা আর একদম থাকবে না। মাতৃস্নেহ ঝরে পড়বে সন্তানদের প্রতি।

এই বিবেচনা নিয়েই দিদি খুঁজে পেতে বের করলেন এমন একজন পাত্র যে লেখাপড়ায় এগোতে পারেনি অথচ কারিগরি বিদ্যায় নিজেরটা করে খাচ্ছে ভালো করেই।

এই মেয়ের দুটি ছেলে হোলো সেখানে। কিন্তু পাত্রের যে একটি মহাদোষ রয়েছে সেটা ধরা পড়ল অনেক পরে। একটি মেয়েতে সে সন্তুষ্ট থাকে না, দুটি তিনটি নিয়ে সে কামনাসিদ্ধিতে বিলাসী। এধরনের ভোগবিলাসিনীও যে জুটে যায় কেমন করে সেটাও বিস্ময়কর ব্যাপার। কাজেই একই গৃহে দুই স্ত্রীলোক নিয়ে বাস করা যে কঠিন। কাজেই প্রথমটিকে ফিরিয়ে দেয় মায়ের কাছেই। দুটি সন্তান অবশ্য রয়ে যায় বাপের কাছেই। বড়দিদির ভালোবাসার ধন কন্যারত্নটি আবার স্থাপিত হয় তাঁর কাছেই। বড়দিদির মৃত্যুর পর সেই মেয়ে তার বড় বোনের

কাছে। গলার কাঁটার মতো আঁকড়ে পড়ে আছে সেখানে। নিবাতনি-কল্প এর ভবিষ্যৎ।

বড়দিদির কপালটাই ছিল এমনি করেই পোড়া। সারাজীবন কষ্ট ও দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও কিন্তু মহিমান্বিতা ছিলেন সবার কাছে নিজস্ব গুণগৌরবে।

হঠাৎ একবার কী খেয়াল হোলো বড়দিদিকে নিয়ে গিয়েছিলাম আমি কলকাতার কোনো এক তান্ত্রিকের কাছে যদি হাত দেখে, কপাল দেখে বলতে পারেন ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি একটু সুখের আলো দেখতে পাবেন কিনা? কিন্তু তান্ত্রিক মহারাজ এমন নির্দ্বিধায় ও নির্ভেজালভাবে বলে চল্লেন দিদির ভূত ভবিষ্যৎ সব কিছু, যা শুনে আমি বিস্ময়ে স্তম্ভিত। সশঙ্কচিত্তে সেসব শুনতে হয়েছে আমাকে।

একটার পর একটা ঘটনার উল্লেখ করে তিনি বলে চলেছেন যেটা বড়দিদির জীবনে ঘটে গেছে এবং আগামীতেও যা সব ঘটতে পারে। বড়দিদি কিন্তু সহাস্যবদনে শুনে চলেছেন সেসব, অথচ আমার শরীর কাঁটা দিয়ে উঠছে।

দুঃখ সহন করতেই যিনি জন্মেছেন, তাঁর আবার কীসের ভয়? ফেকাসে মুখ নিয়েই এসেছেন যিনি, কিশোর অবস্থা থেকে বৃদ্ধাবস্থা অবধি পৌঁছলেন তা নিয়েই, তাঁকে আবার পাণ্ডুরোগের ভয় দেখানো কীসের? এসব কষ্টে তিনি যে অভিতপ্ত, শরীরে আর যে-কোনো শিহরণ তোলার মতো নয়। দুঃখ-কষ্ট যে তাঁর নিত্যদিনের সহচরী।

তান্ত্রিক এটাও বলেছিলেন তখন, আপনার স্বামী এখন খুবই অসুস্থ, শয্যা নিয়ে আছেন। এ মাসের শেষেই তিনি মুক্তি পাবেন ইহলোক থেকে। আপনার জীবনে সুখ বলে কিছু ছিল না কোনো কালেই, থাকবেও না। ছেলেরা আপনাকে কেউ কোনো সুখ দেয়নি। মেয়েদের ভাগ্যও সুখদায়ক নয়। তবু বড় মেয়েই আপনাকে যা কিছু দেবে। চিত্তের সুস্থতা ও আনন্দ যেটুকু পাওয়ার ওর কাছ থেকেই পাবেন।

তান্ত্রিকের এসব কথা যে কত বড় সত্য ছিল, সেটা পরবর্তীকালের কতকগুলো ঘটনা থেকে পূর্ণ বিশ্বাস হয়েছিল আমার।

এসব সত্ত্বেও বড়দিদি কিন্তু পুজো আর্চাদি করতে খুব ভালোবাসতেন। নিজের ঘরেই ছোট্ট একটু কোণে অনেক দেবদেবীর সামনে এমনভাবে পুজোতে আবিষ্ট হয়ে থাকতেন, যেটা দেখে মনে হোতো দিদির শ্বাসপ্রশ্বাসও বুঝি বন্ধ হয়ে গেছে। মন্ত্র উচ্চারণ করতেন এতো সুন্দরভাবে, যেন সেসব শব্দ বেরিয়ে আসছে নাভির কেন্দ্রস্থল থেকে।

মন্ত্রোপদিষ্ট হয়েছিলেন অনেক বয়সে, কাজেই গুরুর শিক্ষার শক্তিতে এসব পেয়েছিলেন তা নয়। এটা ছিল জন্মলব্ধ বিশেষ গুণ। তবুও ঠাকুর ঠাকুর করেও তাঁর নিজের ভাগ্য ফেরাতে পারেননি।

জীবনের শেষ অধ্যায়টি ছিল বড় কষ্টের। সারাজীবন কঠিন পরীক্ষা দিয়েও শেষ হয়নি যাবজ্জীবনের শোধবোধ। রোগাক্রান্ত হলেন একটা কঠিন রোগে। আমার কাছে এসেছিলেন তার কয়েক মাস আগেই। এখানে থাকতেই ভালোবাসতেন বেশি। নিজের সংসারের প্রতি এসেছিল অনীহা, আর ভালো লাগত না সমস্যাসংকুল হয়ে বাস করতে সেখানে। তাই ছিল পলায়নী মনোবৃত্তি, ভাইয়ের কাছে থেকে একটু সুখশান্তির মুখ দেখা।

মাথায় করে রেখেছিলাম তাঁকে আমরা জননীসদৃশরূপে। কিছুদিন ধরেই গলার ভেতর কেমন যেন ডেলাডেলা ভাব থাকত, খেতেও খুব কষ্ট পেতেন। মাঝে মাঝে আমি ওষুধ দিতাম, সেটা হোমিও ওষুধ। ব্যথা-জ্বালার লাঘব হোতো সেই ওষুধ খেয়ে, তাও শুধু কয়েকটা দিন। আবার যে কে সেই। জানতাম কী কঠিন রোগ এসে তাঁকে ব্যাপ্ত করেছে, ঈশ্বরের কাছে সহস্র আকুতি জানিয়েও যে তার কোনো পরিত্রাণ নেই। বড় ডাক্তারও দেখিয়েছিলাম, তিনিও আমার সঙ্গে একমত। এ রোগ যে ভালো হবার নয়, জীবন নির্বাপিত হোলেই সব হবে শান্ত। তার আগে নয়।

বেঁচে ছিলেন তবুও। আমার কন্যাকে ভালোবাসতেন প্রচণ্ড। সেও পিসিমা বলতে ছিল অজ্ঞান। ওর বিয়েটা না দেখে বুঝি যাবেন না এমনই পণ করেছিলেন, তাই কষ্টটা আর বেশি প্রকাশ করতেন না। রোগ যাতনা চেপে রাখতেন দাঁতে দাঁত রেখে। মেয়ের বিয়ের দিনটা সারাক্ষণ ওর পাশে বসে বিয়ের আসরে। নিজের হাতে দিয়েছিলেন আলপনা, সাজিয়ে দিয়েছেন বিয়ের যাগযজ্ঞের সব সম্ভার নিষ্ঠাকাষ্ঠা নিয়ে।

তারপরেই এসে শুয়ে পড়লেন কাত হয়ে একটা ঘরে নীরবে। আর যে পারছেন না গলার কষ্ট সহ্য করতে।

এরপরে আমার ভাগনে এসে নিয়ে গেল তার মাকে কলকাতায়। কলকাতায় গিয়েই নিভে গিয়েছিল তাঁর জীবনদীপ। শেষ পর্যন্ত সংসার-যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ দিয়েছিলেন সেই ভবতারিণী, যাঁকে দিদি পার্থিব দুঃখ ও যাতনারাশি থেকে মুক্তি দেবার জন্য আকুলভাবে ডাকতেন বারবার।

যাবার আগে ডেকেছিলেন নাকি আমাকে, আমার ওষুধ খাবেন বলে। ডাক্তারের কড়া ওষুধ যে গিলতে পারছিলেন না আর।

টেলিগ্রাম পেয়েই দৌড়েছিলাম কলকাতায়। আমি পৌঁছবার আগের দিনই যে সব শেষ হয়ে গেছে। দেখতে পাননি বড়দিদি আর তাঁর স্নেহানুরক্ত ভায়ের অসহায় সাদা মুখখানা।

দিদির বড় মেয়ের জীবনটাও কিন্তু একটা অদ্ভুত সৃষ্টি। নির্মাণকারী হয়ত ভুলে গিয়েছিলেন এর ভাগ্যলিপিতে সুখশান্তির কোনো রেখা টানতে। অঙ্গাবয়বে কোনো খুঁত ছিল না, খিঁচভরা ছিল শুধু কপালটাই।

পরিণত বয়সেই বিয়ে হয়েছিল এই মেয়ের। কিন্তু শ্বশুরবাড়ীতে গিয়েই নজরে পড়ল স্বামীর একটা কলঙ্কমাখা চিত্র, যেটা নিঃশ্বাস রোধ করার মতো ভয়াল। স্বামী পরস্ত্রীলোলুপ, অবৈধ সহবাসে লিপ্ত। স্ত্রীর নিষুপ্তি অবস্থায় স্বামী নিঃশব্দে উঠে ঢুকে পড়ে অন্য ঘরে। প্রথম প্রথম স্ত্রীর মনে হয়েছে এটা অলীক স্বপ্ন গোছের, ঘুমের ঘোরে সেটা ধরা পড়া ছিল মুশকিল।

এইভাবে যখন এটা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে দাঁড়াল এসে, তখন যে মেয়ের চোখে আর ঘুম আসে না। কিংবা ঘুম এলেও পুরো ঘুম না হওয়ার আগেই ঘুম ভেঙ্গে যায়। চেয়ে দেখে স্বামী নেই পাশে, অন্য ঘরে সে যে শয়ান তখন, শয্যাসঙ্গিনী—যে অন্য এক নারী।

এই দুষ্টানারীকে শাসনে আনার উদ্দেশ্যে রুখে দাঁড়াল সে একদিন। স্বামীকেও করলে সে ধিক্কৃত সবার সম্মুখে। সেই থেকে স্বামী ও এই আত্মীয়ার গোপন অপকর্ম প্রকাশিত হয়ে পড়ল। ঘৃণা ও বিরাগের উদয় হোলো সেই থেকে।

স্বামীর ধৃষ্টামি থামেনি তা সত্ত্বেও বরং ফলটা উল্টোই হোলো। সেই শয়তানী ও স্বামী দুজনেই যুক্তভাবে শুরু করল স্ত্রীর ওপর নানা অত্যাচার। সেই যাতনা হয়ে পড়ল দুঃসহ। আর নীরবে যে সহ্য করা সম্ভব নয়। *একটি পুত্র সন্তান কোলে নিয়ে চলে এলো মেয়ে পিতৃগৃহে।*

তখন থেকেই শুরু এই মেয়ের জীবনে এক কঠোর সংগ্রাম, প্রাণধারণের গ্লানি। ম্যাট্রিকটা দেওয়া ছিল তার, শিক্ষকতার ট্রেনিং নিয়ে ঢুকে পড়ল স্কুলমাষ্টারি করতে।

প্রথম প্রথম খুব কষ্ট হোতো একা একা দূরপথে যাতায়াত করতে। মা-বাবার ছত্রছায়ায় থেকে এই জীবনযুদ্ধ যে অনেক শান্তিময়—স্বামীর

লাঞ্ছনা গঞ্জনা থেকে তো নির্মুক্ত। ভাইয়েরা দাঁড়ায়নি তখন কেউ পাশে এসে, দূর থেকেই দেখেছে তারা, জড়িয়ে পড়তে চায়নি দিদির সমস্যার ভেতর।

মেয়ের তখন একটাই লক্ষ্য, কোলের সন্তানটিকে মানুষ করতে হবে, আরামপ্রিয় হোলে চলবে না। বিরাট দায়িত্ব যে রয়েছে সামনে। বিবাহিত জীবন যখন উন্মূলিত হয়ে গেছে, তখন আর সেই জীবনে ফিরে যাওয়ার প্রশ্ন নেই, উদ্ধারসাধনেও প্রয়োজন নেই। সেই শয়তানের মুখ দেখাও যে পাপ।

একাগ্রতা নিয়ে চলতে শুরু করে এই মেয়ে জীবনের কন্টকিত পথ দিয়ে, নতুন মূল্যবোধ নিয়ে। এক সময় এমন একটা অবস্থায় দাঁড়ায় যে নিজেকে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতে হয়েছে আলাদাভাবে। তবুও দমেনি এই মেয়ে, ক্লেশসহনে বিরত হয়নি একবারও, মনঃস্থৈর্য যেন আরও বেড়ে গেছে। ততদিনে সন্তানও বড় হয়ে গেছে, সে তখন স্কুলের ছাত্র। স্কুলে যাওয়া-আসা নিজেই করে।

এইভাবে বহু বছর কাটিয়েছে নিঃসীম নিঃসঙ্গ অবস্থায় আত্মনির্ভর হয়ে। আপন বিবেক বিসর্জন দেয়নি কোথাও, মাথা উঁচু করে কাজ করে গেছে সর্বত্র।

কখনো কখনো শ্রান্তিতে ক্লান্ত হয়ে যাবার পর মাঝে মাঝে আত্মবিচ্ছেদ নাড়া দিয়েছে মনের অন্তঃস্থলকে, শুধু ছেলের দিকে চেয়ে। কী অপরাধ করেছিল এই ছেলে যে কারণে আজ সে পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত? পিতৃ-কুলের পরিচয় দিতে পারবে কী সে কখনও? পিতার কী কোনো কর্তব্য ছিল না পুত্রের প্রতি? এসব নানা প্রশ্ন আলোড়িত হয়েছে মনের ভেতর। চোখের জলও পড়েছে কখনো কখনো। কী প্রয়োজন ছিল তবে বিবাহের?

মাঝে মাঝে মনের এই সুক্ষ্ম আবেগ জীবনধারণের সব স্বপ্নই চুরমার করে দিয়েছে। অন্তরের ব্যথায় আপ্লুত হয়ে পড়েছে। সেই কাতরোক্তি শোনারও তো কোনো লোক ছিল না কাছে।

তবে পুত্রটি বুঝতে শিখেছিল মায়ের অন্তরের ব্যথা। নিজেকে সংযত করে রাখত সবসময়। শৈশব থেকেই তৈরী করছিল চরিত্রকে একটা কঠোর সমস্যার মধ্য দিয়ে। বেশি কথা বলত না সে, আত্মসংযমে ছিল বিশ্বাসী। মায়ের প্রত্যয়ও ছিল তাই এই সন্তানের প্রতি। ভবিষ্যতে হয়ত দিতে পারবে মায়ের দুঃখ-কষ্টের জর্জরিত জীবনে চিত্তের স্থিরতা—অপার শান্তি। উন্নত চিত্তে গৌরবান্বিত করবে নিজের জীবন, মাকেও করে তুলবে মহিমান্বিত।

ওদিকে পরস্ত্রী-অভিলাষী স্বামীটির মোহ ভঙ্গ হয়ে আসছে ধীরে ধীরে। সেই নারীর কামনালব্ধ গন্ধ আর যে তাকে উত্তেজিত করতে পারে না। সরে আসে সেখান থেকে, চলে যায় বহুদূরে। এক রাজ্য ছেড়ে অন্য রাজ্যে, যেখানে আত্মীয়-বন্ধু কাছাকাছি নেই কেউ। মুখ দেখাবার যে জো নেই আর, কোন লজ্জায় আবার ফিরে আসবে ভদ্রসমাজে? স্ত্রী-পুত্র পরিবৃত হোয়ে যে গৃহসুখ, তার স্বাদই যে আলাদা, সেটা যে চিরস্থায়ী, শান্তিময়ী। কাম দ্বারা উপহৃত জীবন যে ক্ষণকালের, সেটা যে বিবেককে দংশন করবে চিরকাল, সেই কলঙ্ক যে তিরস্কৃত সভ্যসমাজে। কামানল তো নির্বাপিত হবেই একদিন।

এসব ভাবনাই স্বামীকে করে তোলে ব্যাকুল। যে-লক্ষ্মী চলে গেছে ঘর থেকে তাকে কী আবার ফিরিয়ে আনা সম্ভব? কাঁদাকাটি করে, শত ক্ষমাযাচ্ঞা করেও যে ফেরানো যাবে না তাকে।

সেই ছোট্ট শিশুটিই বা কত বড় হয়েছে এখন? কিশোর অবস্থা পার হয়নি নিশ্চয় এখনও। এসব কথা স্বামীর মনের গতির পরিবর্তন নিয়ে আসে, আকারে-ইঙ্গিতে আবার সচেষ্ট হোতে চায় স্ত্রীর কাছে ফিরে আসার। নিজের সম্মান গৌরব ভুলে লজ্জানম্র অবস্থায় একদিন সে সত্যিই হাজির হোলো এই মেয়ের দুয়োরে শুধু একবার ছেলেকে দেখার বাসনা নিয়ে।

এদিকে ছেলে তো একজন অজানা অপরিচিত লোককে দেখে শাসিয়ে উঠতে এসেছে ক্ষিপ্র হয়ে। মায়ের ইশারায় শান্ত মূর্তি ধারণ করে দূরে সরে যায় সে।

অভিশপ্ত অবস্থার মুক্তি চায় যে এখন পিতা। ক্ষমা করা ছাড়া যে কোনো উপায় নেই। মা'র পক্ষেও যে এখন প্রতিশোধের দণ্ড তুলে ধরা কঠিন। ঘরের দুয়োরে যখন নিজেই এসেছে ক্ষমা চাইতে, তখন মনের রাগ উত্তাপ দেখিয়ে তো কোনো লাভ নেই। তাকে যে এই অবস্থায় প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব নয়। স্বামী যে এখন অনুতাপে দগ্ধ হয়ে আত্ম-নিবেদন করতে এসেছে এখানে।

সেই থেকে শুরু হোলো আবার দাম্পত্য জীবনের রসঘন মাধুর্য নিয়ে নব অধ্যায়। স্বামী চাকরি করে অন্য প্রদেশে, স্ত্রী থাকে কলকাতায়। স্বামীর আসা-যাওয়া চলতে থাকে ঘন ঘন। কটুতিক্ত দীর্ঘ জীবনযাপনের পর পারস্পরিক অনুরাগ মধুর রসে ঘনীভূত হোতে থাকে। নতুন কল্পনা নতুন স্বপ্ন একে একে উঁকি দেয় মনে। কিছুদিন পরে আর

একটি সন্তানের জন্ম হয়। সেটি কন্যারত্ন। বাপের মতোই অনেকটা মুখ, রঙটাও তারই মতো ফর্সা।

মেয়ের বিয়ের চিন্তাও যে আসে সেই সঙ্গে। সংসার খরচের উদ্‌বৃত্ত থেকে কিছু সঞ্চয়ের পরিকল্পনাও করে বসে তারা। কিছু অর্থ জমে মায়ের তরফ থেকে, বাপের টাকার হিসেব, সেটা অজানাই থেকে যায়।

এই মেয়ে বড় হবার পর সত্যিই যখন বিয়ের সব ঠিকঠাক, বাপের আর পাত্তা নেই তখন। কোথায় উধাও হোলো আবার? তার ভরসাতেই তো পাত্র স্থির করা হয়েছে, তবুও সন্ধান নেই কোনো। এ যে পুরোপুরি ইন্দ্রজালের মতো গায়েব হয়ে যাওয়া। এখন পালিয়ে বেড়ালে চলবে কী করে? চিঠির পর চিঠি যায় বাপের কর্মস্থলে, নিরুত্তর সব চিঠি।

বিয়ের দিন এসে যায়, তবুও সন্ধান নেই তার। মেয়ের বিয়ের এতো অর্থের যোগান দেবে কে এখন? মাথায় বাজ পড়ে মায়ের। আগে জানলে এতো বড় ঝক্কি নিত না সে কখনই। বাপের ভরসাতেই তো এগিয়েছে এই বিয়েতে। পাত্র ভালো বলেই সবার কাছে সায় পেয়েছে।

বিয়ের দিনও বাপ এলো না ঘরে। সবাই বিস্মিত। গেল কোথায় তবে? এ যে মস্তবড় দায়িত্বহীনতার কথা, পাত্রপক্ষকে জবাবদিহি দেওয়ার প্রশ্ন। বাপ নেই তাহলে মেয়ের, কিংবা ফেরার হয়ে গেছে, দুটোর একটা নিশ্চয়।

মর্যাদা খোয়াতে হবে নাকি পাত্রপক্ষের কাছে? পাত্রপক্ষ ভালো বলে আর এ নিয়ে কোনো কথাবার্তা তোলেনি তারা। বাপ কর্মস্থলে অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তাই আসতে পারছে না, এটাই প্রচার করা হোলো। এদিকে চিত্তক্ষোভে মূর্চ্ছিত মেয়ের আত্মীয়জেরা। মুখ কালো হবার মতোই এই ঘটনা। শেষ পর্যন্ত নিজের ছোট বোনকে সম্প্রদান করল দাদা যেটা বাপের করা ছিল কর্তব্য।

মেয়ের বিয়ের বেশ কয়েক মাস পরে বাপ ফিরে এলো ঘরে। চাকরিতে কী একটা গোলমাল হয়েছিল সেসব নিয়েই ছিল জড়িত। সেটাই নীরবতার কারণ।

চাকরি থেকে পুরোপুরি অবসর নিয়েই এসেছে সে এখন, আর ফিরে যেতে হবে না। তবুও ভালো। কৈফিয়ত বিশ্বাসযোগ্য না হোলেও মেনে নেওয়া ছাড়া যে অন্য উপায় নেই। এখনও যে স্ত্রীর জীবন পড়ে আছে ছড়িয়ে।

রয়ে গেল সে স্ত্রীর কাছেই। মৃত্যুও হোলো এখানেই। এই মেয়ের বৈধব্য বেশ এতো অল্পবয়সে সবাইকে দেখতে হবে, কেউ আশা করেনি।

আবার শুরু হোলো মেয়ের দুঃখ খেদান্বিত জীবন। এতো যাতনা যে সইছে না আর শরীরে। নিস্কৃতি পাওয়ারও যে উপায় নেই। সন্তাপিত মনে আর কী নিয়ে বেঁচে থাকা? একটি পুত্রসন্তান আছে, সেও যে দূরে সরে গেছে তাকে বিয়ে দেওয়ার পর থেকে। কাছে যে আর আসে না সে। মা বলতে যে ছেলে ছিল অজ্ঞান, এখন তার ধ্যানজ্ঞান যে সবই তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েকে ঘিরে। শৈশবে আত্মমর্যাদাজ্ঞান যার ছিল সর্বাধিক, সেই এখন মাকে অমর্যাদায় করে রেখেছে বিচ্ছিন্ন। কী নিয়ে বাঁচবে এখন মা? কীসের প্রয়োজন এই জীবনটাকে রক্ষা করার? ছেলে, বৌ ও নাতিনাতনিরা যদি নাই আসে কাছে তবে জীবনের সব আনন্দরস যে নিরর্থক।

বিয়ের পর ছেলের ভেতর যে এত বড় একটা পরিবর্তন হবে এ যে স্বপ্নেরও বাইরে। আগলে রেখেছিল মা ছেলেকে সবসময়, জানতে দেয়নি একবারও নিজের জীবনের দুঃখভরা কাহিনী। শিশুবয়স থেকে তরুণ অবস্থায় আনতে গিয়ে কতরকম খেয়েছে হোঁচট, যে দেখেছে সেই বলেছে, জীবনে স্থিতিলাভ করে এই ছেলেই মাকে দেবে চিত্তের স্থিরতা, করবে অশান্ত জীবনের পরিসমাপ্তি। নিজের কর্মশক্তিতে, ভক্তিতে শ্রদ্ধায় মাকে করে তুলবে পূর্ণকাম।

কিন্তু এসব ভাবনা ছিল সম্পূর্ণ অলীক। স্বপ্নেরও একটা আনন্দের রেশ আছে, নিদ্রিত অবস্থায় তাতে আচ্ছন্ন থাকা যায় কিছুক্ষণ। কিন্তু এই পরিবর্তন যে স্বপ্নাতীত, ভ্রান্তিমূলক ধারণা নিয়ে চলেছিল এতদিন। সব কষ্টের ভেতরও একটা আশা ছিল, এই ছেলে তাকে দেখবে, মাথায় করে রাখবে চিরদিন শেষ নিঃশ্বাস না পড়া অবধি।

এখন যে একখানা চিঠি লিখেও খোঁজ নেয় না সে। পুত্রবধূটিও হয়েছে তেমনি। ছেলেকে আসতে দেয় না তার মায়ের কাছে, নিজেও আসে না কখনো। ভ্রূকুঞ্চিত করে থাকে শ্বাশুড়ীর প্রতি, অবজ্ঞায় করে রেখেছে সম্পূর্ণভাবে অস্পৃশ্য। এ যে কত বড় অসহ অপমান চিন্তা করা যায় না। এই উপেক্ষা, অবহেলা, তাচ্ছিল্য যে বড় মর্মপীড়ক। এ থেকে যে পরিত্রাণের কোনো পথ নেই।

আছে একটা পথ মাত্র। সেটা হোলো মায়ের তৈরী যে ছোট বাড়ী-খানা যদি ছেলেকে লিখে দেওয়া হয় এখুনি, তবেই আসবে সবাই। এ যে কত বড় একটা ভণ্ডামি সেটা ভাবা যায় না। এতেও আছে কী কোনো নিশ্চয়তা? ছেলের এই সিদ্ধান্তও কী সংশয়শূন্য? এই ব্যবস্থাও যে বিশ্বাসযোগ্য নয়, মাকে যে তখন ঘর থেকে তাড়িয়ে দেবে না সে আশ্বাসও

কী দিতে পারবে সে ? স্ত্রীর আঁচলই যার সর্বস্ব, যার কথায় সে ওঠে বসে, সে মেনে নেবে কী এসব ?

বছরের পর বছর যে-ছেলে মায়ের প্রতি আকর্ষণহীন, খোঁজখবরও নেয় না কোনো চিঠিপত্র দিয়ে, অর্থসাহায্য তো দূরের কথা, অসুখে-বিসুখেও যে কাছে এসে দাঁড়ায় না, কোন ভরসায় তাকে লিখে দেবে সব কিছু এখন ?

এই মা যে পরার্থমুখী নয় এখনও। চাকুরি করে চলেছে এই পরিণত বয়সেও। সেই টাকায় শুধু নিজের সংসার নয়, অন্যকেও সাহায্য করে তাদের তুলে ধরছে। ছেলের অর্থসাহায্যের সে প্রত্যাশী নয়। করে যাবে সে জীবনযুদ্ধ নিঃশ্বাস রুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত।

তবুও লোভাতুর কিছু মানুষ তাকিয়ে আছে তার এই কষ্টার্জিত সম্পত্তিটুকু গ্রাস করার জন্য। এটাকেই বোধহয় বলা হয় জীবনস্বত্ব, যত দিন বেঁচে থাকা যায় ততদিনই থাকে ভোগের অধিকার। জীবতারা খসে গেলে কে কার, কে তোমার ?

বিষয়তৃষ্ণা মানুষকে যে কতখানি হীনচেতা করে তুলতে পারে তার একটি কলঙ্ককালিমাময় চিত্র উঁকি মারছে মনের ভেতর। সেখানে বিষয়ভোগ নিয়ে বিষাদময় অদ্ভুত অবস্থা।

তিনটি ভাই পারস্পরিক স্নেহবন্ধনে সংহত, কোনো রকম অশ্রদ্ধা নেই কারুর অন্যের প্রতি। জ্যেষ্ঠ যিনি তাঁর প্রতি অনুজেরা স্বভাবতই বেশি অনুরক্ত, সেটা বংশের ধারা অনুযায়ী লব্ধ। বাইরে থেকে চাপানো নয়। কাজেই বড়োর প্রতি অনুরাগ চুম্বকপাথরের মতোই আকর্ষিত।

তিন ভাই তিন জায়গায় বিভিন্ন কাজে লিপ্ত। তবে অর্থের দিক থেকে আয়ের পথ সমান নয় কারুরই। বড়ো যিনি সেদিক থেকে অনেক দুর্বল। বলতে গেলে তাঁর সংসার টেনে চলেন ছোট ভাইয়েরা। মাঝে তো বড়োর এমন অবস্থা যে সংসার চালানো তো দূরের কথা, নিজের খরচও চলতে চায় না। মেজ ভাই তখন এসে দাঁড়ান বড়োর সংসারের সব দায়-দায়িত্ব মাথায় নিয়ে। প্রতিমাসে টাকা পাঠান নিজের কর্মস্থল থেকে এবং স্ত্রী কলকাতায় এসে মাসকাবারি বাজারটাও তাঁদের করে দিয়ে যান।

অর্থের অভাব হোলে কী হবে। একপাল পুত্র-সন্তান নিয়ে বিভবশালী তিনি। সংখ্যায় তারা চার। অর্থের অনটনে বড়োজন বিপন্ন হননি সন্তান জন্মদানে, সেখানে তিনি কুলপতিসদৃশ—বংশ বৃদ্ধিতে আস্থাবান। বংশলতা তাই শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত। এদের মানুষ করার দায়িত্বও

ভাগ করে নেন ছোট দুই ভাই, তা না হোলে যে উচ্ছন্নে যাবে সবাই---কুসঙ্গে পড়ে দহনজ্বলনই সৃষ্টি করবে তারা। তখন কুলমর্যাদা হয়ে পড়বে চূর্ণীকৃত। বড় পুত্রটি তাই ছোট ভাইয়ের কাছে থেকেই মানুষ। বাকী কজন মেজ ভাইয়ের ভরসায় মানুষ হবার পথে। এই ব্যবস্থায় বড় ভাই বেশ আরামেই থাকেন, নিজের সংসারের দায়ভার যদি অন্যেরা ভাগ করে নিয়ে তাঁকে যদি চিন্তামুক্ত করে রাখতে পারে, তার চেয়ে সুখকর আর কী হোতে পারে?

এদিকে তিন ভাইয়েরই বয়স বেড়ে চলেছে। মাথা গোঁজার মতো একটা পাকা ছাদ নেই কারুর। ভাড়া-বাড়ীতেই চলছে কাজ। দেশের বাড়ী তো কবেই হাতছাড়া হয়ে গেছে দেশ বিভাগের দরুন। তাই দুই ভাইয়ের---মেজো ও ছোটোর বাসনা হোলো কলকাতার মতো জায়গায় একফালি জমি কিনে তাতে যদি ধীরে ধীরে কয়েকটা ঘর তুলে রাখা যায়, তবে শেষ জীবনে আর এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে হবে না মাথা গোঁজার আশায়।

এসব ভেবেই কলকাতার শহরতলিতে কেনা হোলো পাঁচ কাঠা জমি। এখন অবশ্য আর সেটা শহরতলি নয়। কলকাতার পুরবিভাগের এলাকায় জুড়ে নেওয়া হয়েছে। তখন দামও ছিল কম, তাই দুই ভাই মিলে কিনে ফেল্লেন জমিটা, বড় ভাইয়ের ক্ষমতা নেই এই ব্যাপারে কিছু সাহায্য করার, কারণ নিজের সংসারের ভরণপোষণই তো নির্ভরশীল ভাইদের ওপর। জমি কেনার আর স্বপ্ন দেখবেন কী করে? তাই বড় ভাইকে লজ্জায় ফেলা হোলো না অর্থসাহায্যের কথা টেনে।

তবে দুই ভাইয়ের অগ্রজের প্রতি এতো টান যে জমি কেনার সঙ্গে তাঁকে যুক্ত করে নেওয়া হোলো জমির দলিলে, তাঁরও একটা স্বাক্ষর অঙ্কিত করে যাতে আইনত তিনিও জমির অধিকারী হয়ে থাকেন। ছোটোরা জমি কিনেছে বলে বড়োর মনে যেন কোনো কষ্ট না হয়। বড়োকে বাদ দিয়ে জমির স্বত্ব শুধু দুই ভাইয়ের থাকবে, এটা যেন কেমন বিসদৃশ ঠেক-ছিল তাঁদের। কাজেই তিন ভাইয়েরই দখলিকৃত সম্পত্তি হিসাবে সেই জমি পঞ্জীকৃত হোলো সরকারী দলিলে। তিন ভাইয়ের মধ্যে এরকম প্রীতি ভালোবাসা হৃদয়কে দ্রবীভূত করার মতোই।

এইভাবে জমির মালিকানায় বড় ভাইও একজন অংশীদার হয়ে রইলেন কাগজে-কলমে। বঞ্চিত করা হোলো না তাঁকে এই ব্যাপারে।

ধীরে ধীরে ওই জমিতে যেমন যেমন ভাইয়েরা টাকা পাঠান দুই-একখানা করে ঘর খাড়া হোতে লাগল বড় ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে। দুখানা

ঘর হোতেই সেখানে তিনি নিজের সংসার নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হোয়ে পড়লেন। মিছিমিছি আর ঘর-ভাড়া নিয়ে অন্যত্র থাকা কেন, ছোটোরা তো সব বাইরে।

অন্য দুই ভাই তখনও চাকুরিরত অবস্থায়, তিন বছর বাদে বাদেই হয় তাদের বদলি। কাজেই কলকাতায় এসে স্থায়ীভাবে বাস করার কোনো প্রশ্ন নেই এখন। যতদিন চাকরি, বাইরে বাইরেই কাটাতে হবে তাঁদের। যখন যেমন সুবিধা হয় টাকা পাঠান তাঁরা বাড়ী শেষ করার জন্য। এ-ছাড়াও মেজো ভাই বড়োর সংসারে আর্থিক সাহায্যদান করে চলেন প্রতি-মাসে। ছেলেদের লেখাপড়ার ব্যয়ভারেরও সামাল দেন তিনি। বড় ভাইয়ের আর্থসামর্থ্য নেই বলে তাঁর ছেলেরা লেখাপড়া করবে না এমন কঠোর মনোভাব তাঁর নয়। বরং অত্যধিক নরম ও ভাবপ্রবণ।

এইভাবেই চলছিল বড় ভাইয়ের কলকাতার সংসার ভালোভাবেই। নিশ্চিন্তমনে ঘুরে বেড়ান তিনি পাড়ায় পাড়ায়। এমন সুখের সংসার কজনের ভাগ্যে জোটে? নিজের তো নেই একটা কানাকড়িও, তাঁরজন্য অন্যরা যখন মাথা ঘামিয়ে সব ব্যবস্থা পাকাপাকি করে দিচ্ছে, তখন আর চিন্তা-ভাবনা কীসের? এরকম পরনির্ভরশীলতায় আত্মপ্রসাদী হয়ে থাকা খুব কমই দেখা যায়।

তবুও বড়োর ছোট ভাইদের দোষকথন, তাঁদের নিন্দা ও হিংসা করার শেষ নেই। পাড়াতে প্রচারিতও হয় সেই নিন্দাবাদ। অন্যের অর্থের ওগর যাঁর জীবিকা নির্ভরশীল এবং যাঁর ছেলেরা পরের অন্নে প্রতিপালিত, তাঁর অন্দরে অন্দরে চলছিল একটা কুৎসিত উদ্দেশ্য, কোপনশীলতার একটা বিরাট কর্মকাণ্ড। সেসব ধরা পড়ল বেশ কয়েক বছর বাদে যখন বড়োর নিজের ছেলেরা এক এক করে দাঁড়িয়ে গেল।

মেজজন যখন চাকরি থেকে অবসর নিয়ে কলকাতায় এলেন থাকতে, বড় ভাই ভালো চোখে নিলেন না সেটা। মেজ ভাই যে শেষপর্যন্ত কলকাতাতেই এসে বসবেন, এই বাড়ীর একখানা ঘর নিয়ে, সেটা সহ্য হচ্ছিল না তাঁর। পুরো বাড়ীটাই যিনি নিজের ভোগে লাগিয়েছিলেন এত-দিন, মনে হোলো তিনি যেন একটু পরাজিত, কোণগাদা অবস্থা। যিনি ছিলেন এই বাড়ীর একচ্ছত্র সম্রাটসদৃশ, তিনি যেন মেজোর উপস্থিতিতে শক্তিহীন হয়ে পড়লেন। সামনা-সামনি থেকেও কথা বলেন না তিনি মেজোর সঙ্গে। সারাদিন বাড়ীতে যাঁর ছিল লম্পঝম্প ও আস্ফালন তারমধ্যে সবাই দেখতে পেল হঠাৎ যেন কীরকম সংকোচন, একটু গুটনো ভাব। নিজের ছেলেদের সঙ্গেই চলে দিবারাত্র ফিসফিসানি, মেজোর স্ত্রী কাছে এসে দাঁড়ালেই হয় মুখ বন্ধ।

মেজ ভাইয়ের কাছে কেমন যেন বিসদৃশ ঠেকে বড়োর এই আচরণ। কলকাতার বাড়ীর সাম্রাজ্য নিয়ে বেশ আরামে কাটাচ্ছিলেন তিনি স্ত্রী ও ছেলেদের নিয়ে, সেই বাড়ীতে মেজোর অনুপ্রবেশ সপরিবারে, এতে যে মনের স্থিরাবস্থা বজায় রাখা কঠিন। অথচ মুখে কিছু বলার সাহস নেই তাঁর কারণ বাড়ী-জমির গোটা টাকাটাই তো অন্য ভাইদের। আত্মসংবরণ করে থাকা ছাড়া অন্য উপায় আর কই। এখনও যে সংসার চলে মেজোর দানদাক্ষিণ্যে।

নিজের ছেলেদের মধ্যে মেজটির চাকরি হয়েছে সবে, সেটাও জুটিয়ে দিয়েছেন ভাইয়েরা একে ওকে ধরে। কাজেই মুখে কোনো বিরক্তি প্রকাশ না করলে, ভেতরে ভেতরে গজরানি নিয়েই তিনি নীরবে থাকেন আর পাড়া ঘুরে বেড়ান।

চাকুরিতে থাকাকালীন মেজ ভাই তাঁর বড় দু মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। তৃতীয়টির পড়া শেষ হয়নি তখনও, কলেজ পার হোতে আরো কয়েক বছর। ছাত্রাবস্থায় তখনও সে।

ভাইপোরা কিন্তু কাকা-কাকীমার প্রতি শ্রদ্ধা নিয়েই চলে, তাদের মনে তখনও কোনো বিরূপবৃত্তি ঢোকেনি। তারা জানে কাকা-কাকীমা এই সংসারের হাল টেনে না রাখলে তারা যে ভেসে যেতো একেবারে। একটি ছোট বোন কাছে পেয়ে তার প্রতিও যথেষ্ট অনুরক্ত তারা। কাকীমা-অন্ত প্রাণ তাদের।

নিজেদের মা-ও যে মারা গেছেন অনেকদিন আগে, দুঃখে-শোকে এবং রোগে জর্জরিত হয়ে। তিনি নিজের চোখে দেখে গেছেন দেওর ও দেওর-পত্নীর অকৃত্রিম স্নেহ-ভালোবাসা। তাঁরা না দেখলে যে এই সংসার হয়ে পড়ত অচল। স্বামী তো ছিলেন প্রায় চিরকালই বসা অবস্থায়, অথচ মেজাজটা ছিল রাজাবাদশাহ-এরও বাড়া। তেমনি ছিল রুক্ষ কথাবার্তা, তাই মনঃপীড়া নিয়েই থাকতে হয়েছে সারাটা জীবন। দেওরদের প্রতি ছিল তাই অসীম অনুরাগ।

মেজ ভাই কলকাতাতে আসার পরেই স্বাভাবিকভাবে সংসারের কর্তৃত্ব চলে এলো তাঁর স্ত্রীর ওপরে। এতোদিন যা কিছু রান্নাবান্না করে খাওয়াতেন ছেলেদের, তাদের বাবাই। ছেলেরাও তাই বাপের কথায় উঠত বসত। কাকীমার ওপর সংসারের ভার চলে আসাতে বড় ভাই হয়ে পড়লেন একেবারেই অলস, নিরুদ্যম।

দু-তিন বছর বাদে বড় ভাইয়ের তৃতীয় ছেলেটিও চাকরি পেয়ে গেল কোথাও। কাজেই দুই রোজগেরে ছেলে পেয়ে বড় ভাইয়ের মেজোর প্রতি

আর তেমন নির্ভরশীলতার প্রয়োজন নেই। এখন তাকে তোয়াজ না করলেও চলবে এমন একটি মনোভাব গড়ে উঠল বড়োর মধ্যে। এমনি-তেই তো বড়ো কথাবার্তা বলতেন না মেজ ভাইয়ের সঙ্গে। এড়িয়েই চলতেন বরাবর। যা কিছু কথা হোতো মেজোর স্ত্রীর সঙ্গে। তাও প্রাণ খুলে নয়, একটু দূর দূর ভাব নিয়েই হোতো সেসব কথা। সেটাও প্রয়োজন ছাড়া নয়।

বড় ভাইয়ের ইচ্ছা এবার তিনি মেজ ছেলের বিয়ে দেন। এ-বিষয়ে বাড়ীর কারুরই পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন মনে করলেন না। নিজেই মেয়ে দেখলেন, পছন্দ করলেন। বিয়ের দিন স্থির করার আগে যা একটু কথাবার্তা হোলো অন্যান্যদের সঙ্গে, সেটাও ছিল উত্তাপবিহীন। একটু লোকদেখানি।

কাকীমাই বরণ করে ঘরে তুললেন বউকে। ঘটা করে বিয়ে দেওয়া হোলো ছেলের। আত্মীয়-কুটুম্ব সবাই উপস্থিত বিয়ে উপলক্ষে। ছোটো কাকা ও ছোটো কাকীমাও এসেছেন এই বিয়েতে। তাঁরা তখন থাকেন রাঁচিতে, ওখানেই একটা ফ্ল্যাট কিনে স্থায়ীভাবে রয়েছেন। চাকুরির মেয়াদও ওখান থেকেই ফুরোবে।

বিয়ের কটা দিন বেশ আনন্দ-উৎসবে কেটে গেল সবার। কিন্তু একটি বছর যেতে না যেতেই বিরূপ মূর্তি ধারণ করলেন বড় ভাই। এখন তো বাড়ীতে একটি বউ এসেছে, কাজেই মেজ ভাইয়ের স্ত্রীর কর্তৃত্বের একটু হ্রাস হওয়া দরকার। কু-পরামর্শে নতুন বউয়ের মনটাকে করে তুললেন কলুষিত, সংসারের কাজে যেটুকু বা নতুন বউ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসত প্রথম প্রথম, তা থেকে করা হোলো সংস্রবহীন। যে-বউ মুখ তুলে খুড়ী-শ্বাশুড়ীর সঙ্গে কথা বলতেও লজ্জা পেত সে হয়ে পড়ল উদ্ধতভাষিণী। সব কাজ থেকেই ভাসুর করে তুললেন নিজের বৌমাটিকে প্রতিনিবৃত্ত। খুড়ীর কাছে যেন যেতে না হয় কোনো কিছু অনুমতি নিতে, স্বাধীনভাবেই থাকবে সে এখন থেকে।

এসব যাতে সুপরিকল্পিতভাবে হোতে পারে, সেজন্য সবচেয়ে আগে দরকার ভাঁড়ারের দখল নেওয়া যাতে বউমা কাজ করতে পারে নিজের খেয়ালখুশি মাফিক। আগে যেসব কাজ ভাসুর নিজে মেজ ভাইয়ের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা না করে করতে সাহস করতেন না, এখন সেসবের প্রয়োজন নেই মনে করে তাঁকে তাচ্ছিল্য করেই শুরু করলেন সব কাজ নিজের পুত্রবধূটিকে জিজ্ঞাসা করে।

তখন থেকেই শুরু হোলো ঐকতানের অভাব, ভাঙ্গনের নিম্নদিকের

প্রবল স্রোত। উজানের বিপরীতে চলতে হোলে যে অশ্বশক্তির প্রয়োজন সেটার যোগান দিতে শুরু করল চাকুরে দুই ছেলেরা। টাকার জন্য তো ভাবনা নেই এখন আর কোনো, কাজেই নির্ভরশীলতাও নেই। এখন যে-কোনো সামান্য অছিলা করে একটা ভাগ-বাটোয়ারার প্রশ্ন ওঠানো দরকার। কিন্তু তার ভাগফলটা যে দাঁড়াবে শূন্য সেই চালটাতে রয়ে গিয়েছিল কিছু ত্রুটি। তাই ভাগীর কপালে দুঃখ বই সুখের সৃষ্টি হোতে পারেনি।

বড় ভাই মেজ ছেলেকে বিয়ে দেবার পর জায়গা নিয়ে হোলো একটা সমস্যা। তিন ভাইয়ের তিনটি ঘর তো ছকে বাঁধা রয়েছে প্ল্যানে, সেখানে তো বিপরীত কিছু করার উপায় নেই। একটা মোটে ড্রয়িং-রুম বাড়ীতে তাতে তিন ভাইয়ের দখল সমান। ছেলের জন্য আলাদা ঘর কী করে হোতে পারে এই অবস্থায়? সেটার অবশ্য সলাপরামর্শ করে একটা ব্যবস্থা করা যেতে পারত। কিন্তু সে পথে না গিয়ে বড় ভাই সমস্যাটাকে করে তুললেন জটিল সবার সঙ্গে অসহযোগিতার সৃষ্টি করে। একের সঙ্গে অন্যের বিরোধ তুলে।

সামনা-সামনি হোলেই চলে, বড় ভাই ও অন্যান্যদের মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। একটা চাপা আক্রোশ-আক্ষেপ আকুলি-বিকুলি করে মনের ভেতর অথচ মীমাংসার খোঁজে মুখ ফুটে বলার কোনো সৎসাহস নেই। শুধু ক্রোধ অভিসম্পাত ফুলে ওঠে হৃদয়ে। মেজ ভাই, তাঁর স্ত্রী ও মেয়ে সবাই এখন তুচ্ছতাচ্ছিল্যের কুটোকাটার মতো। বড় ভাই কুপিত হয়ে থাকেন সব-সময় তাঁদের ওপর। নিজের ছেলেদেরও করে তুলছেন তদনুরূপ বিদ্রোহী। এখন তারাও মুখ বেঁকিয়ে কথা বলতে সাহস পায়।

আখেরে একদিন দেখা গেল বড় ভাই নিজের সংসারটুকু নিয়ে অন্য কোথাও এ বাড়ীর কাছাকাছি বসবাসের ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। ঘরে অন্য যাঁরা রয়েছেন তাঁদের সঙ্গে এ নিয়ে কোনো কথা বলারও প্রয়োজন মনে করলেন না। দুটি ঘরে তালা দিয়ে তাঁরা অন্য বাড়ীতে চলে গেলেন, ড্রয়িং-রুমটা সম্পূর্ণভাবে নিজের দখলে রেখে। কোথায় গেলেন সেটা জানা গেল পাড়াপড়শীদের কাছে।

সেই থেকেই একটা প্রচণ্ড ঝড়ের সংকেত সূচিত হোলো। মাঝে মাঝেই বড় ভাই আসেন এ বাড়ীতে, তালা খোলেন বাইরে থেকে, সঙ্গে কিছু-কিছু জিনিস নিয়ে যান রিক্সায় চাপিয়ে। আবার তালাবন্ধ ঘর।

মেজ ভাই মেনে নিলেন এটা। তবুও এই ব্যবস্থা ভালো। সামনা-সামনি থেকে এক জায়গায় বাস করে একটা অগ্নিগর্ভ অবস্থার মধ্যে থাকা খুবই কষ্টদায়ক। পদে পদে সকলের অসম্মানের ব্যবহার সহ্যের

বাইরে চলে যাচ্ছিল। কয়েক বছর আগ-পর্যন্ত যাঁদের অন্নসমস্যার প্রশ্ন মেটাতে হয়েছে, অর্থসাহায্য না পেলে জীবনযাত্রা নির্বাহ ছিল কঠিন, আজ কিনা টাকার মুখ দেখে ঘর ছেড়ে চলে গিয়ে, আলাদা থাকার ব্যবস্থা করে একটা উচিত শিক্ষাই দিয়ে গেল প্রতিদানে। এমন কৃতঘ্নও হোতে পারে মানুষ, হিতকারীর প্রতি এমন জঘন্য আচরণ ভাবা যায় কখনও? এ যে জীবনধারককে ছিন্নপক্ষ করে দেওয়ার সামিল।

এরপর একদিন সন্ধ্যার পর দেখা গেল এঁদের অনুপস্থিতিতে বাথরুম দুটিতে তালা ঝুলিয়ে রেখে গেছে বড় ভাইয়ের দুটি ছেলে। এক মহাসমস্যার সৃষ্টি হোলো এ নিয়ে, এ যেন ইচ্ছাকৃতভাবেই অন্যকে কুপিত করে রণস্থলে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো আহবান, কোনোরকম বিপরীত পরিণামের চিন্তা না করে।

বাড়ীতে জল পায়খানা বন্ধ করে দেওয়া মানে যে অশালীনতার চরম ব্যবস্থা এবং এ নিয়ে যে থানা-পুলিশও হোতে পারে, সেটা বোধহয় তাদের উর্বর মস্তিষ্কে প্রবেশ করেনি। বাপের উস্কানিতে সায় দিয়ে এঁদের ওপর যেভাবেই হোক অত্যাচার উৎপাত চালিয়ে যাওয়াটাই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য যাতে এঁরা অত্যাচারিত হোয়ে উৎখাত হোতে পারে এখান থেকে। এ ভিটে যে তিনজনের, শুধু মেজ ভাইয়ের ভোগে লাগবে কেন, এটাই হোলো ক্রোধের কারণ।

পরে অবশ্য মাথায় ঢুকেছিল ভাইপোদের যে জল বাথরুম বন্ধ করে দেওয়ার ফলস্বরূপ কয়েকদিন তাদের হাজতবাসও হোতে পারে আইন অনুযায়ী। তাই কয়েক ঘন্টা পরে রাত দশটা নাগাদ এসে খুলে দিয়েছিল বাথরুম।

এরপর থেকে শুরু হোলো আবার অন্যধরনের উৎপাত, ভীতিপ্রদ লাঞ্ছনা, পাড়ার ছেলেছোকরাদের নিয়ে, যারা একাজে অভ্যস্ত। রাত একটু বাড়লেই চতুর্দিক থেকে শুরু হয় ইট-পাথরের বর্ষণ। ছাদের ওপর যখন বড় বড় ইটের টুকরোগুলো ঘন ঘন পড়তে থাকে, তখন মনে হয় ছাদ বুঝি ফুটো হয়ে গেল। কী তার দুমদাম আওয়াজ, মনে হয় কারা যেন দুরমুশ নিয়ে পিটিয়ে চলেছে গোটা ছাদটাই। ভয়ে বিমূঢ় হোয়ে থাকে ঘরের অন্দরে যারা শুয়ে। এইভাবে ঘন্টাখানেক চলে ইট-পাথর ছোড়ার উৎপাত। কোনো কোনো দিন মল নিষ্ঠীবন কত কী নোংরা আবর্জনা ফেলে রেখে যায় বাইরের বারান্দায়।

হঠাৎ একদিন রাত্রে যখন এসব কাণ্ডকারখানা চলছিল ছোটো ভাই এসে উপস্থিত বাইরে থেকে। ইটের বর্ষণ তখন শুরু হয়ে গেছে—রাত দশটা থেকে ঘড়ি ধরে শুরু হয় এই কারবার রোজ। এই ভাইও পেল না সেদিন কোনো নিস্তার। দরজা খুলে বাইরে গিয়ে ছেলেদের ধমকাতে গিয়ে মাথায় লাগল একটা ইটের চোট।

ভাই তো প্রমাদ গুণল, রাগে দুঃখে সেই রক্তাক্ত শরীরে দৌড়ে গেল থানাতে ডায়েরি করতে।

কিছুক্ষণ পরেই পুলিশ এসে হাজির ভ্যান নিয়ে। কারা কারা এই ব্যাপারে লিপ্ত তাদের একটা লিস্ট্ নিয়ে গেল এসে। ধমকে এলো বাড়ীতে গিয়ে যদি এর পরেও এসব কাণ্ড ঘটে তাহলে সবাইকে হাজতে পুরে দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় নেই। সেই থেকে ভয় পেয়ে কিছুদিন এই অত্যাচার বন্ধ হোলো।

তবুও নিশ্চিন্তি নেই একেবারে। কয়েকদিন পরে আসে অন্য এক নতুন উৎপাত ভিন্ন প্রকৃতি নিয়ে। রাত্রে জানালা খুলে ঘরের ভেতর নির্ভয়ে শুয়ে থাকতেও যে ছমছম করে সবার শরীর। এই বুঝি আবার কোনো অত্যাচার তেজালো হয়ে আসবে রাতের অন্ধকারে। বাপের আস্কারা পেয়ে ভাইপোর দলের আবার কোন নতুন উৎপীড়ন সইতে হবে, এবাড়ী সম্পূর্ণ-ভাবে তাদের দখল না হওয়া পর্যন্ত। একমাত্র এই উদ্দেশ্য নিয়েই প্রতিদিন না হোক, মাঝে মাঝে দলবল নিয়ে আসে ধমক-ধামক দিতে। এইসব অতিবাড় উপদ্রবে কেউ ঘুমোতে পারে না রাত্রিতে। মেয়েটাতো ভয়ে মাকে জড়িয়ে শুয়ে থাকে কান খাড়া করে। ভোর হোলে তবে একটা নিশ্চিন্তির নিঃশ্বাস ফেলে। আর সন্ধ্যা হোলেই আসে ভয়ের বিহ্বলতা।

একদিন রাত্রে এলো পাড়ার গুটিকয়েক ষণ্ডামার্কা ছেলেদের নিয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা করার জন্য একটা বিরাট দল, সঙ্গে ভাইপোরা। ক্রমাগত লাথি চলছে ঘরের দরজার ওপর। গালিগালাজেরও অন্ত নেই। হিন্দী ভাষায় বাছাবাছা দুর্বাক্য সব, কর্ণকুহরে কাটাকাটা মনে হবে সেসব। ভদ্রঘরের ছেলেরা আউড়ে চলেছে গলা ফাটিয়ে। কোনো লজ্জাসরমের ধার ধারে না তারা—ভাইপোরা তাদের নিয়ে এসেছে এইসব ইতরামি প্রদর্শনের জন্য, পরিবর্তে কিছু নেশার বস্তু পাওয়ার লোভ দেখিয়ে।

এদিকে ঘরের ভেতর ভয়ে জড়সড় হয়ে রয়েছে তিনটি প্রাণী—ভাইপো-দের কাকা-কাকীমা ও ছোটো বোনটি। কী হবে কে জানে আজ রাতের অন্ধকারে। ভাবেন তাঁরা, দুধকলা দিয়েই হয়ত পুষেছিলেন এইসব ধুরন্ধর ভাইপোদের, বড় হয়ে কাকার শরীরে মাথায় বিষকামড় দেবে বলেই।

জুলুমবাজদের কারু কারুর মুখ দিয়ে আবার জোর-জবর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে দরজায় লাথি মারতে মারতে---বের করে দিন মেয়েকে আমাদের কাছে, তা না হোলে কবাট ভেঙ্গে ঢুকবো আমরা জোর করে টেনে আনতে। ভালো চান তো মেয়েকে দিয়ে দিন আমাদের হাতে।

দরজায় কয়েক জোড়া লাথি পড়ার বিরাম নেই। জুলুমেরও একটা সীমা আছে---অশ্লীলতাও যে একদিন শীলতা নিয়ে আসে। এ যে নিজের বোনকে চাইছে ভাইপোরা দাঙ্গাবাজদের সঙ্গে মিলিত স্বরে, যা কিছু করবে বলে। কত বড় পাষণ্ড হোলে তবে মুখে আসে এসব কথা। মুখ যে ওদের পক্ষাঘাতে শীতল হবে একদিন। কত বড় আস্পর্দ্ধা নিজের ভগিনীকে চায় বাইরে বের করে দিতে। এর চেয়ে জঘন্য কদর্য উচ্চারণ আর কী হোতে পারে? উন্মাদের মুখ দিয়েও বোধহয় এসব কথা বেরোয় না।

আর যে নীরবে ঘরে ভয়ে ভীত হয়ে বসে থাকার উপায় নেই। ক্রমাগত লাথি পড়েই চলেছে দরজার ওপর, প্রচণ্ড রোষের তাণ্ডব চলেছে বাইরে। এই বুঝি কবাট ভেঙ্গে ঢুকে পড়বে পাষণ্ডের দল।

হঠাৎ যেন পাগলের মতো উন্মত্ত হয়ে, খাটের তলা থেকে বড় একটা কাটারি বের করে হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলেন কাকীমা। অন্ধকারেও চকচক করছে সেই ধারালো কাটারি।

মুখে চীৎকার। কে যেন ঢেলে দিয়েছে শরীরে প্রচণ্ড শক্তি। কোথায় গেল সেই বেহায়া পাষণ্ড ভাইপোরা, আজ কুচিয়ে তাদের মেরে তবে হব আমি শান্ত।

সামনের একটি ছেলেকে তার জামার কলার ধরে টেনে, তাতানো গলায় আবার সেই চীৎকার, আয় তোরা যারা ধামা ধরে, আমার দুয়োরে তাণ্ডবনৃত্য করতে এসেছিস ওই সর্বনেশে ভাইপোদের দালাল সেজে, এক একটা করে ধড় তোদের নামিয়ে তবে হবে আমার নিস্তার। এত বড় স্পর্দ্ধা তোদের? আইনের ধার আমি ধারি না, কয়েকটার গলা কেটে তবে হবে তোদের পাপের প্রায়শ্চিত্তি।

মহূর্তের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে গেল সব, কাকীমার সেই চীৎকার ও ভয়ংকরী রূপ দেখে। নীরবে সরে গেল তারা রাতের অন্ধকারে, মাঠের ভেতর দিয়ে কোথায়, বোঝা গেল না। দাঙ্গাকারী ভাইপোরা কোনো গাছের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে ছিল কিনা, দেখা গেল না গহন অন্ধকারে।

হাঙ্গামাকারীরা সরে যাওয়ার পর কাকীমা ফিরে এলেন ঘরে। রাগে উত্তেজনায় সমস্ত শরীর কাঁপছে তাঁর। তাঁকে সামাল দেবার জন্য তখন

ছোটাছুটি চলছে ঘরের ভেতর চোখে মুখে জল দেবার ব্যস্ততায়। তাঁকে যে শান্ত করতে হবে এখন।

আবার ভোর হোলো। মাঠের পুবকোণ থেকে সূর্যের ছটা নারকেল গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে জানালা গলিয়ে ঘরের ভেতর এসে পড়েছে।

কাকীমা তখনও প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় শুয়ে কাতরভাবে; মুখে-চোখে একটা ক্লান্তির ছায়া। ফর্সা ধবধবে মুখটা কেমন যেন ফেকাসে। লক্ষ্মীমন্তী মায়ের দিকে মেয়ে চেয়ে রয়েছে সজল চোখে। কী পাপটাই না করেছিলে তোমার ভাসুর-ভাইপোদের খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করে। তাই তো তোমাকে এখন কত দুঃখ-গ্লানি সহ্য করতে হচ্ছে, মা।

তারপর বাবার দিকে চেয়ে মেয়ে বলে, চলো ছেড়ে যাই বাবা আমরা এবাড়ী, অন্য কোথাও। থাকুক গে এই বাড়ী ওদের ভোগেই। প্রাণ-অন্ত বড় ভাইয়ের জন্য যেমন দেখিয়েছিলে নিজেদের দরদ তাঁকে জমির স্বত্বের একজন অংশীদার করে, তাই তো ভুগতে হচ্ছে তোমাকে এইভাবে। আর কেন যথেষ্ট করেছিলে ত্যাগস্বীকার, এইবার ত্যাগ করে চলো এই বাড়ীও। নাই-বা রাখলে কোনো দাবী?

এসব কথা মেয়ে বলে আর কাঁদতে থাকে। বাপের চোখেও যে জল ভরে আসে তখন। কুচুটে বুদ্ধি যে ছিল না কখনো নিজের। অক্ষম বড় ভাইয়ের সংসার নিজের ভেবেই তো সব দায়িত্ব নিয়েছিলেন মাথায়। এখন তারাই তাঁর মাথা ভাঙ্গতে উদ্যত। এ যে স্বপ্নেও ভাবেননি তিনি।

এসব ঘটনার কিছুদিন পরেই কানে এলো বড় ভাই এখন একটা কঠিন রোগে আক্রান্ত। মুক্তি নেই সেই রোগ থেকে সহজে। আছড়ে আছড়ে মারে যে সেই রোগ, দংশন করে সেই ঘা কুটকুট করে পিপীলিকার কামড়ানোর মতো। পরিত্রাণ নেই জ্বালাযন্ত্রণা থেকে।

বিষয় ভোগাপ্তির শেষ হোলো একদিন এই বাড়ী বিক্রী করে দিয়ে। বড় ভাইয়ের কথা বলারও শক্তি নেই আর, ফিসফিস করে কিছু আওয়াজ বেরোয় শুধু কথা উচ্চারণ করতে গিয়ে। পুরো কন্ঠটাতেই যে রোগ বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। যে-কন্ঠ এতদিন অসম্বদ্ধ প্রলাপী ছিল, সেটা যে সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধপ্রাপ্ত। তাল ঠুকে যে-বিষনখ দিয়ে আঁচড়-কামড় দিয়ে চলেছিলেন এতদিন, সেই হাতও যে এখন অনড় হয়ে গেছে। অপ্রিয় বাক্যের উচ্চারণও হোতে পারছে না আর।

একদিন উনি এলেন কাঁপতে কাঁপতে রিক্সায় চেপে এই বাড়ীতে মেজ ভাইয়ের স্ত্রীর কাছে। মেজোর কাছে সামনে এসে দাঁড়ানোরও যে নেই সেই সাহস। এসেছেন ক্ষমাভিক্ষা চাইতে সবার কাছে। যেসব কাণ্ড হয়ে গেছে তারজন্য এখন তিনি অনুতপ্ত। সেই অনুশোচনার দহন, যে-রোগে উনি ক্লিষ্ট এখন, তার চেয়েও যে বেশী দগ্ধকারী। যাদের জন্য এই দ্বন্দ্বের চাতুর্য তিনি সৃষ্টি করেছিলেন, সেই নিজের ছেলেরাও তাঁকে একঘরে করে দিয়েছে। সেখানেও পাচ্ছেন না কোনো শান্তি।

ক্ষমাভিক্ষা চাইলেই ক্ষমা পাওয়া যায় না, তারও যোগ্যতার একটা মাপকাঠি আছে। কুটিলতায় ভরা যাঁর মনটাই, প্রকৃতিটাই যাঁর কুৎসিত, যে-কোনো পদক্ষেপেই যার কু-অভিপ্রায়ে ব্যাপ্ত, তাঁকে ঈশ্বরও ক্ষমা করেন কিনা সন্দেহ।

নিজের ভাইকেও যে এসব আঘাত দংশন কুরিয়ে কুরিয়ে ঝরঝরে করে ফেলেছে। যে-মানুষটি ছিলেন নীচতা থেকে অনেক ঊর্ধ্বে, দূর-বিসারী ছিল যাঁর মায়ামমতা, সহনশীলতা ও ক্ষমাগুণেই ছিল যাঁর সদবৃত্তির প্রকাশ, বড় ভাইয়ের ক্রোধকটাক্ষ ও দুষ্প্রবৃত্তি যে তাঁর কোমলচিত্তকে দিয়েছে ভেঙ্গে। এখন কার কতটুকু লাভক্ষতি, এ নিয়ে বিচারের কোনো প্রয়োজন নেই তাঁর।

বাড়ী-বিক্রীর লব্ধ অর্থের অংশ হাতে পেয়ে বড় ভাই তাঁর ছেলেদের হাতে তুলে দিলেন সেটা। মনে হোলো বিরাট যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন সেই জয়রত্ন হাতে পেয়ে।

দুদিন পরেই কিন্তু মারা গেলেন তিনি। ভোগে এলো না কিছুই, শুধু আত্মবাসনাই পূর্ণ হোলো। পরের জিনিস আত্মসাৎ করে হোলেন একীভূত। পরম তৃপ্ত।

ভাঁড়ামির মধ্যে যেমন একটা প্রবঞ্চনা ও লোক-ঠকানোর ভাব বিদ্যমান, তেমনি তার ভেতর দেখতে পাওয়া যাবে একটা আমিত্ববোধ। নিজের ভেতর কী আছে, সেটা বিশেষরূপে না জেনেই, অহংকারটা ফুটে ওঠে কখনো কখনো কারুর মধ্যে।

কাঁথা বুনতে বুনতে সেইসব চেনা চরিত্রগুলোকে মনে পড়ে যাচ্ছে, যারা বিচিত্র ও নানাবর্ণের ঘটনার সঙ্গে জড়িত। শুধু সাদা সুতোয় তাদের ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করছি। বেশি রঙচঙে করে তোলার প্রয়োজন নেই এদের, কারণ সমাজে এধরনের মানুষ যত কম থাকে ততই মঙ্গল।

ভাগের মা গঙ্গা পায় না, বলে একটা কথা আছে। সেখানে সেই মায়ের যদি চার জোড়ার বেশি ছেলেমেয়ে থাকে এবং সবাই যদি শুধু

সক্ষম-সবল নয়, অর্থক্ষমতাতেও বলবান হয়, তবে সেই মায়ের অবস্থা কী দাঁড়াতে পারে, সেটা সহজেই অনুমেয়। সবাই যে আপন আপন ক্ষেত্রে বড়, কেউ কারুর ওপর নির্ভরশীল নয়। নিজস্ব বুদ্ধিবিবেচনায়ও কম নয় কেউ।

এসবই হয়ে পড়ে তখন একটা বড় সমস্যা। তার চেয়েও দুরূহ ব্যাপার হোলো কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। বিশ্বাসহীনতার দরুন একে অপরের সঙ্গে অসংযুক্ত। তবে সবাই বিষয়াসক্ত, সেদিকে কেউ কারুর চেয়ে কম নয়। অনুচিত অনেক কাজই তারা করে ফেলে, তাতে অন্যায়ের বিবেকদংশন বলে তাদের কিছু নেই। সেদিক থেকে তারা পুরোমাত্রায় বস্তুতান্ত্রিক—সমস্ত জগত অচেতন, এই মতে বিশ্বাসী নয় তারা।

ছেলে বড়, তাই মায়ের দায়িত্ব নেবার অধিকার তার, এবিষয়ে অন্য সন্তানদের দ্বিমত নেই। তবে বাপের ভাগ হওয়া সম্ভব নয় তখন, কারণ তাঁর বয়স হওয়া সত্ত্বেও তিনি তখনও সক্ষম, আর্থিক ক্ষমতায় বলবান, রুজিরোজগারের পথ উন্মুক্ত।

এই কারণেই তিনি নমস্য ব্যক্তি সকলেরই। কারুর ঘাড়ে পড়লে তখন হোতো অপ্রসন্ন, বিরক্ত। কতক্ষণে তাঁকে ঘাড় থেকে নামিয়ে অন্যের কাঁধে চাপানো যায়, সেটাই হোতো তখন একমাত্র চিন্তার বিষয়। তখন বাপকে খেদানোর জন্য এক একজনের আবিষ্কৃত হোতো নতুন নতুন চাল ও সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা।

বড় ছেলের অবস্থা ভালো। ব্যবসা করে দু-পয়সা তার হাতে এসেছে, তাই চালচলনেও একটু মাথা উঁচু, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তবে ব্যবসাটাকে দাঁড় করেছে সে এবং তা থেকে ভালো রোজগার। স্বভাবতই মাথা ঠাণ্ডা রাখা কঠিন। যৌথ সংসারে তাই হিসেব করে চলে অর্থসাহায্য। না দিতে পারলেই বেশি ভালো কারণ বাপ তো যেমন করেই হোক চালিয়ে যাচ্ছেন বড় সংসার। সেখানে কে কত দিল তার হিসেব তিনি রাখেন না। পেলে ক্ষতি নেই, না পেলেও মাথা-খারাপ করেন না উনি।

বড় ছেলে কিন্তু অর্থের দিক থেকে খুবই পাকাপোক্ত মানুষ। হিসেবের এক পয়সাও ভুল হবার উপায় নেই। বেহিসেবী কোনো খরচ সহ্যের বাইরে তার। সাপটে চলে সব কিছু। কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে হৃদয় যেন ঝরে পড়ে। খেতে বসে পাঁচরকম ব্যঞ্জন চাই তার। মাছের বড় দুটো টুকরো বাটিতে সাজানো না দেখলে, মেজাজটা একটু অশান্ত হয়ে পড়ে। তাই মা অন্যকে বঞ্চিত করে বা নিজের ভাগটাই দিয়ে দেন ছেলের পাতে। অপ্রসন্ন করতে চান না তিনি তাকে। এ নিয়ে হয়ত ফাটাফাটি

করে বাড়ী মাত করবে কিংবা ভাতের থালাটাই দেবে ছুড়ে ফেলে। যা বদমেজাজী ছেলে, অশ্লীল কথাও মুখে আটকাবে না তখন। বড়জনকে শান্ত রাখাই ভালো, বাকীরা তেমন নয়। মায়াবোধ তাদের আছে।

কয়েক বছর ধরেই বড় ছেলের মনে একটা শঙ্কা সংশয়ী করে চলেছিল ভীষণভাবে। বাপ চলে গেলে এই বিরাট সংসারের বোঝাটাই যে এসে পড়বে তার মাথায়। কী ভাবে সেটা এড়ানো যায় তা নিয়ে চলে মনের ভেতর অশান্ত ঝড়। বেচাল কয়েকটা কথাও যে কখনো কখনো মুখ থেকে বেরিয়ে আসে না, এমন নয়। সবাই একটু বিস্মিত হয়ে পড়ে তাতে। পেটের কথা যে বেরিয়ে আসতে চায় দাদার।

মনে মনে বড় ছেলে একটা মতলব আঁটে নিজের একটা বাড়ী তৈরী করার, তাতে কপট উদ্দেশ্যের স্পষ্টরূপ ফুটে ওঠে না। বাড়ী করাটা কোনো অপরাধ নয়, যে-বাড়ীতে তারা রয়েছে সেটা ভাড়া-বাড়ী। কাজেই একাজে সবার সমর্থন, উৎসাহ আশা করে সে।

বড় ছেলের ব্যবসার টাকা জমে উঠেছিল ভালোই। সুতরাং সেই টাকায় সে বাড়ী করে নিল একই শহরে। বাড়ী তৈরী করার পর উঠে এলো নিজের পরিবার, পুত্র ও কন্যাদের নিয়ে। নতুন বাড়ীতে পিতৃচালিত যৌথ সংসারের অন্য কেউ এসে আবাসিত হোক সেটা মনের মধ্যে একবারও আনা হোলো না। লোকলজ্জার ভয়ে একটু আওড়ালো শুধু, তোমরা ইচ্ছে করলে আমার এখানে সবাই এসে থাকতে পারো।

হৃদয়ের কথা নয় যে সেটা—এটা বুঝতে কারুরই ভুল হোলো না একটুও। তাই বড় ছেলের এই বাড়ী থেকে নীরবে নিভৃতেই হোলো নিগড় ছেড়ে সরে পড়াটা। এই চাল কারুর কাছে চাপা থাকল না। যথা-নিয়মেই এরপর চলল ভিন্ন দুটি সংসারের অতিবাহন, কোনোরকম কারুর প্রতি আক্রোশ না রেখেই। দু-বাড়ীর মানুষই আসা-যাওয়া করে এবাড়ী ওবাড়ী, তাতে কোনো সংকোচের সমস্যা খাড়া হয় না।

কিন্তু তা সত্ত্বেও বড় ছেলের মনে যে রয়ে গেছে একটা খোঁচ নিজের বাড়ীতে কাউকে আশ্রয় না দেওয়া নিয়ে। দাদা হয়ে কোনো কর্তব্যই সে যে পালন করেনি। অন্তরে সেই কাঁটাটা মাঝে মাঝে দংশায় তাকে ভীষণ রকম। পাড়াপড়শীরা ও অন্যান্য আত্মীয়েরাও যে একটু সমা-লোচনা করে চলেছে তার এ নিয়ে। নিজের বাড়ীতে ভাইবোন তো দূরের কথা, বাপকেও ঠাঁই দিল না সে। নিজের পেটে যিনি ধারণ করেছিলেন এই ছেলেকে সেই মা-কেও দিতে পারল না নতুন বাড়ীতে এনে একটু সুখের পরশ। কী রকম স্বার্থান্ধ হীনচেতা ছেলে হোতে পারে এ থেকেই বোঝা

যায়। বাইরের তীব্র কটু সমালোচনার উত্তাপ শরীরে যে জ্বালার সৃষ্টিতে উদ্যত। তাই মনটা কী রকম চঞ্চল হয়ে ওঠে ছেলের।

একদিন আক্ষেপিত অবস্থাতেই ছেলে এলো পুরনো বাড়ীতে সবাইকে নিয়ে যাবার জন্য। গা করল না কেউ সেটাতে। নতুন বাড়ীতে সজ্জিত হোয়ে থাকতে চায় না কেউ মানসম্ভ্রম খুইয়ে। পুরনো বাড়ীই তাদের অনেক ভালো যেখানে সুখে-দুখে এক হয়ে রয়েছে সবাই চিরকাল হাসিকান্না নিয়ে। প্রয়োজন নেই দাদার বাড়ীতে গিয়ে কাঁটা হয়ে থাকার।

দাদা নিরাশ হয়ে ফিরে এলো। অন্তরের স্বরূপ তো অনেক আগেই প্রকাশিত হয়ে পড়েছে—অর্থপরায়ণতাই যে একমাত্র অবলম্বনীয় বস্তু তাঁর। হৃদয় যে একেবারেই অন্তঃসারশূন্য। সেখানে কী করে অন্য হৃদয়ের স্পর্শ লাগতে পারে?

বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হোলো এইভাবে। মনে শান্তি নেই দাদার। মা'কেও যদি বুঝিয়ে-সুজিয়ে নিয়ে এসে ফেলা যায় এখানে তাহলেও শান্ত হোতে পারে চিত্তের অস্থিরতা। বড়োর কর্তব্যবোধ যে হার মেনে গেছে হীন স্বার্থপরতার কাছে। অভাব তো কোনো নেই এই সংসারে, প্রাচুর্যে ভরা সব কিছুই। অভাব শুধু হৃদয়বোধের, মানবিকতার স্পর্শগুণের।

মা'কে ছেলে নিয়ে এলো এই বাড়ীতে শেষ পর্যন্ত অনেক আকুতি-মিনতি করে নতুন আলোর ঔজ্জ্বল্য দেখাতে। বড় ছেলের কথার যুক্তি তো অকাট্য, এ বাড়ীতে যে তাঁর নাতিনাতনিরা রয়েছে তাদের প্রতিও তো পিতামহীর স্নেহবর্ষণ প্রয়োজন। তারাও তো চায় ঠাকুর-মা'কে কাছে পেতে।

এসব কথা শুনে মায়ের প্রাণে এলো একটু মমতা, ছেলের কাতর নিবেদনে একটু দ্রব হোলো মন। নিজের ছেলের কাছেই তো থাকবেন নাতিনাতনিদের নিয়ে, সেখানে দ্বিধার অবকাশ কোথায়? নাইবা বলেছিল প্রথম দিকে তাঁকে নতুন বাড়ীতে যেতে, এখন তো সে অনুতপ্ত। নিয়ে যাওয়ার জন্য পাগল। নিজের ভুল বুঝতে পেরে এখন যে আকুতি-বিকুতিতে ঝরে পড়ছে কোমলতা। সেই কাতরস্পর্শে মা শেষ পর্যন্ত চলে এলেন বড় ছেলের কাছে বিছানা-বাক্স নিয়ে।

বেশ আরামে কদিন কাটালেন তিনি এ বাড়ীতে। রোজ সকালে মা'কে জিজ্ঞাসা করে ছেলে, রাত্রে ঘুম ভালো হয়েছিল তো মা? আজ কী খাবে বল, নতুন কিছু?

মায়ের বুক আনন্দে ফুলে ওঠে ছেলের এসব কথায়। বুক-ভাঙ্গা অবস্থায় যে-ভাবে ছিলেন পুরনো বাড়ীতে ছেলের বিপক্ষতায় ও অসদ্ব্যবহারে, ন্যায়-অন্যায় ও ধর্মাধর্ম বিচারের বিমুখতায়, এখন তো দেখছি ছেলের বুকজোড়া আদরের ঠেলায় হৃদয় আপ্লুত হবার মতো। ছেলের ভিতর যে সুষমতা আছে, সেইরূপ তো কখনো চোখে পড়েনি ওবাড়ীতে থাকতে। তবে হঠাৎ এই রূপান্তর হোলো কী করে? আত্মীয় অনুজ-অনুজাদের ছেড়ে এসে বোধহয় সেই সংকীর্ণচেতা মনটা একটু প্রশস্ত হোতে চাইছে উদারতার গুণস্পর্শে।

এসবের ভালোমন্দ লক্ষণ তিনি ধরতে পারলেন না ঠিকমত, সেটা হয়ত মাতৃকরুণায় বশবর্তী হওয়ার দরুন।

মায়ের এই কোমল অবস্থায় ছেলে একদিন দাবী করে বসল, মা, তুমি কিন্তু আর ওবাড়ীতে যাবে না। শুধু আমার কাছেই থাকবে। কেমন? মনে থাকে যেন। ওবাড়ীতে পা দিতেও যাবে না।

মায়ের মনে হোলো তখন এ যে একটা অদ্ভুত দাবি। কোনো মা কী পারে কখনো সব ছেলেমেয়ে ছেড়েছুড়ে একজনকে নিয়ে এখানে শুধু ঠুঁটো হয়ে থাকা? কেন তাদের কী অপরাধে বর্জন করবেন তিনি? ছেলের এই আবদারই বা কী কারণে? সম্ভ্রমের প্রশ্নই বা শুধু মা'কে নিয়ে আসে কোত্থেকে? মা যে সবারই মা, মায়াডোর যে সবার সঙ্গেই বাঁধা, শুধু একজনাতে স্নেহ আবিষ্ট রাখা সম্ভব নয়। মা যে শুধু বড় ছেলের কাছেই থাকবে, এ চাপ আসবে কেন ছেলের কাছ থেকে? বৃদ্ধ স্বামীও যে পুরনো বাড়ীতে, তাঁকেই বা কতদিন একা ফেলে এসে থাকা যায়। মায়ের প্রাণ যে ছটফট করে অন্যান্য ছেলেমেয়েদের জন্য। এই বন্দী-দশা যে আর ভালো লাগে না। এমন করে তো মা'কে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা যায় না।

একদিন তাই দুপুরে ঘুরে এলেন পুরনো বাড়ী থেকে। ছেলে কাজ থেকে ফেরার অনেক আগেই চলে এলেন আবার নতুন বাড়ীতে। এ নিয়ে যদি ছেলে কোনো হাঙ্গামা বাঁধায় তাহলে একটা বিশ্রী পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হবে।

প্রতিটি সংসারেই বোধ হয় এক-আধজনের বর্তমান থাকাটা অনিবার্য-রূপেই প্রয়োজন যারা প্রতিদিনের খুঁটিনাটির সব কিছুই গোচরে নিয়ে আসে বাড়ীর কর্তার কাছে যা নিয়ে একটা তুলকালাম কাণ্ডকারখানা হোলে তারা বোধহয় একটা নিষ্ঠুর উল্লাস অনুভব করে। এর পেছনে কোনো প্রয়োজনীয় যুক্তি থাক বা না থাক। শুধু বড় কর্তার কানে কথাটা তুলে

একটু উত্তেজনার সৃষ্টি করাই হোলো প্রধান এবং দূরে থেকে সেই উত্তেজনার লম্পঝম্প দেখতে প্রয়াসী ও করতালি দেয় তারা।

এক্ষেত্রেও সেটা বাদ গেল না। বড় ছেলে বাড়ীতে ঢুকতেই কে যেন তুলে দিল তার কানে মায়ের পুরনো বাড়ীতে যাওয়ার বিস্তৃত বিবরণ।

ছেলের ক্রোধ যেন ফেটে পড়ে এই সংবাদে। মায়ের এত বড় স্পর্দ্ধা, বারণ সত্ত্বেও ওবাড়ী যাওয়ার বাসনা এড়াতে পারলেন না কিছুতেই? আমার কথার কোনো দামও রাখতে পারলেন না উনি? কী ধরনের মা তবে উনি। এতদিন খাইয়ে-দাইয়ে, কত তোয়াজ করে রাখা হোলো এবাড়ীতে, তবুও ওবাড়ীর টানটাই বড় হয়ে গেল আমার সম্মানের চেয়ে? দূর দূর করে এবাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়াই প্রয়োজন। আর এক-মুহূর্তও এখানে থাকা চলবে না মা'র। ছেলের মান যিনি রাখতে অপারগ তিনি যে মহাপাতকীরও অধম। কোন স্পর্দ্ধা তাঁকে উৎসাহিত করেছিল ওবাড়ীতে যেতে? নিজের সোয়ামীকে দেখার জন্য না অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের স্নেহের টানে বিবশ হয়ে? এমন লোকদেখানি বাৎসল্য না দেখালে কী ক্ষতি হোতো কিছু?

ছেলে রাগে চীৎকারে বাড়ী মাথায় করে তোলে। মায়ের চোখে যে জল ঝরছে এসব দেখে আর শুনে। কী কুক্ষণেই তিনি পুরনো বাড়ী ছেড়ে এবাড়ীতে এসেছিলেন থাকতে যার জন্য এত গালমন্দ শুনতে হচ্ছে তাঁকে?

মা'কে যে আর এবাড়ীতে স্থান দেওয়া যায় না, ছেলে এই ব্যবস্থায় নিশ্চল। কোনো সংকোচ নেই সেখানে, নেই কোনো আপোস নিষ্পত্তি। নিজের জিদটাই যে বড় কথা। নির্মম মন সেখানে কোনো লঘুগুরু বিচারের ধার ধারে না। একরোখা মানুষের ইন্দ্রিয় চলে যায় বশ্যতার বাইরে।

রাগে পাগলের মতো হয়ে মা'কে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিল ছেলে। শুধু ঘাড় ধরে ধাক্কা দেওয়াটাই বাকী ছিল। গলাবাজি করতে করতে একটা রিক্সা ডেকে তার ওপরে চাপিয়ে দিল মায়ের ছোট্ট সুটকেস ও পোটলা-করা বিছানাটা। এসব কাজ করালো সে তার ছেলেকে দিয়ে।

মা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেলেন পুরনো বাড়ীতে যথেষ্ট অপমানিত হয়ে। সেই চোখের জল ছেলেকে ও তাঁর নাতিনাতনিকে স্পর্শ করতে পারেনি। স্পর্শ করেছিল শুধু পাড়াপড়শীদের। সেই কাতর দৃশ্য দেখছিল তারা যার যার ঝুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে। এমন ইতরও হোতে পারে নিজের গর্ভে ধরা সন্তান?

যে ভাঙ্গা-হৃদয় নিয়ে ফিরে এলেন মা পুরনো বাড়ীতে সেটা তাঁর পক্ষে সহ্য করা সম্ভব ছিল না। এসেই খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এই বিরাট আঘাতে তাঁর হৃদয়ের সব তন্তুই শিথিল হয়ে গেছে। আর যে সেসব জোড়া লাগার মতো নয়। খণ্ডিত বিখণ্ডিত হয়ে আর বেঁচে থাকার বাসনা নেই একটুও। মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরে প্রলাপও বকেন উনি, কখনো কখনো অচৈতন্যও হয়ে পড়েন।

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হোলো তাঁকে যদি কোনো বাঁধন দেওয়া যায় শিথিল তন্তুগুলিতে। হৃদয়টা যে ঝরঝরে হয়ে গেছে একেবারে, আর কোনো স্নেহবস্তুই কাজ করার মতো নয়।

জীবনদীপ নিভে গেল এক সপ্তাহ বাদেই হাসপাতালে। অন্য ভাইবোনেরা কেউ টের পেল না মায়ের হঠাৎ এই হৃদযন্ত্রণা কেন হোলো? তারা তো সবাই ভেবেছিল মা যেমন স্বাভাবিক নিয়মে এক ছেলের কাছ থেকে অন্য ছেলেমেয়েদের কাছে আসেন, সেইভাবেই ফিরে এসেছেন নিজের আলয়ে। তিনি যে বড় ছেলের বাড়ী থেকে অপমানিত হয়ে দুঃখে অবসন্ন অবস্থায় আতুরভাবে ফিরে এসেছেন—সে কথা কাউকে বলেননি উনি। নিজের দহনে জ্বলে পুড়ে খাক হয়েছেন নীরবে। এযে কাউকে বলার জিনিস নয়, এই অপমান বড়ই দগ্ধকারী।

মা'র মৃত্যুসংবাদ পেয়েই সপ্রবৃত্ত হয়ে বড় ছেলে হাসপাতাল থেকে গাড়ীতে চাপিয়ে নিয়ে এলো সেই মৃতদেহ নিজের বাড়ীতে। কাউকে জানতে দিলে না যে মা'র মৃত্যুর কারণ সে নিজে।

দাদা বড়, তাই অধিকারগত মায়ের কাজ করবে সেই। সেই কর্তব্যে বাধা দিলে না কেউ। বড়োর কর্তব্যস্বত্ব পালনে বিরুদ্ধাচারণ অনুচিত, ভাবলে ভাইয়েরা-বোনেরা।

সেদিন দুর্যোগপূর্ণ রাত্রি। সকাল থেকেই বইছে ঝোড়ো ঠাণ্ডা হাওয়া, সেই সঙ্গে বৃষ্টিরও বিরাম নেই। জ্যোৎস্নাপক্ষ হোলে কী হবে, আকাশের মেঘ তাকে ঠুলি দিয়ে আটকে রেখেছে দিগন্ত প্রসারিত করতে। আকাশের রং তাই আবছা আবছা অন্ধকারে ভরা।

সেই দুর্যোগ ভেদ করে আমরা এগিয়ে চলেছি শ্মশানের দিকে শব কাঁধে করে। পালাপালি করে আমরা যার যার কাঁধ বদলে নিচ্ছি কষ্টটা এড়াবার জন্য। ভেজা মাটিতে পা কারুরই চলতে চাইছে না, একটু অন্যমনস্ক হোলেই পিছলে পড়ার আশঙ্কা।

বড় ছেলে কিন্তু কাঁধ বদল করতে নারাজ। একাই বইতে চায় সে

মায়ের নির্জীব দেহটাকে। এই কষ্টটা সহ্য করে নিজের পাপচিত্তকে একটু শান্ত করার জন্য সে উন্মুখ। কত বড় আঘাতই না দিয়েছে মা'কে বাড়ী থেকে বিতাড়িত করে। সেই দুঃখেতেই তো মা চলে গেলেন সবাইকে ছেড়ে। কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ অনুশোচনায় আজ যে ছেলে কেঁদে আকুল হোতে চাইছে। এক হাত দিয়ে রশ্মি ধরে অন্য হাত দিয়ে মুছে চলেছে চোখের জল।

শ্মশানঘাটে এসে দেখা গেল সেখানে এক ভয়ংকর দৃশ্য। রাতের গভীরতা ভেদ করে গঙ্গার জলের ঢেউ আছাড় খাচ্ছে পাড়ে। কী তার শব্দ---কানে লাগার মতো। হাওয়া দ্বিগুণ বেগে সোঁ-সোঁ করে বয়েই চলেছে এক প্রলয়দৃশ্য এঁকে। শ্মশানে সেদিন আর কোনো মানুষজন নেই। আমরাই শুধু। আমাদের কথাবার্তাও কেউ শুনতে পাচ্ছে না ভালো করে। বাতাসের বেগের শব্দই কানে আসছে শুধু।

আমরাই কেবল একটা শবদেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে সেখানে। সেখানে আর কোনো চিতা নেই, যেটা একটা না একটা প্রজ্বলিত হোতে থাকে সব-সময়। এযে এক ভিন্ন দৃশ্য। মা যে একাই প্রজ্বলিত হোতে চান এই শ্মশানে। এ ছেলে তো অনেক আগেই শ্মশানভূমি করে রেখেছিল তাঁর হৃদয়টা। তবে আর কীসের ভয় একা যেতে পরপারে? নাইবা রইল মৃতসাথী আর কেউ এ শ্মশানে।

শীতের বৃষ্টিভেজা ঠাণ্ডায় কাঁপুনি ধরছে সবারই। শ্মশানযাত্রী দুই-একটা কাঠে আগুন ধরিয়ে তার চারপাশে ঘিরে তাপ নিচ্ছে শরীরে। ওদিকে চণ্ডাল কোদাল দিয়ে খুঁড়ে চলেছে মাটি চিতার জন্য চুলো তৈরী করতে। কনকনে ঠাণ্ডায় তারও হাত চলতে চাইছে না, অবশ হয়ে খানিকটা জিরিয়ে নিচ্ছে সে।

ঘাটের নীচে জলের ধারে বসে বড় ছেলে মায়ের শব আগলে। অনবরত মাথা ঠুকছে মায়ের সেই শুভ্রশীতল পায়ে, আর জোরে জোরে আওড়ে চলেছে ---মা আমায় ক্ষমা করো, মা আমায় ক্ষমা করো।

শুদ্ধমতি হোতে চায় ছেলে এখন। মনে মনে ভাবি, মা যে ক্ষমা-শীলা চিরদিনের। তাই শত অপরাধেও কখনও কোনো অনিষ্ট উচ্চারিত হয় না মুখ দিয়ে। যতই না পাপকর্মে লিপ্ত থাকুক ছেলে। ক্ষমা-ভিক্ষা না করলেও ক্ষমা যে ক্ষরিত সবসময় মা'র কোমলহৃদয় দিয়ে। সেই ক্ষমাবারিতেই তো স্নিগ্ধ আমরা সবাই।

মানুষের নৈতিক চরিত্রের রূপান্তর ঘটে নানা ঘটনার আবর্তে। বিভিন্ন ধরনের ঘাতপ্রতিঘাত এনে দেয় হৃদয়ে বিরাট পরিবর্তন। অভিজ্ঞতা ও অনুধাবনই সৃষ্টি করে একটা পরিচ্ছন্ন মানুষ, বিচারশক্তি তখন হয় প্রবল।

কিন্তু এমনও অনেক আছে এই সংসারে যারা শত আঘাতেও থাকে অপরিবর্তিত, কুৎসিততাতেই তাদের চিত্ত থাকে অবিরত সজীব। কু-প্রবৃত্তিতেই তারা বলবান। তাদের পর্যুদস্ত করার মতো কোনো শক্তিই নেই এই সংসারে। কুবুদ্ধি, কুমন্ত্রণা, কুবাক্য ও হীনচাতুরী নিয়েই বাস করতে চায় তারা অপ্রতিহতভাবে। কোনো নৃশংস ঘটনা তাদের বিচলিত করলেও সেটা সাময়িক।

যে-ছেলের মধ্যে দেখা গিয়েছিল মাকে বাড়ী থেকে বিতাড়িত করে তাঁর অকালমৃত্যুর জন্য কাতরোক্তি, অনুশোচনা ও অনুতাপে দগ্ধ হয়েছিল শ্মশানে বসে; মায়ের পদস্পর্শ করে যে আকুতি ছিল ক্ষমা চাওয়ার মধ্যে, সেই মানুষটিকে মনে হয়েছিল তার চিত্তে হয়ত এবার আসবে একটা সুন্দর শুদ্ধতা। স্নেহভালোবাসা বর্ষিত হবে সর্বত্র। নির্মল করে তুলবে নিজেকে, অসদাচার, অত্যাচার দমন করে মানুষকে সম্মানে প্রতিষ্ঠিত করে হবে মহান। মার্জিত করে তুলবে নিজের অশিষ্ট আচরণকে। অপমানে অনাদরে কাউকে করবে না আর তুচ্ছ।

কিন্তু এসব লোকের কদাপি মানবিক গুণে গুণান্বিত হওয়া মুশকিল। এরা যে নির্বিবাদে হোতে পারে প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী, কপটাচার ও নানা দুরভি-সন্ধিতেই হোতে চায় অনুপম। সভ্যতার আলোক এদের হৃদয় স্পর্শ করতে অক্ষম। এরাই হোলো পূর্ণমাত্রায় চেতনাশূন্য, জ্ঞানবর্জিত, অনু-ভূতিহীন আর অহংকারে অন্ধ।

মায়ের প্রাণবিয়োগের কবছর পরেই আবার এক নতুন পালা শুরু হোলো সেই ছেলের। এবার পিতার প্রতি কর্তব্য পালনে হঠাৎ যেন যত্নশীল হোতে চায় যথোচিতভাবে। অন্যান্য ভাইবোনেরা তাদের দায়িত্ব আদর ও যথাশক্তি দিয়ে পালন করে চলেছে পিতার প্রতি। বড় ছেলের কোনো অংশদান তাতে হোতে পারেনি একটুও, তাতে কোনো সন্দেহ নেই কারণ পিতা যে থাকেন পুরনো বাড়ীতেই। বড় ছেলের নতুন আবাসে থাকার সুযোগ ঘটেনি তাঁর, কারণ কখনও তাঁকে থাকতেও বলা হয়নি সেই বাড়ীতে। তাই মনটা হয়ে থাকে দুঃখার্ত, হৃদয়ে থাকে টনটনানি।

বাবার বয়স হয়েছে যথেষ্ট। এখন কর্মক্ষমতাও গেছে লোপ হয়ে। সব কিছুই করে দিতে হয় তাঁকে, দৃষ্টিও হারিয়ে ফেলেছেন প্রায়। এক জায়গায় জবুথবু হয়ে বসে থাকেন। এখন আর কোনো কৌতূহল, ঔৎসুক্য নেই কোনো কিছু জানার। যে যা বলে সবই শুনে যান কান দিয়ে। স্ত্রীর মৃত্যুটাই অনেক কাহিল করে দিয়েছে তাঁকে।

তবে ছেলেমেয়েদের কোনো ত্রুটি নেই বাপের প্রতি সেবাযত্নে। বড় ছেলে দূরে থেকে সবই দেখে, লজ্জাও পায় কখনো কখনো নিজে কিছু করার সুযোগ পাচ্ছে না বলে।

বুকে অনেক সাহস নিয়েই একদিন কথাটা ওঠালো ছোট ভাইবোনদের কাছে যদি ওরা অনুমতি দেয় বাবাকে নিয়ে যেতে তার ওখানে। বাবাকে একটু সেবাযত্ন করার সুযোগ দিলে তবে সে-ও একটু পিতৃঋণ পরিশোধে ব্রতী হোতে পারে।

তারপরেই মায়ের জন্য শোকাবেগে অধীর হয়ে পড়ে বড় ছেলে, দু-ফোঁটা চোখের জলও ফেলে বসে সবার সামনে। প্রিয়জন বিয়োগ-দুঃখ তখনও কারুর মেটেনি। মায়ের অভাব সবসময় তারা অনুভব করে। এতো তাড়াতাড়ি তো চলে যাবার মতো বয়স ছিল না তাঁর। শরীরেও ছিল না কোনো কঠিন রোগ। তাই মায়ের কথায় তাদের মনে আবার নতুন করে শোকজনিত অধীরতা প্রকাশ পায়।

সত্যি কথাই তো, দাদারও তো ইচ্ছে হয় বাবাকে নিয়ে নিজের বাড়ীতে রাখার––সেখানে তো কোনো বিরোধ করার প্রশ্ন ওঠে না। পূজিত পিতার সেবাযত্নের অধিকার রয়েছে সব ছেলেমেয়েদেরই। সনাতনী এই প্রথা যে সর্বত্রই সমাদৃত। দাদাকে তাই কর্তব্যপালনে বঞ্চিত করা মানে ক্ষুদ্রতারই পরিচয় দেওয়া। সুতরাং দাদার প্রস্তাবে কারুরই আপত্তি হোলো না।

দাদা কথা অনুযায়ী নিয়ে এলো তার বাবাকে নিজের বাড়ীতে। যথাসাধ্য শুরু হোলো তাঁর প্রতি করণীয় কর্ম। সেবাযত্নে করে তুলতে চায় ছেলে বাবাকে আনন্দঘন। যে কর্তব্যবিমুখতা করে রেখেছিল ছেলেকে সংকীর্ণচেতা, আজ সেখানে দেখা দিতে চায় পরিপূর্ণ প্রশস্ততা। ছোটো ভাইবোনেরাও অবাক হয়ে গেল দাদার মধ্যে জ্ঞানবোধ উদয় হয়েছে দেখে।

অন্তর দিয়েই বাবার আদরযত্ন করে ছেলে। বাবার সেই শক্তি নেই আর নিজে স্নান সারার, তাই ছেলেই বাবাকে সারা অঙ্গে তেল মাখিয়ে স্নান করিয়ে দেয়। নিজে কাছে বসে দেয় খাইয়ে। মায়ের প্রতি যে

অসদ্ব্যবহার করা হয়েছিল সেই মনোবেদনার চিত্তদাহ বোধহয় শান্ত করতে চায় বাবার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে, তাঁর সেবা নিজের হাতে করে। যে-ভুল করে আজ সে অনুতাপে অনুতপ্ত, পশুর মতো সেই আচরণ থেকে নিবৃত্ত হোতে চায় হৃদয়ের পরিপূর্ণতা দিয়ে।

জলস্রোতে যে পলিমাটি এসে জমিকে করে তোলে উর্বর, আবার কোনো বন্যার ঘোলা জলে মিশানো কাদায় সেই পলি তলায় পড়ে যায়, তেমনি কয়েক মাস পরেই বাবার প্রতি পুত্রের সেই স্নেহমাখা আদরযত্নে এসে পৌঁছয় অলসতা। নিত্য সেবায় যত্নহীন ও উৎসাহ-শূন্যতা।

তবুও ছেলে করে চলে কোনোরকমে প্রাত্যহিক কাজগুলো। একা সামাল দেওয়া যে কঠিন, ধৈর্যের বাঁধ ধরে রাখা মুশকিল। অথচ ছোটো ভাইবোনদের বলতে পারে না এই কথা---নিয়ে যাও তোমরা আবার বাবাকে তোমাদের কাছেই। সেখানে যে আত্ম-অহংকার ভেঙ্গে পড়বে একমুহূর্তে। বড় মুখ করে তো নিয়ে আসা হয়েছিল জ্যেষ্ঠপুত্র হবার গৌরববশে, বাবাকে নিজের কাছে রাখবে বলে। এখন ফিরিয়ে দিলে ব্যঙ্গ ও বক্রোক্তিতে জ্বলে-পুড়ে মরতে হবে যে।

তাই অন্য ক্ষোভ এসে বাসা বাঁধে ছেলের মনে। আগের সেই হাসি-মুখ নিয়ে বাবার সেবাযত্ন করা একটু কঠিন হয়ে পড়ে। একটু তাচ্ছিল্যও দেখা দেয় তাঁর প্রতি।

এমন সময় কলকাতা থেকে এলো এক বোনের চিঠি, নেহাতই একটা মামুলি চিঠি---বাবার সেবাযত্নে যেন কোনো ত্রুটি না ঘটে দাদার কাছে আছেন বলে। বাবা তো মুখে কিছু বলেন না, শান্তমনেই মেনে নেন সব। চিরকালই তো সংগ্রাম করে গেছেন এই বড় সংসারকে দাঁড় করানোর জন্য। নিজের সুখশান্তির দিকে নজর দেননি কোনোদিন। পরের সুবিধাটাই দেখেছেন বরাবর। কাজেই এই বৃদ্ধ বয়সে মনের ওপর যেন কোনো চাপ না পড়ে।

এইসবই নানা কথায় ভরা সেই চিঠি। অতি সাধারণ কথা সেসব ---একটা আবেগের প্রকাশমাত্র যা মেয়েরা সচরাচর ভাবাবেশে করেই ফেলে বাবা-মা'র জন্য। কিন্তু এই চিঠি যে দাদার তপ্ত শরীরে অগ্নিকাণ্ডের মতো বিষম অনর্থের সৃষ্টি করবে সেটা ছিল ধারণাতীত। সেই আগুনের হলকা ছুটে এলো কলকাতায় বোনের শ্বশুরবাড়ীতে।

বোনের চিঠি হাতে নিয়েই তো দাদা চীৎকার করে পাড়া মাথায় করে চলেছে। চিত্তবিক্ষোভে কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। মনের স্থৈর্য ভেঙ্গে পড়ার মতো, পাগলের মতো ছোটাছুটি চলছে বাড়ীতে এঘর

থেকে সেঘরে। এক ফাঁকে টেলিগ্রাম করে এসেছে দাদা বোনকে কলকাতাতে তার চিঠির উত্তরে।

সেই টেলির সারমর্ম হোলো, বাবাকে পাঠাচ্ছি অমুক ট্রেনে তোমার কাছেই—যত্নআত্তি করে রেখো।

সেই টেলিগ্রাম পেয়ে বোনের শ্বশুরবাড়ীর লোক তো অবাক। যাক বৃদ্ধমানুষ যখন আসছেন কলকাতাতে তখন তাঁরজন্য একটা বিশেষ ব্যবস্থা করে রাখা প্রয়োজন। এবাড়ীর যিনি বড় তিনি তাঁর ঘরখানাতেই বৃদ্ধের থাকার ব্যবস্থা করলেন, যাতে তাঁর কোনো অসুবিধা না হয়। আরামে রাখার বন্দোবস্ত করে দিলেন তাঁরা সবাই মিলে।

পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে তাঁরা স্টেশনেও উপস্থিত রইলেন বৃদ্ধকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসার জন্য। কোনো ত্রুটি যেন কোথাও না থাকে তাঁকে গ্রহণ করতে, প্রিয়জনের মনে দুঃখ, ক্ষোভ, অনাদর বা অপমানের সৃষ্টি না করে।

এদিকে বাবা কিন্তু কিছুই জানেন না এসবের। সকালের নিয়ম-মাফিক তাঁর সেবাযত্নের সব কিছু বাদ পড়ে গেছে। নির্বাক তিনি তবুও, স্থির হয়ে বসে আছেন নিজের বিছানাতে।

ছেলে সমানে চেঁচিয়ে চলেছে বাবার দিকে চেয়ে, নিয়ে রাখুক তোমার ওই মেয়ে কলকাতাতেই। আজকেই তোমাকে ট্রেনে চাপিয়ে দেব। টেলিগ্রাম করে দিয়েছি স্টেশনে থাকতে। ওখান থেকে ওরা নিয়ে যাবে নিজেদের বাড়ীতে। আমার দায়িত্ব থেকে আমি খালাস হোতে চাই; আর নয়, যথেষ্ট হয়েছে তোমার সেবার ভার নিয়ে। দূর থেকে, বড় বড় চিঠি লিখে উপদেশ দেওয়া বড় সহজ। নিজে করে দেখুক সেবাযত্ন, উপদেশ দেওয়া আর কাজ করা দুটো ভিন্ন জিনিস।

ছেলে বাপের কাছে কোপের উৎকট প্রকাশ করে চলেছে অবিচলভাবে। অটল সংকল্প তার, বাপকে এখান থেকে কলকাতায় পাঠিয়ে তবে হবে তার মনের প্রশান্তি।

দুপুরে কোনোরকমে বাপকে খাইয়ে বিকেলের ট্রেনে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে।

বাইরের কোনো লোক কেউ জানতে পারল না ছেলের এই ব্যবস্থার কথা। সংগোপনে চলেছে এসব কারবার। কেউ যদি জেনে যায় তাহলেই তো আসবে প্রচণ্ড বাধা। দেখি, কে আটকায় তাকে একাজে।

দেয়ালেরও যে কান আছে, এটা প্রবাদ কথা হোলেও একেবারে অবিশ্বাস্য নয়।

সেদিন বিকেলের ট্রেনে হাওড়ার গাড়ীতে উঠিয়ে দেওয়ার জন্য ছেলে ষ্টেশনে পৌঁছে গেছে। এদিকে অন্য পাড়ায় যেসব ভাইবোনেরা রয়েছে, তারা কেউ এসবের ঘুণাক্ষরেও কিছু জানে না। বাবা দাদার কাছে আছেন, এর চেয়ে বেশি নিশ্চিন্ততা আর কী হোতে পারে? মাঝে মাঝে তারা বাবাকে দেখে গেছে এসে। দিব্যি ভালোভাবেই তো রেখেছে দাদা, কোনো অভিযোগ তো কানে আসেনি তাদের। বাবার মুখেও তো উচ্চারিত হয়নি কোনো অযত্নের কথা। শুধু কদিন যেতে পারেনি তারা ওদিকে বাবার খোঁজ নিতে। কাজেকর্মে সবাই যে ব্যস্ত থাকে সারাদিন, তাই বাদ পড়ে গেছে কটা দিন।

বিকেলে কে যেন এসে বলে গেল ওদের দাদা যে বাবাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিতে চলেছে আজকেই বিকেলের ট্রেনে। অবাক হয়ে গেল তারা একথা শুনে। এ কী কাণ্ড, কে বলেছিল দাদাকে এবাড়ী থেকে বাবাকে নিয়ে যেতে সেবাযত্নে রাখবে বলে? একা যদি সেসব করতে অসুবিধাই হচ্ছিল তবে আমাদের এখানেই তো ফিরিয়ে দিতে পারত। কলকাতায় পাঠাবার প্রয়োজনটা ছিল কোথায়? তাও গিয়ে থাকতে হবে দিদির শ্বশুরবাড়ীতে? এর চেয়ে লজ্জার ব্যাপার আর কী হোতে পারে?

ছুটল তারা ষ্টেশনের দিকে দিশাহারা হয়ে। যেমন করেই হোক আটকাতে হবে এই আয়োজন। কী জঘন্যভাবেই না দাদা আঘাত দিতে পারে মানুষকে; অন্তরাত্মা বলে যে কিছুই নেই তার। আমরা থাকতে বাবা কেন যাবেন কলকাতায়? আমরা কী একবারও বলেছিলাম বাবার দায়িত্ব নেবার ক্ষমতা আমাদের নেই? নিজেই তো সেধে নিয়ে গিয়েছিল তার সাধের নতুন বাড়ীতে। এখন বুঝি বিতৃষ্ণা এসে গেছে নিজের কর্তব্যপালনে?

ষ্টেশনের লম্বা প্লাটফর্মে একটা বিরাট কাণ্ড শুরু হয়েছে তখন। ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে একটা কোণ ঘেঁষে বাবা বসে আছেন। নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন বাইরে। জীবনযাত্রার শেষ অধ্যায়ে এসে এও যে কপালে লেখা ছিল ভাবেননি কখনো। উঁচু মাথা নিয়ে থেকেছেন সংসারে। আজ বড় ছেলে যে তাঁর সেই মাথা নীচু করে দিয়েছে। পাঠিয়ে দিচ্ছে সে মেয়ের শ্বশুরবাড়ীতে থাকার জন্য। এ যে কত বড় লজ্জাজনক ব্যাপার ভাবা যায় না। শরীরে সামর্থ্য নেই আজ, তাই নীরবে সহ্য করতে হচ্ছে এই লাঞ্ছনা। ক্ষমতা থাকলে সাহস হোতো কী ছেলের পিতার প্রতি এই ব্যবহার?

এসব কথা তিনি জানালার বাইরের দিকে তাকিয়ে ভাবেন, আর চোখের জল ফেলেন।

নিমেষে কে যেন তাঁকে পাঁজাকোল করে উঠিয়ে নিয়ে কম্পার্টমেন্ট থেকে বাইরে বসিয়ে দিল একটা বেঞ্চে। শরীরটা যে কাঁপছে তাঁর আচমকা এইভাবে উঠিয়ে নিয়ে যাবার দরুন। তাকিয়ে দেখেন, তাঁর ছোটো ছেলে এসে নিয়ে গেছে তাঁকে বাইরে। বড় ছেলে তখন কাছে নেই, প্লাটফর্মের অন্য দিকে গেছে কোথাও হয়ত।

সেও এসে উপস্থিত ততক্ষণে। বেঞ্চের ওপর বসে আছে দেখে আবার সেই ফোঁসফোসানি। একটা ক্রোধব্যঞ্জক দৃষ্টি নিক্ষেপ করল সে ছোটো ভাইয়ের দিকে। কোনো কথাই সে শুনতে চাইছে না, যেমন করেই হোক বাবাকে কলকাতায় রেখে আসতেই হবে।

আবার পাঁজাকোল করে বড় ছেলে বাবাকে তুলে নিয়ে বসিয়ে দিল রেল-কামরায়। তুমুল কোলাহল শুরু হোলো দুই ভাইয়ের মধ্যে — এক ভাই হাতে তুলে নামিয়ে নেয় বাবাকে, আবার বড় ভাই পাঁজা করে নিয়ে ওঠায় কামরার ভেতর।

এইভাবেই চলল নাটকীয় দৃশ্যের কিছুক্ষণ খেলা। এ যেন কাপড়ের বস্তা একবার নামানো আর একবার ওঠানোর কারবার। এদিকে বৃদ্ধ মানুষটির প্রাণবায়ু নির্গত হওয়ার মতো। মুখে কিছু আওড়াতে পারছেন না। কোন ছেলেকে বলবেন তাঁকে নিয়ে এইভাবে ওঠানামার খেলা থেকে নিবৃত্ত থাকতে। বুক ধড়ফড় করছে ছেলেদের দ্বন্দ্বযুদ্ধে— কেউ যে কোনো কথা শুনতে নারাজ কারুর কথা। কাণ্ডজ্ঞানহারা দুজনেই। এদিকে হাসাহাসি করে চলেছে প্লাটফর্মে যারা দাঁড়িয়ে সবাই। বাবাকে নিয়ে এরকম টানাটানির খেলা দেখেনি তারা জীবনে।

এধারে বাপের নিঃসঙ্গ অবস্থার দিকে তাকিয়ে দেখার খেয়াল নেই দুজনেরই। এ যে মাংসখেকো পশুর মতো ঝাপটা মেরে চলেছে দুজনেই মৃতকল্প জীবের ওপর। ভাগ নিয়ে মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ। লাভের ভাগ কী দাঁড়াবে শেষ পর্যন্ত সেটা নেই কারুর অজানা।

বাপের অবস্থায় আর চেতনা নেই কোনো। টানা-হেঁচড়া যে আর সহ্য হচ্ছে না শরীরে। এযে লয়নৃত্য খেলে চলেছে ছেলেরা বাপের দায়িত্বস্বত্ব নিয়ে। বাপ যদি এই প্লাটফর্মেই শেষ নিঃশ্বাস নিয়ে কাত হয়ে পড়েন, তবে কে নেবে তাঁর মৃত্যুর দায়িত্ব ?

জীবিত থাকাকালীনই বড় পুত্র যাঁর দায়িত্ব নিতে অপারগ, ঠেলে ফেলে দিতে দৃঢ়চিত্ত অন্যের ওপর। সেক্ষেত্রে সে বাধা দেয় কোন লজ্জায় ?

শেষ পর্যন্ত ছোটো ছেলেই নিয়ে এলো তাদের পুরনো বাড়ীতে বাবাকে যেখানে তিনি আগেও ছিলেন শান্তিপূর্ণ অবস্থায়।

কিন্তু শান্তি মেলেনি তাঁর জীবনে আর। পরিপূর্ণ শান্তি পেয়েছিলেন কয়েক মাস পরেই জীবনদীপ নির্বাপিত করে। বড় পুত্রের ওপর দেহভার রাখতে হয়নি তাঁকে, এটাই ছিল বড় সান্ত্বনা। মারা যাবার পরেও তাঁর শবদেহ কাঁধে বইতে দেওয়া হয়নি বড় ছেলেকে।

পুরনো কথা বলার সবচেয়ে বড় অসুবিধা তার ধারাবাহিকতা নিয়ে। একটার পর একটা কথা ইতিহাসের মতো সাজিয়ে যাওয়া চলে না, সন-তারিখ সব মিলিয়ে। মনের গোচরে যেমন যেমন কথা আসে, তাকেই হঠাৎ হঠাৎ ধরে রাখতে হয়। তাই অনেকের এসব কথা খাপছাড়া মনে হোতে পারে। যেসব চরিত্র বিশেষ বিশেষ ঘটনার মধ্য দিয়ে দাগ কেটে আছে মনের অন্দরে এবং যেগুলো পরিস্ফুট হোতে চায় লেখার ভেতর, তাকেই দিতে হয় প্রাধান্য। তা না হোলে যে ভাবনার রূপরেখাটাই যাবে আটকে, সন আর তারিখটাই হয়ে পড়বে বড়। কাঁথা তো আর সেই ভাবে বোনা চলে না, যেমন যেমন ফুরসৎ হয় তার ওপর ফোঁড় দিয়ে চলি। তাই আগের ফুল পরে হোলেও ক্ষতি নেই। এতে স্মৃতিসত্তা হারাবার ভয় নেই।

মেয়েদের কাছে সৃষ্টির বড় দায়িত্ব হোলো তার সংসার। বুকে বেঁধে ধরে রাখতে চায় তারা সংসারটাকে সেটা ছোটই হোক বা বড়ই হোক। যথেষ্ট শক্তির দরকার এতে। আত্মপরীক্ষাও যে হয় এর ভেতর দিয়েই। ভালোবাসা দিয়ে, সেবা দিয়ে হয় তার ধৈর্যের নিরূপণ।

আত্মীয়স্বজনভরা নিজের সংসার রচনা করা সহজ কথা নয়। সহজ নয় বলেই এতে কষ্ট আছে, আছে আনন্দও। গৌরবও আছে যথেষ্ট। সবাই কী পারে একটা সুন্দর রূপ দিতে তার সংসারে? কারণ অনেকের মধ্যেই রয়েছে ঔচিত্যবোধের অভাব। আত্মত্যাগেরও একটা ক্ষমতা থাকা চাই সংসার আগলে রাখার জন্য।

অহংকারবোধটা বড় বেশি প্রবল মেয়েদের মধ্যে, অভিমানের সঙ্গে যে একটু ঈর্ষাও যে নেই, তা নয়---এসব বাদ দেওয়া একটুখানি কথা নয়।

একটা সংসারে থেকে নিজের খেয়ালখুশির প্রকৃতিটাকে করতে হবে বর্জন। কাজের একটা নির্দিষ্ট ছবি এঁকে রাখা প্রয়োজন মনের ভেতর। কোনটার পর কোনটা করতে হবে সেটা থাকবে ছকের বন্ধনে। এলো-পাতাড়ি কাজে নেই কোনো সুষমতা, বিশৃঙ্খলাই আসে তাতে। সেসব

অসুবিধার সৃষ্টি করে অনেক ; নিজের কাজ এবং পরের কাজও ব্যাহত হয় এতে। শাড়ী, গয়না-গাঁটি পড়ার মধ্যে যেরকম রয়েছে সাজবোধ, তেমন শিল্পবোধ নিয়ে সাজিয়ে রাখতে হবে ঘর-দুয়োর সব, সেখানেই ফুটে উঠবে পরিচ্ছন্ন রুচিবোধ।

এসব তো হোলো সংসার রক্ষার প্রধান সামগ্রী। কিন্তু এর ওপরেও মেয়েদের কাছে একটা বড় দাবী থাকে---সেটা হোলো সবাইকে স্নেহধন্য করে রাখার সুখসম্পদ।

রাঁচির অদূরে কোনো গ্রামের একটি সংসারের কথা মনে পড়ছে এতো সব বলতে গিয়ে। বাড়ীর যিনি কর্তা, তিনি জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান স্কিতে হাতে। জরিপের কাজ করতে হয় সরকারী জমিজমাতে। তখনকার দিনে একজন ওভারসিয়ার মানেই হোলো তাকে দিয়ে সব কাজ করানো।

গায়ের রঙটা কালো বলে জঙ্গলের মানুষ, গাঁয়ের লোক, সবাই ডাকে তাঁকে 'কালাসাহেব' বলে। মাথায় শোলার টুপি, পরনে খাঁকি হাফ-প্যান্ট এবং একটা হাফ-হাতা শার্ট গায়ে ঘুরে বেড়ান তিনি যেখানে যে সরকারী কাজ সব দেখাশোনা করতে। সাইকেলটাই একমাত্র বাহন যার ভরসায় এ গ্রাম থেকে সে গ্রামে যাতায়াত করতে হয় কাজের জন্য।

উদ্দমী মানুষ। ভোরে উঠেই বেরিয়ে পড়েন কাজে, আবার দুপুরে ফেরেন বেলা দুটো-তিনটে নাগাদ খাওয়ার জন্য। বিশ্রাম নেই কোনো, খেয়েই তক্ষুণি আবার সাইকেলে চেপে কাজের জায়গায়।

স্বাস্থ্য সইবে কেন এতো অত্যাচার? কাহিল হয়ে পড়েন ক্রমশ ---সেই দুর্বল শরীর নিয়েই চলে জীবন-সংঘর্ষ। জীবনোপায়ের পথ বন্ধ হোয়ে গেলে একেবারেই জুড়িয়ে যাবে যে সংসারটা। কে সামলাবে তখন এতোগুলো ছেলেমেয়ে? নেই নেই করেও তো তারা সাতজন সংখ্যায়।

এতো পরিশ্রমও যে সয় না আর শরীরে। কালাসাহেব একদিন কালকবলেই পতিত হলেন সংসারটাকে অকূলে ভাসিয়ে। এতোগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে মাথায় বাজ পড়ার মতো স্ত্রীর অবস্থা---নাথবতী যে অনাথিনীতে পরিণত। ঘরে যে কোনো কানাকড়িও নেই, সবাইকে খাইয়ে-পরিয়ে রাখার মতো। আছে একটা বড় ক্ষেত আর তাতে একটা বড় ইঁদারা। এই সম্বল নিয়ে কী করে চলবে সংসার? শুধু মাটির ওপর বাস করলেই তো চলবে না, চাই যে আহারের একটা স্থায়ী ব্যবস্থা। সন্তানরা কেউ যে নাবালিকত্বও পেরোয়নি এখনও।

শুধু যে নুন ভাত খাওয়াবেন সন্তানদের তারও তো উপায় নেই। নুন কেনারও যে ক্ষমতা নেই। শুধু ধান-চাল পাওয়া যায় ক্ষেত থেকে, তাতে বছরও যে চলে না। দিশেহারার মতো অবস্থা, দৃষ্টিসীমা যে হারিয়ে যায় অসহায়ত্বের কথা ভেবে। রাতটা যদি আরো দীর্ঘ হোতো, দিনের ক্ষুধার তাড়নাটাও তাহলে কম হোতো অনেক।

দিন হোলেই তো চিন্তার রাশ এসে জড়ো হয় মনে---কী দেবেন ওদের খেতে? জঠরের জ্বালা যে বড় ভয়ংকর, এতোগুলো কচিকচি সন্তানের উদর পূরকের জন্যও যে দু-মুঠো মুড়ি থাকে না ঘরে। মা কাঁদেন আর তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে মোছেন সেই অশ্রুবারি।

এমন সময় এক ঝুড়ি লাল শাক দিয়ে যায় এক প্রতিবেশী। তার ক্ষেতেও যে ধান হয়নি এবার, শুধু লাল শাক হয়েছে সেখানে। তাই পাঠিয়েছে এ বাড়ীতে। জানে তারা, এ বাড়ীর কর্তা মারা যাওয়ার পর খাওয়ার সংস্থান যে গেছে ম্লান হয়ে।

লাল শাক দেখে মা'র মনে আসে একটা ভরসা, বেঁচে থাকার আলোক-স্ফুরণ হয় স্পষ্ট। যুঝতে হবে এই সংকটময় অবস্থাকে, তা না হোলে যে ভেসে যাবে সব। কোথায় দাঁড়াবে এই কচি ছেলেমেয়েগুলো? মা যদি শক্ত না হন এই নিঃসহায় সন্তানরা কার ভরসায় থাকবে বেঁচে? দুঃখসহন ক্ষমতা যে আনতে হবে সবার মধ্যে। দুঃখ দিয়েই যখন ওদের জীবন শুরু, তখন কষ্টজীবী যে হোতে হবে সবাইকে। কষ্টে-সৃষ্টে যারা মানুষ তারাই বুঝতে শেখে জীবনের আসল রূপ, কষ্টের কষ্টি-পাথর দিয়েই হয় জীবনের বিভিন্ন পরীক্ষা।

লাল শাকের ঝুড়িটার দিকে তাকিয়ে চোখটা আবার চিকচিকিয়ে ওঠে মা'র। নিয়ে এলেন একটা ভাঙ্গাচোরা নড়বড়ে বঁটি। অদৃষ্ট প্রসন্ন হয়েছে যে আজ, তাই পড়শী পাঠিয়েছে লাল শাক। এদিয়েই চলে যাবে দুপুরের ভাত খাওয়া অন্তত দুটো দিন।

রাত হোলেই আসে জমাট বাঁধা অন্ধকার। একটা কেরোসিনের কুপি মাঝের ঘরটায় জ্বালিয়ে রেখে দেন যাতে সব ঘরেই একটু আলোর প্রবেশ হোতে পারে। অন্ধকার ভাবটা অন্তত কেটে যাবে তা দিয়ে।

এমন সময় এলো আর একটা উপদ্রব। সরকারী রাস্তা হবে গ্রামের ওপর দিয়ে টাটানগরে যাবার জন্য। জমি চাই সরকারের সেই কারণে। জমির মাপজোখ চলছে সর্বত্র। এই বাড়ীর চাষের জমি যেটুকু তারই একটা বড় খণ্ড কেড়ে নিতে চায় ওরা। সেরকমই একটা প্ল্যান আঁকা হয়েছে জেনেছেন উনি। সাধারণের সুখসুবিধার জন্যই রাস্তা তৈরী

করবেন সরকার, সেক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষের ক্ষতির কথা ভাবলে জনহিতকর কাজকর্ম করা চলে না। অনেক কাকুতি-মিনতি সত্ত্বেও এই বাড়ীর জমির খানিকটা কেড়ে নেবার মতো উপক্রম। কিছুতেই আটকানো যাচ্ছে না।

একদিন শুনলেন জেলাশাসক আসছেন নিজেই রাস্তার কাজকর্ম দেখতে। ইংরেজ সাহেব, লাল টকটকে চেহারা, সঙ্গে জনাকয়েক অন্যান্য-রাও। পুলিশের লোকও কিছু রয়েছে।

বিধবা মা সাতটি সন্তান নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন জমির ওপর সার বেঁধে। তাঁর জমির ওপর রাস্তা হোতে পারবে না। এইটুকুই যে সম্বল তাঁর, যেখানে ধান, সব্জির সামান্য ফসল হয়। এটাও না থাকলে এই বাচ্চাগুলোকে বাঁচানো যাবে কী করে?

কালেক্টার বিস্মিত। এও যে এক ধরনের সত্যাগ্রহ। প্রায় অর্দ্ধ-নগ্ন কজন বাচ্চা নিয়ে বিধবা মায়ের এই বাধা দেখে চমৎকৃত। নেমে এলেন গাড়ী থেকে---কী কারণে এই প্রতিকূলতা? ঘিরে ফেলেছে যে শিশুরাও তাঁকে।

কালেক্টারকে হাতজোড় করে বলেছেন বিধবা মা, আমার যে আর কিছু নেই সাহেব, স্বামী যে এই কটি শিশু রেখে চলে গেছেন কদিন আগে। কোনো টাকা নেই, পয়সা নেই আমার। এই জমিটুকুতেই নিজে ফসল ফলিয়ে বাঁচিয়ে রাখছি এদের। এটাও যদি কেড়ে নাও তোমরা, কী করে বাঁচাবো এই শিশুদের?

কালেক্টর নীরব হয়ে শুনলেন বিধবার কাতরোক্তি, রোদনভরা প্রার্থনা। একটু অভিভূত হোলেন। হুকুম হোলো এই জমি বাদ দিয়ে অন্যদিক দিয়ে রাস্তা ঘুরিয়ে প্ল্যান করার।

বিধবা মায়ের জমি রয়ে গেল যেমন কে তেমন। এইভাবে যুঝেছেন উনি। জীবনের সমর নৈপুণ্যে জয়ী হয়েছেন একটার পর একটায়। একাগ্রতা, অটল বিশ্বাস, কঠোর পরিশ্রম ছিল সংসারটাকে দাঁড় করানোর মধ্যে। রাত্রে সবাইকে দু-মুঠো খাইয়ে নিজে খেতেন ঢক ঢক করে এক ঘটি জল। নিজের অন্নটা তো বাঁচবে পরের দিনের জন্য। ছেলেমেয়েরা বাঁচলেই যে তাঁর বাঁচা।

অনেক সময় বড় ছেলে লক্ষ্য করেছে যে মা শুধু রাত্রে জল খেয়ে শুয়ে পড়েন। জিজ্ঞাসা করাতে মা হেসে বলেন, আজ যে একাদশী বাবা, বিধবার যে রাত্রে কিছু খেতে নেই।

ছেলে মেনে নেয় সেই কথা। কিন্তু বড় হয়ে বুঝেছে মা'র এই ত্যাগের অন্তরালে কোন করুণা ছিল জড়িত। বিত্তহীনের সংসারে কোন ব্যথা যে

সবচেয়ে বেশি মর্মপীড়ক, বড় হয়ে টের পেয়েছে সবাই। খাদ্য না থাকলে যে কোনো মহৎ কাজই সম্পন্ন হোতে পারে না। মা কিন্তু কষ্ট দিয়েছেন নিজেকে খাদ্যের অভাবে।

ছেলেমেয়েরা যেমন যেমন বড় হয়, দুই একজনকে গ্রামের স্কুলেই পাঠান তিনি। রোজ হেঁটে যাওয়া আর হেঁটে ফেরা—দূর হোলেও উপায় নেই। একদিন দেখেন ওঁর মেজ ছেলের সঙ্গে এসেছে আর একটি ছেলে ওরই বয়সী। পরনে শতচ্ছিন্ন একটা প্যান্ট, শার্টের অবস্থাও তাই, চুলগুলো অবিন্যস্ত, চোখেমুখে নিঃসহায়তার ছাপ।

আহা রে, কার ছেলের এমন দশা, এ যে দেখছি নিজের ছেলেদের চেয়েও দীনহীন, চোখ দিয়ে বেরোচ্ছে একটু আশ্রয় পাওয়ার কাতরতা! কে এমন সর্বনাশ করে গেল ওকে? কতদিন আহার জোটেনি মনে হয়, তাই কথা বলতেও কষ্ট। এসব বলে এগিয়ে এলেন বিধবা মা। জড়িয়ে ধরলেন ছেলেটিকে, মেজ ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কার ছেলেরে? চিনি না মা একে। কিন্তু ক্লাশে বসে কাঁদছিল আকুলভাবে। ওর বাবা নাকি ওকে খেদিয়ে দিয়েছে। নিজের মা অনেকদিন আগেই মারা গেছেন। এখন এক নতুন মা এসেছেন তাঁর জায়গায়। কাজেই এই ছেলের ওবাড়ীতে আর স্থান হবে না। ওকে যে আর কেউ দেখবার নেই মা, তাই আমি নিয়ে এসেছি একে আমাদের সঙ্গে থাকবে বলে। কিছুতেই আসতে চাইছিল না লজ্জায়, সংকোচে। মেজ ছেলের কথা শুনে মা এবার সজোরে বুকে চেপে ধরলেন অনাথ ছেলেটিকে। বল্লেন, ঠিক আছে আর একটি পুষ্যি বাড়লো আমার। তোদের সঙ্গেই থাকবে এখানে। ভগবান যদি চান, তোদের সঙ্গে মানুষ হোক এও।

মাতৃত্বের কোমলতা ঝরে পড়ছে মা'র মুখে। নিজের সন্তানদের অন্নসংস্থান যদি ওপরওয়ালা করে দেন, তবে সেই অনাথনাথই দেবেন আমার দরিদ্র সংসারে ওর শরণ।

সেই থেকে রয়ে গেল ছেলে এই বাড়ীতে। মাতৃপিতৃহীন বালক পেল অন্য এক অজানা মায়ের কাছে আপন আশ্বাসভরা আশ্রয়। অনাদরে অযত্নে নয়, অবহেলায় লালিত নয় বরং নিজের সন্তানদের চেয়েও বড় মান নিয়ে।

সেই অনাথ ছেলেও মা বলে ডাকে বিধবাকে সবার মতো। যথেষ্ট টানাটানির মধ্যেও দু-মুঠো আহার এর ভাগ্যেও জোটে প্রতিদিন। স্কুলে যাওয়া-আসা চলে একই সাথে অন্য ছেলেদের সঙ্গে। কোনো তারতম্য নেই আপন-পরের। একই বিছানায় শোয় সবার সঙ্গে একই গাত্রাবরণ

নিয়ে। কত সদ্ভাব ছেলেদের মধ্যে, তারাও যে মেনে নিয়েছে একে নিজের ভাইয়ের মতোই।

বড় হয়ে সেই ছেলে পেল চাকরি সেনাবিভাগে পূর্ণ মর্যাদা নিয়ে। তখন সে চলে গেছে আর্মি-কোয়ার্টারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বাড়ীর সঙ্গে যোগা-যোগ পূর্ববৎ স্থায়ী, পূর্ণতায় ভরা। মা যা বলেন, তাই করে সেই ছেলে।

ছেলে যে এখন যুবক, বিয়ে দেবার মতো বয়স হয়ে গেছে তার। প্রয়োজনও রয়েছে। এই বাড়ী থেকেই খোঁজাখুঁজি শুরু হয় মেয়ের।

হঠাৎ একদিন ছেলের বাপ এলেন ছুটে এই বাড়ীতে। ছেলের বিয়ের দায়িত্ব পালন এখন উনি করতে চান। পিতার দেবসদৃশ কর্তব্যবোধ শুধু ছেলের বিবাহকর্মের জন্যই উদ্যোগী হোতে প্রয়াসী। অনাথ পুত্রের প্রতিপালন ও অন্নসংস্থানের সময় ছিলেন সংস্রবশূন্য। তেজী মহাপুরুষ, তাই তখন পুত্রত্যাগেও ছিল না কোনো লজ্জা। এখন ক্রন্দন ফুটে উঠতে চায় হৃদয়ে, পুত্রের স্নেহমমতা লাভের উদ্দেশ্যে। নিহিত উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, একটা বড় রকমের যৌতুক পাওয়া পুত্রের বিবাহোপলক্ষে। দ্বিতীয় স্ত্রীও আর নেই। বয়সের ভারে এখন তিনি ক্লান্ত, নির্ভরশীলতা না হোলে যে আর উপায় নেই, কাজেই এই পুত্রই তো এখন একমাত্র ভরসা, অন্ধের নড়িসদৃশ। বৃদ্ধ বয়সের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার আর কেউ নেই। সম্ভ্রান্ত সজ্জন ব্যক্তিরূপে, শিষ্ট ব্যবহারে এখন তিনি হোতে চান শিষ্টসমাজভুক্ত।

তাই তো ছুটে এসেছেন এবাড়ীতে যেখান থেকে ছেলে পেয়েছে স্নেহ-ভালোবাসা আর মানুষের সম্মান।

বাপ এসেছেন এই বাড়ীতে জেনেও ছেলের মনে নেই কোনো ভাবাবেশ। নিবেদন আবেদন কিছুই সে শুনতে নারাজ। কর্কশবাক্য মুখে না আনলেও বাপের আগমনে কোনো উষ্ণতাই আসে না হৃদয়ে। দৃঢ়তম কাঠিন্য নিয়েই দূরে দূরে থাকে।

ছেলে অটল, নির্লিপ্ত। যে-মা তাঁকে মানুষ করেছেন তাঁর প্রতি কোনো অনাদর নয়। এই মায়ের দুধ পান করেনি বলে তাঁকে মাতৃস্থান থেকে বিচ্যুত করা চলবে না কিছুতেই। পুত্রবৎপালনকারী সেই মা'র প্রতি কোনো অশ্রদ্ধা প্রকাশ নয়। বিয়ের ব্যাপারে মা যা বলবেন সেটাই পালিত হবে অক্ষরে অক্ষরে। কোনো মীমাংসার প্রশ্ন নেই সেখানে।

মা কিন্তু নিরাকাঙ্ক্ষ। পিতা যখন এবাড়ীতে উপস্থিত তাঁর কথাই মান্য হবে। ন্যায়-অন্যায়ের বোধ নিয়ে কোনো অন্যায় আচরণ নয় এখন

তাঁর প্রতি। সৎশিক্ষা লাভ করে নীতিমানের প্রকাশ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই বাড়ীতে সেটাই শেখানো হয়েছে সবাইকে। দুঃখ-দারিদ্র্যে বাস করেও নৈতিক মূল্যবোধ থাকবে সজাগ।

বাবা যখন ছেলেকে বিয়ে দিয়ে তাঁর ঘরে বউ নিয়ে যেতে আগ্রহী, নিয়ে যাবেন বৈকি উনি ছেলেকে আর বউকে। পিতার ক্ষণিকের ভুলের জন্য তাঁর মনে এখন বড় আঘাত দিলে সেটা হবে এই বাড়ীর অসম্মান। পিতৃসম্মান রক্ষা করা ছেলেরও কর্তব্য। এই বাড়ীর শিক্ষার মর্যাদা যেন কোনোমতেই ক্ষুণ্ণ না হয়।

মায়ের এই সংকোচহীন স্পষ্ট বাক্য সবাইকে স্পর্শ করল। এই স্পষ্ট সত্যকথনেও ছিল স্নেহযুক্ত মঙ্গলকামনা, শুভ্রবর্ণ প্রস্তরের মতই সেটা স্বচ্ছ। কোনো দম্ভ, কোনো অহমিকা মেশানো ছিল না সেই কন্ঠস্বরে।

ভোর থেকে উঠেই যদি শুরু হয় প্রতিদিন কটকটে ভাষার নিরন্তর ধ্বনিরব এবং শেষ হয় রাতের শয়নাবস্থা না আসা পর্যন্ত, তবে কজন আছেন এরকম সুজন এই সংসারে, যিনি কোনো প্রতিবাদ না করে শুধু মুখ বুজে সহ্য করে চলবেন সেসব? নীরবতা পালন করে সহ্যশক্তিটা দেখানোই তো ভালো তা না হলে যে মুখঝামটানিটা বেড়ে যাবে দ্বিগুণ।

বড় বড় ছেলে-মেয়ে-বৌ সামনে থাকা সত্ত্বেও ক্ষান্ত নেই গজগজানির। কী হবে প্রত্যুত্তর দিয়ে, কোনো প্রতিবিধান তো নেই এধরনের উগ্র মানসিকতার। বরং কিছু বলতে গেলেই পরিস্থিতিটা হয়ে উঠবে আরো উৎকট! পীড়নের মাত্রা যাবে বেড়ে। মুখ বিকৃত করে তিরস্কারের ঝাঁজটা হবে তীক্ষ্ণতর।

দিবারাত্র মুখ নেড়ে স্ত্রীর এই যে গজগজানি, তার নেই কোনো নির্দিষ্ট কারণ। এটা একটা স্বভাবের মতোই দাঁড়িয়ে গেছে। শিবনাথবাবু তাই এসবের ভ্রূক্ষেপ না করে নিজের কাজটুকু মুখ গুঁজে করে চলেন প্রতিদিন নিয়মমাফিক। কিছু বলতে গেলেই অপ্রিয়ভাষিণীর প্যানপ্যানানি যে আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না তখন। কাজেই মুখচুন করে সহ্য করে যান স্ত্রীর অসংযত ভাষার কটুবাক্য।

এটা যে প্রতিদিনের ঘটনা। এতে যে বাড়ীর সম্মান নষ্ট হয় কতখানি, তারও কোনো হুঁশ থাকে না স্ত্রীর। হেঁচড়িয়ে যেন বেরিয়ে আসে সেই গজগজানি শরীর থেকে। তাতে ক্লান্তিও নেই একটুও।

শিবনাথবাবু খুব ভোরে ওঠেন। আর সবাই তখন ঘুমিয়ে। নিজেই

উনুনটা ধরিয়ে চায়ের জলটা চাপিয়ে দেন। টেবিলের ওপর পেয়ালা-প্লেট সাজিয়ে মুখটুখ ধুয়ে, কাপে কাপে চা-টা ঢেলে প্রথমে দিয়ে আসেন স্ত্রীর ঘরে। ছেলেমেয়েদেরও ডেকে তোলেন চা নিয়ে। তারপর নিজে এক কাপ খেয়ে বেরিয়ে পড়েন প্রাতর্ভ্রমণে। ফেরার পথে নিয়ে আসেন কিছু শাক-সব্‌জি আর মাছ।

নিজে মাছ খান না। কিন্তু পরিবারের সবারই পছন্দ মাছ, তাই ওটা কিনে আনতে নেই কোনো বিরক্তি। ভাবেন, কাজ কী ওটা বাদ দিয়ে, বাদ পড়লেই তো আবার শুরু হবে এটাকেই কেন্দ্র করে আর এক প্রস্থ গজগজানি। পিককন্ঠে মধুরতা না ঝরে তখন শুরু হবে গঞ্জনাভরা বাক্যবর্ষণ। সেই তিরস্করণের আর অন্ত থাকবে না।

অনেকদিন এমনও হয়েছে গজগজ করে বকার মাত্রাটা এমন চরমে পৌঁছে গেছে যে, অফিসের রান্নাটা যে ঘড়ির কাঁটা ধরে শেষ করে কর্তাকে ভাতটুকু বেড়ে দেবেন সামনে, সেসবেরও হুঁশ যায় হারিয়ে। তখন শিবনাথবাবুকে অফিস চলে যেতে হয় বাধ্য হয়েই না খেয়ে। সেদিন অফিসের ক্যানটিনের শরণাগত হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। এইভাবে ক্যানটিনের ভাত খেয়েই কাটাতে হয়েছে অনেক সময়। কাজ কী এ নিয়ে কোনো ঝামেলা সৃষ্টি করার? নিজে না হয় কষ্ট করে বাইরেই খেয়ে নিলেন। তবুও মনে তো শান্তি থাকবে।

এইভাবেই চলে যায় শিবনাথবাবুর বিবাহিত জীবনের বহু বছর। ছেলেমেয়ে সবই আছে তাঁর। সবাই বড় বড়। বিয়েও দিয়েছেন তাদের। কয়েক জোড়া নাতিনাতনি দেখার সৌভাগ্যও হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করেন তিনি, বড় বড় ছেলেমেয়েরাও বাপের ভক্ত নয়, সবাই মাকে ঘিরে থাকতে চায়। বাপের প্রতি যে কোনো অশ্রদ্ধা বা অনাদর রয়েছে তাদের তা নয়। তবে মায়ের আঁচলটাই যেন লতাতন্তুর মতো বৃক্ষকে জড়িয়ে থাকতে চায়। বাপের সঙ্গে সম্পর্কটা তখন মনে হয় শুধু অর্থের প্রত্যাশা নিয়েই আটকে আছে, হৃদয়ের সম্পর্কটা একটু আলগা আলগা।

এসব নিয়ে শিবনাথবাবু ভাবেন না আর বিশেষ। মানুষটা যে অতি সজ্জন। আজ পর্যন্ত কেউ তাঁকে মুখ খিচিয়ে কথা বলতে দেখেনি। খিচিখিচি করার মানুষই নন তিনি। স্বভাবটা যেমন শান্ত মনটাও তেমনি পরিশুদ্ধ।

অফিসেও ঠিক শান্ত মেজাজের মানুষটি। অধঃস্থ কর্মচারী ও উপরস্থ সাহেবসুবোদের সঙ্গেও সমাদরের সম্পর্ক। নিশ্চিন্তভাবে কাজ করার যোগ্যতা রাখেন সবার সঙ্গে। তাই অফিসে সবার কাছেই প্রিয় মানুষটি।

মাতৃভাষাটা যদিও হিন্দী, কিন্তু বাংলাটাও আয়ত্ত করে রেখেছেন অনেক। বাঙালী বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গেই বেশি মেলামেশা। বাংলা বলতে একটু কষ্ট হয় ঠিকই, তেমন অবাধে বলা চলে না, তবে কথা গুছিয়ে বলতে কোনো অসুবিধা নেই। একটু ধীরে বলতে হয়।

এহেন মানুষটির রুচিবোধ ও কৃষ্টিগত মনটা তাই হয়ে পড়েছিল একটু বাঙালী ঘেঁষা। মনে মনে ইচ্ছা ছিল কোনো বাঙালী মেয়েকে বিয়ে করার। এই কারণে নিজের বিয়েটাও আটকে রেখেছিলেন বহুদিন, বয়স বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও। কোনো মেয়েকে প্রেম করে বিয়ে নয়—বিয়ের নিমিত্ত দুপক্ষের মুখোমুখি কথাবার্তা বলে—যেমন সাধারণত সবার বিয়ে হয়, সেইভাবে। চিঠিপত্র লিখে চুক্তি আবদ্ধ হয়েই ঘরে আনতে চেয়েছিলেন একজন বাঙালী মেয়েকে বউ করে।

পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন—বিহারী যুবকের জন্য বাঙালী পাত্রী চাই বলে। কোনো চুপিসারে বিয়ে নয়। একেবারে খোলাখুলিভাবে। ছেলে দেখবে মেয়েকে, মেয়ে দেখবে ছেলেকে। পছন্দ হোলে তবেই হবে পাকাপাকি কথাবার্তা। মেয়ের মা-বাবারও পছন্দ হওয়া চাই পাত্রকে। জোর করে গছিয়ে দেবার মতো নয়।

ছেলের বাবা গত হয়েছেন অনেকদিন। মা শুধু বেঁচে। থাকেন বেহারের কোনো গ্রামে। ওপরে আছেন কজন বড় ভাই। সবাই বিবাহিত তাঁরা। এই ভাইদের আর মা-কেও রাজী করিয়েছিলেন বাঙালী মেয়েকে বিয়ে করবেন বলে। ছেলের যদি মনের ইচ্ছা এই, তবে বাঙালী বউ ঘরে আসবে তাতে আপত্তি করার কী আছে? এতো আর হিন্দুর সঙ্গে অ-হিন্দুর বিয়ে নয়—ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিয়ে।

কাগজে বিজ্ঞাপন পড়ে মেয়ের বাবা চিঠি দিয়েছিলেন। দৌড়েও এসেছিলেন বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। ভালো লেগেছিল ছেলের রুচিবোধ, কথাবার্তার কোমলতা, ছেলের সৌম্যদর্শন চেহারা। পাত্রের ভাইয়েরা বলেছিলেন মেয়ের বাবাকে, ছেলে যদি মেয়েকে পছন্দ করে তার সঙ্গেই হবে বিয়ে। এই বিষয়ে ছেলের মতামতটাই হোলো বড়। আমরা, শুধু সামনে থেকে বিয়ে দেব।

ছেলের কিন্তু পছন্দ হোলো এই মেয়েকে—শুধু একজনকে দেখেই। মেয়ের বাপের বাড়ীর পরিবেশ, তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা, মার্জিত রুচি খুব মনে ধরেছিল। তাই এখানেই পাকাকথা দিয়ে বসল ছেলের পক্ষ।

কোনো দাবী-দাওয়া নেই ছেলের। কারণ নিজেরই তো রয়েছে অনেক—দেশের জমিজমা কত কী। বিয়ের আগে থেকেই একটু একটু

করে ঘরের আসবাবপত্র বাড়িয়েছে নিজে। সুতরাং আর কিছু দরকার নেই ঘরের সৌষ্ঠব বাড়াবার জন্য। নিজেই তো সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে সব কিছু---নতুন বউ এসে সেসব সামাল দেবে শুধু।

এই মেয়ের সঙ্গেই বিয়ে হোলো বেশ ধুমধাম করে। বেহারের দেহাতী গ্রামের অনেকেই গিয়েছিলেন বরযাত্রী সেজে। ভাইয়েরাও ছিলেন সঙ্গে। কোথাও খুঁত পাননি তাঁরা মেয়ের বাড়ীতে বরযাত্রীদের আদর-আপ্যায়নে, না পেয়েছিল মেয়ের পক্ষ ছেলের পক্ষ থেকে কোনো ব্যবস্থার ভুলচুক।

মেয়ের বাড়ীতে ছেলের তরফের বিয়ের তত্ত্ব সব পাঠানো হয়েছিল একেবারে নিখুঁত করে---মেয়ের জন্য ছিল দুখানা সুন্দর বেনারসী শাড়ী, এর ওপরে কয়েকটা তাঁতের শাড়ী, দুরকমের গহনা, নানারকম দামী দামী সব প্রসাধনী সামগ্রী, তোয়ালে, সায়া-সেমিজ-ব্লাউজ কত কী। একটা বড় চামড়ার সুটকেসে সেসব সাজানো। এছাড়া দেওয়া হয়েছিল নানারকম মিষ্টি, এক হাঁড়ি দই, একটা বড় সাইজের রুই মাছ সিঁদুর মাখানো অবস্থায়।

এমন তত্ত্ব দেখে সবাইতো অবাক। এ যে একেবারে বাঙালী ঘরের বৈশিষ্ট্য নিয়ে তত্ত্ব। ছেলের বাড়ীর রুচিবোধ আছে তাহলে। বিহারের অ-বাঙালী বলে হেয় করার মতো কোনো সুযোগ দেননি তাঁরা। বাঙালীর প্রীতি অনুরাগ ও পছন্দের প্রতিটি জিনিস পাঠিয়েছেন তাঁরা। প্রত্যেকটি বাছা বাছা। সুখ্যাতি করার মতোই সব। সাধারণত যে ধরনের তত্ত্ব করা হয়, আত্মীয়দের বাড়ীতে বিয়ে উপলক্ষে, তার চেয়ে মাত্রাটা একটু বেশি করে এসেছে। কাজেই বিমলানন্দ এলো সবার মুখে তত্ত্ব দেখে। তত্ত্ব দেখেই তো বোঝা যায় পাত্রের ঘরের রুচি-অভিরুচির মনোভাব। ভাবলেন তাঁরা, এ মেয়ে সুখেই থাকবে অ-বাঙালীর হাতে পড়েও।

বিয়ের পর ছেলের কাজের জায়গায় দেওয়া হোলো ঘটা করে বউভাত। ভুরিভোজের ব্যবস্থা হোলো সেখানেও। সমারোহের নেই কোনো খুঁত। নতুন বউকে সাজিয়ে বসানো হোলো ঘরের একটা কোণে। তাকে ঘিরে বসে ছেলের বাড়ীর গ্রামের মেয়েরা বউয়েরা---পাড়ার বাঙালী মেয়ে বউও অনেকে। সাজানো হয়েছে ঘরদোর সব রুচিসম্মতভাবে, ফুলের মালা, আলোর মালা দিয়ে।

বহুলোককে আপ্যায়িত করা হোলো সেদিন। সবাই খুশি। বাঙালী মেয়ে ও বিহারী পাত্রের বন্ধন হোলো এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। সুখী হোক তারা, এয়োতী থাকুক বউ শতায়ু পেয়ে---কত সব আশীর্বাণী বর্ষিত হোলো সেদিন বয়স্কদের মুখ থেকে।

বিয়ের পর কয়েক বছর কাটল আনন্দঘন অবস্থায়। নিত্য-নতুন অনুষ্ঠানে আনন্দসলিলে ডুবে থাকার ব্যবস্থা। আচার-ব্যবহারে দুটি হৃদয়ের মধ্যে নেই কোনো তারতম্য, দুজনেই দুজনাতে অনুভাবিত।

প্রথম সন্তান হবার সময় পাঠিয়ে দেওয়া হোলো মেয়েকে তার বাপের বাড়ীতেই। নিজের মায়ের কাছেই থাকা ভালো। অজ্ঞতা নিয়ে নিজের কাছে রাখার সাহস হোলো না ছেলের।

তাই প্রথামত করা হোলো বাপের বাড়ীতে পাঠিয়ে প্রথম সন্তানের গর্ভমোচনের সব ব্যবস্থা। নিজেও পৌঁছল সেখানে সময়মতো। কোনো ঝামেলায় পড়তে হোলো না মেয়ে-জামাইকে এই কাজে।

দ্বিতীয় সন্তানের জন্মদানের সময় কিন্তু মেয়ে রয়ে গেল এখানেই স্বামীর কাছে। শিবনাথবাবু একা সামলে নিলেন সব। প্রয়োজনটা যখন তাঁর, তখন সব কিছু শিখে নিয়ে সামলাতে হবে যে তাঁকেই। বারবার এ নিয়ে বাপের বাড়ীতে রেখে আসাটা ভালো ঠেকে না। দায়িত্ব না নিলে যোগ্যতা আসবে কীসের জোরে?

বিহারে নিজেদের বা পূর্বজদের যে গ্রাম্য সংস্কৃতি সেটাকে পরাস্ত করে বাঙালী কৃষ্টি ঘরে ঢোকাতে পেরে একটা সহজ আনন্দে মেতে থাকেন তিনি। গর্বও যে না হয় এনিয়ে তা নয়। বাঙালী কালচারের প্রতি বরাবরই ছিল একটা বড় আকর্ষণ। বাঙালী বন্ধুবান্ধব ও তাদের ঘরের সঙ্গে ছিল একটা সহজাত সম্পর্ক, আপনত্ব গড়ে উঠেছিল সেইভাবে। দুটি ভিন্ন কালচারকে সংযুক্ত করে রাখা কঠিন সে কথা অনেকেই বুঝিয়ে ছিলেন তাঁকে, কিন্তু সেসবে মোটেই কর্ণপাত করেননি।

ধীরে ধীরে ভুলে যাচ্ছিলেন নিজের হিন্দী ভাষাটাও, ঘরে চালু করেছিলেন শুধু বাংলা বলাটাই। নিজেও বাংলাতেই বলতেন সবার সঙ্গে কথাবার্তা। শালী-শালাজদের সঙ্গেও চলত এই ভাষাতেই কথা, হাসিঠাট্টার প্রফুল্ল-সাধনও সেইভাবেই। মনে হোতো না, কোনো অ-বাঙালী এসেছে জামাই হয়ে ঘরে, এই বাড়ীতে। এতো ঘনিষ্ঠভাবে মিশে গিয়েছিলেন সবার সঙ্গে যেটা ধারণারও অতীত। এ বাড়ীর অন্যান্য জামাইদের মতোই হয়ে পড়েছিলেন বড় আপন। ভাষা ও কৃষ্টি কোনোটাই বিভিন্নতার সৃষ্টি করেনি শ্বশুরবাড়ীতে।

শ্বশুর নিজেও গর্ববোধ করতেন এই উদারচেতা জামাইটির জন্য। শাশুড়ীও ছিলেন তেমনি সরল উদারপন্থী মানুষ, তা না হোলে তো তখনই আপত্তি করতে পারতেন যখন বিয়ের কথাবার্তা চলছিল এই ছেলের সঙ্গে। পরিবারের সবারই সায় ছিল বলেই তো একসূত্রে বাঁধতে পেরেছিলেন নিজের

মেয়েকে এই ছেলের সঙ্গে। মেয়ের তরফ থেকেও কোনো বাধাদানের প্রশ্ন আসেনি।

একটা আদর্শগত বিবাহের দৃষ্টান্ত ছিল এটি। কারুর আদেশানুবর্তী হয়ে নয়। পাত্রের সহজ সরল নির্ভীক মনটা দেখেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন বিয়ে পাকাপাকি করতে। ভাষা, কৃষ্টি, আচার-ব্যবহার সবই ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও আদান-প্রদানে, কন্যাদানে কোনো দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়নি মনে। বরং আদরযত্ন ও খাতির হয়েছিল বেশি মাত্রায় এই পাত্রের জন্য।

বেশ চলছিল এই সংসার দুটি ভিন্ন ভাষী ও ভিন্ন কৃষ্টির আদর্শগত মিলনে। হঠাৎ যেন কোনো অজ্ঞাত কারণে চিড় খেলো সেই সংযোগ, মিষ্টিমধুর জীবনযাত্রায় উদয় হোলো অপ্রীতির। মিলন সংযোগ যেন প্রতিদিন একটা কলহবিবাদের মধ্যেই শেষ হোতে চায়। বন্ধন যেন ছিন্ন হয়ে পড়ে ধীরে ধীরে, ঘনিষ্ঠতায় লাগে বিতৃষ্ণার ছোঁয়া।

মেয়ের উদারচেতা মনে এলো এক ভয়ংকর রকম বিকৃতি। বুঝতে পারছে না সে, একটা ভাঙ্গনের প্লাবন আসছে সংসারটাকে চুরমার করে দিতে। অধৈর্য হয়ে পড়ে মেয়ে একটুতেই, স্বামীর সারল্যে আর পায় না কোনো বিশিষ্টতা। কথায় কথায় বেরিয়ে আসে উষ্মা একটু শালিনতা হারিয়েই। স্বামীর প্রতিটি আচরণে মুখ ছুটে বেরিয়ে আসে খেদভরা প্রকাশ। মেয়ে উত্তপ্ত হয়ে থাকে সর্বক্ষণ, তাই গজগজ করে দিবারাত্র। কটাক্ষ করে স্বামীকে ভিন্ন ভাষী বলে, কালচারগত তফাতটা ধরিয়ে দিতে চায় সবসময়। স্বামীকে এ নিয়ে কোণঠাসা করতে পারলেই পায় আনন্দ। দশজনের সামনেও এসব কথা বলতে মুখে আটকায় না একটুও।

বাঙালীর কৃষ্টি অনেক সুন্দর, ভাষা সুমধুর, সবই সুন্দর---অন্যভাষী স্বামীর কাছে এসব যে দুর্লভ। তাই কালচারের তফাতটা তো থাকবে চিরদিন। এইভাবে নানা কটুকথা বলে স্বামীকে করতে চায় তুচ্ছ, চলে অজস্র রকমের নিপীড়ন, যেটা শিবনাথবাবু নীরবে হজম করে চলেন। স্ত্রীর মতো হঠাৎ সংকীর্ণচেতা হোতে চান না তিনি। স্বামীকে যদি ছোটো করে আনন্দ পায় স্ত্রী, সেটাতেও কোনো বাধা দিতে চান না। তাহলে তো স্ত্রী আরো বেশি উগ্রমূর্তি ধারণ করে চেঁচিয়ে পাড়া মাত করে তুলবে।

নিজের ছেলেমেয়েদেরও দেখা গেল শেষ পর্যন্ত তারাও মায়ের প্রতি অতিমাত্রায় স্নেহকোমল। বাপের এই অসহায় অবস্থায় মায়ের অন্যায়ের প্রতিবাদ করারও যে নেই কোনো ক্ষমতা।

বাপ তাই হয়ে পড়েন একপেশে। তাঁকে সমর্থন করার যে নেই কেউ। মায়ের একতন্ত্রিণী স্বভাবের প্রতিবাদ করারও নেই কেউ কাছে পিঠে। শ্বশুর গত হয়েছেন বহুদিন যিনি এসে সামলাতে পারতেন এসব। এ যে কী বিষময় জ্বালা ভাবা যায় না।

শিবনাথবাবু এসব কথাই ভাবেন সারারাত বসে বসে। ঘুম আসে না চোখে। ছটফট করেন বিছানায় শুয়ে। দিনের বেলায় বেরিয়ে যান বাড়ী থেকে স্ত্রীর গজগজানি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান সময় কাটাবার জন্য, কখনো পার্কে বসে। বাড়ীতে থাকলেই তো শুনতে হবে অজস্র গালাগাল।

এই বয়সে যে কোথাও যাবার নেই আর। দেশের যে সব জমিবাড়ী ছিল তাও বিক্রী করে ফেলেছেন দেহাত থেকে সম্পর্কটা চুকিয়ে ফেলে। জমিবাড়ী বিক্রীর টাকাও স্ত্রীর নামেই জমা করা হয়েছে। কোনোদিন তো ভাবেননি শেষ জীবনে এরকম অবস্থায় পড়তে হবে তাঁকে।

এসব কথা ভেবে ভেবে তিনি ক্রোধে ঘৃণায় কাতর হয়ে পড়েন। এই বয়সে তো আর বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় নেই। বয়স যে এখন সত্তর পেরিয়ে গেছে। কোথায় যাবেন এখন নিজের হাতে গড়া এই সংসারটাকে ফেলে? অপূর্ণ রাখেননি কোনো কাজ। ছেলেমেয়ে-দেরও বিয়ে হয়ে গেছে---জামাই, বউও এসেছে ঘরে। তারাই বা কী বলবে বাবা সংসার থেকে চলে গেছে ভ্রষ্টমতি হয়ে। কিন্তু এই অদ্ভুত অবস্থার জন্য তো তিনি দায়ী নন। দায়ী তো তাদের মা, যাঁকে লক্ষ্মীরূপে ঘরে তুলেছিলেন তিনি সমাদরে। স্ত্রীর মনে এখন যে ব্যাধি এসে উপস্থিত সেটা যে দুরারোগ্য। এই মনোরোগ যে স্ত্রীকে দগ্ধ না করে স্বামীকেই করে তুলছে কষ্টের বলি।

এই অন্তর্দাহে বিবশ হয়ে একদিন তিনি বেরিয়ে গেলেন বাড়ী ছেড়ে। আলাদা থাকার ব্যবস্থা করলেন অন্য কোথাও একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে। জিনিসপত্তর কিছুই নিলেন না এ বাড়ীর। টাকা-পয়সার ব্যবস্থা তো আগেই করে রেখেছিলেন পরিবারের জন্য, যাতে তাদের কোনো কষ্ট না হয়। তাছাড়া ছেলেরা তো রয়েছে মায়ের সঙ্গেই। নিজে শুধু নির্মুক্ত হয়ে বাঁচতে চান বাকীটা জীবন একেবারে বন্ধনহীনভাবে। কারুর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার প্রয়োজন নেই তাঁর। কেউ কাছে আসুক বা না আসুক তাতে কোনো খেদ নেই। ওরা সুখে শান্তিতে থাকলেই হোলো।

নিজে যদি মরে যান হঠাৎ, তখন লাশ কে ওঠাবে, তার জন্য ভাবনা করে লাভ নেই। মানুষটাই যদি না রইল, তবে তাঁর পক্ষে এসব চিন্তা

তো নিরর্থক। যেমন এসেছেন ধরার ওপরে, তেমনি করেই মিশে যাবেন ধরাতলে স্বাভাবিক নিয়মেই। আর কেউ না থাক কাছে, পাড়াপড়শীরা তো আছে, তারাই দেখবে। ওরাই যে এখন বড় আপন।

নিজে সেলাই-ফোঁড়াইয়ে খুব বেশি নিপুণ নয় বলেই, কাঁপা কাঁপা হাতে বুনে চলেছি এই কাঁথা। এটা সুতোর নক্শা নয়, মানুষের একটা একটা চরিত্রের আলেখ্য। তাদের অচিন-চিত্তের নানা প্রকাশ বিভিন্ন রূপে চিত্রিত। যে মানুষটি সবচেয়ে বেশি পরিচিত ছিল, তার চিত্তের অন্তরালে আগে প্রবেশ ঘটেনি বলে হঠাৎ যেন প্রকাশিত হয়ে পড়ল তার অন্দরের মহাপাতকের আসল স্বরূপটা। আবার যাকে ভেবেছিলাম দুর্জন, কোপনশীল স্বভাবের, সেই লোকটির মধ্যেই দেখতে পেলাম একদিন শ্রেষ্ঠ মানুষের আলোকছটা। এই সব সূক্ষ্ম আঁকিবুকি নিয়েই নকশি-কাঁথার জন্ম---লতাপাতার মতো এক একটা মানুষের কল্কা। কোনো বিশেষ যুগের ভেতর বেঁধে রাখা যায় না এসব মানুষগুলোকে---একটা ফাঁসের ভেতর। এটা সম্ভবও নয়। সব মানুষই যে বিভিন্ন, আলাদা আলাদা তাদের চরিত্র। কাজেই সেখানে সেলাইয়ের পার্থক্য তো থাকবেই।

সীবনক্ষমতাও নেই আমার যে সব মানুষকে এক ছকে বেঁধে বাহবা লুটবো সবার কাছে। সুতোর রঙে রঙ মিলিয়ে প্রত্যেককে একটা পাতায় বা একটা ফুলে সাজিয়ে নেওয়াও সম্ভব নয়। আলাদা আলাদা যে মানুষের খেয়াল প্রকৃতি, তেমনভাবেই তো তুলতে হবে তাকে আমার কাঁথাতে।

একটা জিনিস যেটা খুবই পরস্পর-বিরোধী বলে মনে হয়, সেটা হোলো, আমরা নিজেরা কতখানি আত্মপরজ্ঞান বাদ দিয়ে শুধু মানবিক-বোধ নিয়ে আছি? অন্যের কাছে যেটা প্রচার করি, সেটা নিজে মেনে চলি কতখানি? ভুবনব্যাপী এই প্রশ্নই তো চকিত করে রেখেছে মানুষকে। আত্মপ্রবঞ্চনায় ক্লিষ্ট যে আমরা সবাই। অন্যের নীচতা কুটিলতা দেখে আঁতকে উঠি, অথচ নিজেরাও যে তার থেকে কম কিছু নয়, সেকথা ভাবি না কখনো। আত্মপ্রসাদেই আমরা প্রশান্তচেতা হোতে চাই।

প্রশ্ন দিয়েই তো মানুষের সভ্যতার শুরু। প্রশ্নই হোলো জ্ঞান অর্জনের সোপান। উপনিষদের কাল থেকে মানুষের প্রশ্ন 'কো হম্' অর্থাৎ আমি কে? তার উত্তর দিয়েছেন কেউ, কেউ দিতে পারেননি।

কিন্তু এই জৈবিক মানুষটি যে অনেক বেশি সত্য। তার ক্ষুদ্রতা,

উদারতা, ঈর্ষা, ক্রোধ, স্নেহমমতা, ভালোবাসা এবং তার উগ্রচেতনা, এসব তো তুচ্ছ নয়। এদিয়েই তো তৈরী গোটা মানুষটির অস্তিত্ব। সুতরাং সেই রক্তে-মাংসে-গড়া মানুষটিকে বাদ দিয়ে আমি কে, এবং কোথা থেকেই বা আমার আগমন, এসব ভেবে উদাসনয়নে আকাশের দিকে চেয়ে শুধু নিজের মুক্তির প্রার্থনা করে লাভ কী? তার চেয়ে যে পৃথিবীতে, সমাজে বাস করতে হবে সেই মানুষগুলোর মধ্যে মানবিক মূল্যবোধটুকু যদি ধরে রাখতে পারি, তবে সেটাই তো হবে বড় প্রাপ্তি। মানবিকতাই যদি হারিয়ে ফেলি তবে কী নিয়ে বাঁচবে মানুষ!

মনে পড়ে একদিনের ঘটনা। বাবা বিকেলে বেড়াতে বেরিয়েছেন। প্রাতর্ভ্রমণের চেয়ে বৈকালী ভ্রমণটাই বাবার বরাবরের পছন্দ। গ্রীষ্মের দিনে রোদ পড়লে হাঁটতে বেরোন, একটা ছড়ি হাতে নিয়ে। প্রায় দু-মাইল একটানা হাঁটা, গতিটাও দ্রুত বয়স আন্দাজে। হাঁটতে গিয়ে শরীরে ঘাম না ছুটলে সেটা নাকি হাঁটাই নয়। সঙ্গে কেউ থেকে কথা বলতে বলতে চলুক, সেটাও পছন্দ নয়। তাতে ব্যায়ামের ব্যাঘাত ঘটে। একাগ্রতা যায় নষ্ট হয়ে। কাজেই একাই বেরিয়ে পড়েন রোজ।

শীতকালের দিন ছোট বলে, বেড়ানোর ঘড়ির কাঁটাটাও এগিয়ে আসে। বিকেলে চারটা বাজতে বাজতেই তো সূর্যির হেলে-পড়ার মতো অবস্থা, তারপরেই অন্ধকার হয়ে আসে চটপট। সুতরাং শীতের দিনে বেড়ানোর সময় বেলা চারটে হয়ে গেলেই। সেদিনও বেরিয়েছেন সেইভাবেই। কোনো কোনো দিন রেল-লাইনের বরাবর রাস্তা ধরে চলেন, কোনো দিন বা দিক বদল করে খোলা লম্বা রাস্তাতেই দ্রুত-হাঁটা। রাজেন্দ্রনগরের পথঘাট তখন খুব চমৎকার। ভীড়ের দৌরাত্ম্যও কম, গাড়ীর চলাচলও অল্প।

বিভিন্ন রাস্তা ধরে বেড়াতে বেড়াতে সেদিন খেয়াল ছিল না ঘড়ির দিকে। আবছা আবছা সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। ফুটপাতে উঠে হাঁটতে যাবেন একটা রাস্তা পেরিয়ে, ইটের পাঁজা ছিল এক জায়গায়, তাতে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন সেখানেই।

তবু উঠবার চেষ্টা করছেন। বয়স অনুযায়ী সেই ক্ষমতা নেই নিজের শক্তিতে দাঁড়িয়ে পড়ার। তবুও চেষ্টা করে চলেছেন দাঁড়াতে, লাঠিতে নির্ভর করে। মাথায় চোট পেয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে গাল বেয়ে জামাতে। শেষে নিজের শক্তিতে একটু আস্থাহীন হয়ে বসে আছেন সেখানেই।

দূর থেকে একজন রিক্সাওয়ালা, বয়সে প্রবীন, দেখতে পেয়ে ছুটে

এসেছে কাছে। বৃদ্ধ মানুষের সমস্ত জামাকাপড় তখন রক্তে লাল হয়ে গেছে।

ধীরে ধীরে বাবাকে সে তুলে দাঁড় করালে। প্রথমটা দেখে নিলে পায়ের হাড় ভাঙেনি তো। না সেটা ঠিকই আছে, হাতেও কোনো চোট নেই। শুধু মাথায় চোট পেয়ে একটা বড় গর্ত হয়ে গেছে। সেখান থেকেই চলছে রক্তস্রোত।

রিক্সাতে উঠিয়ে নিলে সে। বাবার জ্ঞান রয়েছে তখন পুরোমাত্রায়। অত রক্ত দেখেও তাঁর মনে কোনো ভয়ের সঞ্চার হয়নি। বাড়ীর রাস্তার নম্বর রিক্সাওয়ালাকে বলে দিলেন যাতে ঠিক মতো পৌঁছে দিতে কোনো অসুবিধা না হয়।

আমি তখনও অফিসে। বড়দিদি একা বাড়ীতে। বাবাকে সময়-মত বাড়ীতে ফিরতে না দেখে তিনি ঘরবার করছেন চিন্তায়। এতো দেরি করেন না তো বাবা কোনোদিন বাড়ী ফিরতে? আজ কী হলো তবে? মনে মনে একটু শঙ্কাও অনুভব করেন তিনি।

এমন সময় বাড়ীর দোর-গোড়ায় একটা রিক্সা এসে দাঁড়াল। অন্ধকারে বুঝতে পারছেন না রিক্সাতে কে বসে। রিক্সাওয়ালা বাবাকে কোলে তুলে, ধীরে ধীরে উঠিয়ে নিয়ে এলো ঘরের ভেতর।

রক্তমাখা জামাকাপড়ের দিকে তাকিয়ে তো দিদির চোখে জল এসে গেছে। কি হয়েছে, জিজ্ঞাসা করার আগেই, রিক্সাওয়ালা দিদিকে বল্লে, বুড়োবাবুর মাথায় চোট লেগেছে, সেখান থেকেই রক্ত ঝরছে। এবার ওকে শুইয়ে পরিষ্কার করে দিন। হাত-পা ঠিকই আছে, ভাঙেনি।

বাবা রক্তাক্ত জামা গায়েই দিদিকে বল্লেন, ওর ভাড়াটা দিয়ে দাও আগে, তারপর সব বলছি।

রিক্সাওয়ালা ভাড়া নেবে না কিছুতেই। সে কী, এই সামান্য উপকারের জন্য পয়সা? উনি তো রিক্সায় চাপার জন্য আমাকে ডাকেননি মা, আমিই তো উঠিয়ে নিয়ে এসেছি রিক্সায়। এটাই যে মানুষের ধর্ম। তারজন্য পয়সা নেব, ছি ছি ছি!

তারপর একটু ভর্ৎসনার সুরে দিদিকে ধমকে দেয় রিক্সাওয়ালা, বুড়ো মানুষকে আর কখনো একা বেরোতে দেবেন না।

এখানেও যে মানবিক আবেদনভরা সুর, কত মাধুর্যে ভরা সুন্দর কথা।

এসব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাওয়া কোনো বইয়ের পাতা থেকে আওড়ায়নি সে, না কালচারগত প্রাপ্ত এসব কথা।

এটাই যে মানবসভ্যতার আসল প্রকাশ যেটা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধ তার। এটাই যে মনুষ্যোচিত সদগুণ। অর্থ, সম্পদ, সোনাদানা মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তু সন্দেহ নেই। কিন্তু সেসব যে চরম মূল্য দেবার যোগ্য নয়। মূল্যবান পদার্থটি কী, সেটা জানতে মানুষের সারা জীবন কেটে যায়, তবুও চিনতে পারে না সে।

রিক্সা চালায় বলে সে অকিঞ্চন নয়---সে যে মহাসম্পদে বিত্তবান। সমগ্রকে সম্যকরূপেই জানতে পেরেছে, জীবনধারণের বেদনার ওপর মনকে তুলতে পেরে সত্যকে জেনেই।